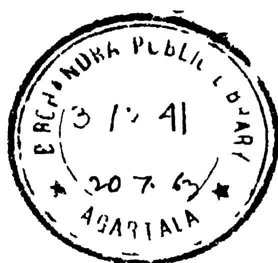
অতলান্তিক

আশাপূর্ণা দেবী



এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স্
কেন্দ্রালয় : ১৬এ, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯
বিক্রয়কেন্দ্র : ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্সের
পক্ষ থেকে
কমলকুমার নাগ কর্তৃক
প্রকাশিত

দাম—পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট শিল্পী
অরুণ বণিক

অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলি, থেকে
দেবেশ দত্ত কর্তৃক
মুদ্রিত।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু—

॥ সূচীপত্র ॥

॥ অতলান্তিক ॥

।। অতলান্তিক

এক শ্রেণীর লোক থাকে যারা মুহূর্তে পরকে আপন করে নিতে পারে। এক দিনেই 'পরিচিতের' সীমা থেকে 'বন্ধু' এবং দু'দিনে বন্ধু থেকে অন্দরের আত্মীয়ে পরিণত হবার ক্ষমতা তারা রাখে। কাজে কাজেই এই অসমতল অমসৃণ পৃথিবীর একেবারে মাঝখানে নিজের জন্য বেশ একটু মসৃণ সমতলভূমি তারা ঠিকই সংগ্রহ করে নেয়।

এদের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত সুবিধের দরজা উন্মুক্ত।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা হৃদয়বিত্তে আদৌ দীন না হলেও, তাদের সমস্ত মনটাকে কে যেন ঢেকে রাখে একটা অকারণ কুণ্ঠার পুরু আবরণে। সেই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে পড়বার ক্ষমতার অভাবেই অন্যের হৃদয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছতে পারে না তারা।

কেন এই কুণ্ঠা তা তারা নিজেরাই জানে না। অথচ এই সহজ সপ্রতিভতার অভাবেই হয়তো তাদের নাম হয়—'অহঙ্কারী', উন্নাসিক, দেমাকী।' আর যারা তাদের কিছুটা বোঝে, তারা হয়তো বা কৃপা করে বলে 'লাজুক, মুখ-চোরা।' এরা তাই চিরকালই জগতের এক পাশে পড়ে থাকে। এদের মনের মধ্যে কখনো অভিযোগ থাকে না, অনুযোগ থাকে না, বুঝি কারও কাছে কিছু প্রত্যাশাও থাকে না। হাসিমুখে সব রকম অসুবিধে সহ্য করে চালিয়ে যাবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাদের থাকে। নিজেকে অপরের চোখ থেকে গুটিয়ে রাখতে পারলেই তাদের শান্তি।

বন্ধু এদের ভাগ্যে ক্বচিৎ জোটে। তবে দৈবাৎ যদি জুটে যায়, সে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রীতিমত গভীরই হয়। এদের যারা বুঝতে পারে, তারাই পারে এদের মনের উপরকার পুরু আবরণটা সরিয়ে ভিতরটাকে দেখতে। এমনি এক দরদী-দৃষ্টি নিয়ে একদা অমর চাটুয্যে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর সহকর্মী বিজয় বসুকে।

তখন বিজয়বাবুর এখনকার এই পালিশ চকচকে সুমসৃণ টাকের জায়গাটায় ছিল এক গাদা কালো চকচকে কেশভার, আর এই ঈষৎ স্থূল ভারী থমথমে দেহটার কাঠামোখানা ছিল সোজা সতেজ ব'লিষ্ঠ। আর যে অমরবাবু তাঁর নামের মহিমা ব্যর্থ করে বহুদিন হলো মর-জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, তিনি তখন বাজী রেখে একটা আস্ত ছাগলের মাংস খেয়ে হজম করতে পারতেন, এবং অফিসের টিফিনে তার বাড়ীর তৈরি একাদিস্তে হাতেগড়া রুটি না হলে চলতোই না। সহকর্মী বিজয়বাবুর আহারে আচরণে মিতাচার লক্ষ্য করে হাসি-ঠাট্টা করতেন অমরবাবু, সেই সূত্রেই আলাপ।

কিন্তু হাসি ঠাট্টার মধ্যে থেকেই অমর চাটুয্যে সহসা কেমন করে যেন মুখচোরা বিজয় বসুর ভিতরকার নির্মল পরিচ্ছন্ন খাটি মানুষটাকে আবিষ্কার করে বসেছিলেন। গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্ব। নিবিড় গভীর বন্ধুত্ব।

অমরবাবুই নিজের চেষ্টা আর বুদ্ধির জোরে জানতে পেরেছিলেন, বিজয় বসুর সাংসারিক পরিস্থিতিটা কণ্টকাকীর্ণ। আর্থিক অবস্থা খারাপ নয়, কিন্তু সংসারে বিজয় বোস অবান্তর! বাপ বাল্যকালে গত, কিছুকাল হলো মাও সেই পথে। আর তদবধিই বৌদিযুগল মৃতা শাশুড়ীর এই 'ধেড়ে গোবিন্দ' অবিবাহিত ছেলেটিকে 'আপদ-বালাইয়ের' ঘরে জমা দিয়ে রেখেছেন।

আর্থিক অসঙ্গতি হয়তো নেই দ্যাওরের, একটা পেট, চাকরী-বাকরী করে, মোটা টাকা খাইখরচ দিয়েই না হয় থাকে, কিন্তু সামর্থিক সঙ্গতিটার জোগান দেয় কে? দুজনেরই কোলে কচি, শাশুড়ীর কোলের কচিকে দেখবার সময় কোথা? তাই কি সহজ মানুষ? অক্ষম অকর্মণ্য! খেতে না দিলে বলতে জানে না 'দাও'। বর্ষার দিনে ধুতি পায়জামা ভিজে থেকে গেলে, অম্লান বদনে ভিজেটাই টেনে পরে, বলে না যে 'ভিজে আছে'।

শুধু নিজের ব্যাপারে কেন, সব দিকেই অকর্মণ্য। দেহটাই শুধু জোয়ান বলিষ্ঠ!

এত বড় ধাড়ী ছেলে একদিন গেরস্থর বাজারটা করে দিতে পারে না, 'পারবো না' একথা অবিশ্যি বলে না, কিন্তু গেলে এমন মাল কিনে আনে যে, দ্বিতীয় দিন আর বলতে সাধ যায় না। অথচ যত ইচ্ছে কড়া সমালোচনা করো, রাগ নেই।

রাগ অনুরাগহীন পুরুষকে সহ্য করা মেয়ে মানুষের পক্ষে কঠিন। কাজেই

বৌদিদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না যদি তাঁরা ভেবে-চিন্তে, সংসারটার মত, ওই কঠিন কাজটাকেও দুই জায়ে ভাগ করে নেবাব ব্যবস্থা করে থাকেন।

ব্যবস্থা হয়েছিল দু'বেলায় দুই বৌদির কাছে খাবে বিজয়।

কিন্তু কখনো কখনো নাকি বাল্মীকীও পাশমোড়া দেন। সেই দৃষ্টান্তেই বোধ হয় বিজয় এ ব্যবস্থার প্রতিবাদে একটা প্রতিকার চেষ্টা করে বসলো। দু'বেলাই হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিল সে।

অমরবাবুর সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা হলো, তখন বিজয় বোসের সেই হোটেল যুগ চলছে এবং অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় আমাশা দেখা দিয়েছে।

অমববাবু কিছুটা শুনে, আর কিছুটা অনুমান করে, এক অসমসাহসিক প্রস্তাব করে বসলেন।

প্রথমটা বিজয় বসু আকাশ থেকে পড়েছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে মত পালটালো। অমরবাবু তাঁর বৈঠকখানাটাকে খালি করে ধুইয়ে মুছিয়ে ঠিক করে রাখলেন।

বিজয় বোসের বৌদিরাই যে শুধু স্ত্রীলোকের দোষ গুণের অধিকারিণী তা নয়, মুখনাড়া দিলেন বসুমতী দেবীও, বললেন, "তার মানে আমি তোমার সোহাগের বন্ধুর রাঁধুনীগিরি করবো, কেমন?"

অমরবাবু প্রবোধ দিলেন, "আ ছি ছি! কি যে বল! বাড়ীর লোকের মতন দু'বেলা দু'থালা খাবে বৈ তো নয়! দেখো কোন ঝঞ্ঝাট নেই লোকটার। নিস্পৃহ নির্বিরোধী, যা দেবে তাই খাবে।"

বসুমতী খুঁতখুঁত করে বলেছিলেন, "তবু যাই বলো একটা পর লোক! চিন্তা বাড়লো বৈ কি!"

অমরবাবু মৃদু হেসে চুপি চুপি বললেন, "তেমনি কিছু চিন্তা তো কমলোও গো! এক বাথরুম, এক উঠোনে, ওই একখানা ঘর কে তোমার এতগুলো টাকা দিয়ে ভাড়া নিতো?"

বলেছিলেন বটে কথাটা অমরবাবু, কিন্তু সেটা স্ত্রীকে বুঝ মানাতে, সত্যিই পয়সার লোভে নয়। বন্ধুটি তাঁর গেরস্থ বাড়ীর দুটো ভাত খেয়ে বাঁচুক, এই ছিল তাঁর বাসনা।

নীচেকার দালানের একটি কোণে বিজয়বাবুর জন্যে ছোট্ট একটি টেবিল বরাদ্দ করা হলো, আর একখানা লোহার-চেয়ার। লাজুক মানুষ বিজয়বাবু

অমরবাবুর সঙ্গে এক সঙ্গে রান্নাঘরে বসে পারিবারিক পরিবেশে খেতে নিতান্ত কুণ্ঠিত, আর বসুমতীও বললেন, "তাই ভাল বাপু। মাথায় কাপড় টেনে থালাটা বসিয়ে দিয়ে চলে এলাম, নিশ্চিন্দি। রান্নাঘরে ঢুকলেই হাঁড়ির খবর জানা-জানি। তাছাড়া অতটা মাথা-মাখির দরকারই বা কি? যতই হোক কায়স্থ।"

তা' তখনো মেয়েদের মনের মধ্যে ওই 'বামুন' 'কায়েত' সংস্কারটা রীতিমতই ছিল। সংসারের বর্তমান কর্তা সমর চাটুয্যে তখন বছর তিনেকের শিশু।

তখন বসুমতী ভরা বর্ষার নদী।

কিন্তু উদ্দামতা ছিল না বসুমতীর। সংসারে তো শুধু স্বামী-স্ত্রী আর খোকা. তবু পরিমিত হাসি, পরিমিত কথা, চলনে বলনে মার্জিত গাম্ভীর্য। রঙিন শাড়ী কদাচিৎ পরতেন, তবে চওড়া পাড়ের সখটা একটু বেশীই ছিল। চওড়া পাড় ফরসা একখানি শাড়ীতে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে টেবিলের উপর জলের গ্লাশ দিয়ে "ঠাঁই" করে রেখে ভাতের থালাটা বসিয়ে দিয়ে যেতেন এবং স্বামী অথবা শিশু পুত্রকে দিয়ে প্রশ্ন করতেন "কিছু চাই কিনা।"

কিন্তু কোন দিন কি কিছু চেয়েছেন বিজয়বাবু?

কই কিছুতেই মনে পড়লো না বসুমতীর।

লজ্জিতমুখে শুধু "না না কিছু না" করে তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে গেছেন ভদ্রলোক। খেয়েছেন কিন্তু থালা চেঁচে-পুছে নিতান্ত তৃপ্তির সঙ্গে। বাড়ীর ঝিটা হেসে হেসে বলতো, "বাবার বন্ধুর পাত থেকে পিঁপড়ে কেঁদে ফিরে যায়।"

কিন্তু বসুমতী এতে সন্তুষ্ট ছিলেন। একে তো জিনিসের 'ফেলাছড়া' অপচয় সেই ছেলেবেলা থেকেই তার দু'চক্ষের বিষ তাছাড়া এমনভাবে খাওয়ার মধ্যে রন্ধনকারিণীর প্রতি যেন একটা সম্মান প্রকাশ আছে।

স্বামীর হঠকারিতার জন্যে যে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন বসুমতী. সে বিরক্তি কখন বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সত্যিই লোকটা এত নিস্পৃহ নির্লিপ্ত যে, বাড়ীতে আছে এ কথা মনেই পড়ে না। শেষ রাত্রে উঠে সকলের ঘুম ভাঙার আগে স্নান করে নেয়, সারা সকাল চুপ-চাপ কাগজ পড়ে, দাড়ি কামায় নিঃশব্দে এক সময় অফিসের পোষাকে প্রস্তুত হয়ে এসে নীচের দালানের সেই নির্দিষ্ট কোণটিতে, লোহার চেয়ারটায় এসে বসে থাকে।

অমরবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে ডাক-হাঁক করেন, "কই গো ভাত বাড়নি? এ কী, বিজয় যে বসে! ছি. ছি, কি কাণ্ড! আচ্ছা তোমাকেও

বলি বিজয়, বরাবর পরই রয়ে গেলে ? অফিসের টাইম হয়ে গেছে, চুপ করে বসে আছ ? "বৌদি ভাতটা দিয়ে দিন' এটুকু বলতে পার না ?"

"না না এইতো এলাম, এইতো এলাম !" আরক্ত মুখে বলেন বিজয়বাবু, "আপনিও তো অফিস যাবেন।"

না, এতো অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও অমরবাবুকে কখনো তুমি বলেন নি বিজয়বাবু। নইলে বয়সে আর কতই তফাৎ ছিল ? দু'এক বছরের। কোন ছলেই গণ্ডীর বাইরে যাবার সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারতেন না বিজয়বাবু। নইলে প্রতি দিনই তো সন্ধ্যার পর অমরবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে বসেছেন বিজয়বাবুর ঘরে, কিন্তু বিজয়বাবু কি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন দিনও দোতলায় উঠেছেন ? হ্যাঁ উঠেছেন, মনে করতে পারেন বসুমতী, একদিন উঠে ছিলেন।

যেদিন হঠাৎ অফিস প্রত্যাগত অমর চাটুয্যের সহজ হৃদযন্ত্রটা বিনা নোটিশে জবাব দিয়ে বসেছিল। বসুমতী আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। ওই একটা দিনই।

হয়তো বিজয়বাবুর এই আড়ষ্টতার দোষেই বসুমতীও কখনো তাঁকে 'ঠাকুরপো' সম্বোধন করতে পারলেন না, পারলেন না ছেলেকে 'কাকা' ডাক ডাকাতে।

'ভরা বর্ষার নদী' কখন বালির চরায় মুখ লুকিয়েছে, হাতীপাড় শাড়ীর বর্ণলীলা কবে অন্তর্হিত হয়েছে নিঃসীম শাদার শূন্যতায়, এক ঢাল কালো রেশমের স্তূপ সংক্ষিপ্ত হতে হতে নিজের সবটুকু বিসর্জন দিয়েছে কাঁচির ফলায়, মাথাটা বেষ্টন করে রাখতে যেটুকু জের অবশিষ্ট আছে, তারও এখানে সেখানে কালের ধূসর স্বাক্ষর, তবু বিজয়বাবু 'বিজয়বাবু'ই রয়ে গেলেন, কোন দিন কোন প্রয়োজনেও সরে এলেন না আত্মীয়তার সীমানায়।

এখনো সেই মাথার কাপড়টা একটু টেনে দালানের কোণের সেই টেবিলটায় ভাতের থালাখানা বসিয়ে দিয়ে যান বসুমতী, এখনো অন্যের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেন 'কিছু লাগবে কিনা।'

মাধ্যমের সুবিধাও হয়েছে। অন্য একজন নতুন এসেছে বাড়ীতে।

সমরের বৌ !

মাছের তরকারির বাটিটা আজকাল সমরের বৌ-ই দিয়ে যায়, বসুমতী আর আঁশ-হেঁশেলটা ছোঁয়া নাড়া করেন না। বাটিটা বসিয়ে দিয়ে যাবার সময়

বৌটিই প্রশ্ন করে "কিছু লাগবে?" না 'কাকাবাবু' বা আর কিছু আত্মীয় সম্বোধন সেও করে না। বলতে শেখেনি।

তা' বিজয়বাবুও তো 'বৌমা' বলে ডেকে কথা বলতে শিখলেন না! প্রশ্নের উত্তরে সেই ব্যস্তভাবে 'না না কিছু না' ছাড়া আর কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

অথচ উচিত ছিল না কি বিজয়বাবুর এই নবীনা রন্ধনকারিণীর রান্নার তারিফ করে উৎসাহ দেওয়া, কিছু চেয়ে খেয়ে তার আনন্দ বাড়ানো?

কিন্তু উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকলেও উচিত কাজ করে উঠতে পারা কি সকলের পক্ষে সম্ভব?

অন্ততঃ বিজয়বাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

নইলে সমরের বিয়ের সময় 'বৌ মুখ' দেখানি হিসেবে যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন তিনি, সেটা দিয়েছিলেন কিনা আড়ালে সমরের হাতে! "তুমিই দিয়ে দিও" বলে এক রকম পালিয়েই গিয়েছিলেন বিজয়বাবু কিছুতেই পারেন নি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বৌয়ের কাছ পর্যন্ত পৌছতে!

সমর বিজয়বাবুকে ছেলেবেলা থেকে কাকাবাবু মামাবাবু কিছুই বলতো না. বলতো 'বিজয়বাবু।' এখন বিজয়বাবুও দৈবাৎ বলে, বড় হয়ে পর্যন্ত নাক সিটকে বলে 'জরদ্গব!'

অবশ্য খুব বেশী দোষও দেওয়া যায় না ওকে, বাড়ীতে একটা শক্ত সামর্থ্য পুরুষ উপস্থিত থাকতে, সেই পনেরো বছর বয়স থেকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হয়েছে তাকেই! অথচ সে লোকটা খায়-দায়। হোক তিনটে মানুষের সংসার, তবু জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কি নেই? কেবল মাত্র অমরবাবুর অফিসের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা আর দু'টো ইনসিওরের টাকা তোলাতুলির ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল বিজয়বাবুর।

ইনসিওর দু'টো যে ছিল, তাই তো জানতেন না বসুমতী। তার কোন কাগজপত্রও কখনো চোখে দেখেন নি। মাইনের টাকার হিসেব থেকে ঘাটতিও ধরতে পারেন নি কোন দিন। অমরবাবু যে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে দু'তিনবার মাইনে বাড়ার খবর বসুমতীর কাছে চেপে গিয়ে নাকি বন্ধুর নাম দিয়ে টাকা জমানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, সে কথা জানতে পারলেন বিজয়বাবুরই কাছ থেকে। সমরকে বলেছিলেন বিজয়বাবু।

সময়ের কিন্তু মনে মনে কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে সব টাকা দেন নি বিজয়বাবু কিছুটা সরিয়েছেন। নইলে অত থতমত, অত বিচলিত ভাব কেন?

বসুমতী অবশ্য এ সন্দেহের আভাস পেয়ে বিরক্ত হয়ে বকেছিলেন ছেলে তখনো নাবালক ছিল বলেই। বলেছিলেন, "ছি ছি তুই কি নীচ মনরে? আমি তো বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না, সবটাই তো চেপে যেতে পারতেন। বিজয়বাবুর নামে পর্যন্ত ছিল।"

"অতটা সাহস বোধ হয় হয়নি!" বলে বেজার মুখে সরে গিয়েছিল সময়।

তা' এ সমস্তও তো অতীত কথা!

এখন আর বসুমতী কল্পনাই করতে পারেন না সময়ের কোন ভুল-ত্রুটি কি অন্যায় মনোভাব দেখে তাকে তিরস্কার করবেন! অল্প বয়স থেকে 'বাড়ীর কর্তার' পোষ্টটা পেয়ে বড় বেশী 'কর্তা' হয়ে গেছে সময়! প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন না অভ্যাসের বশে বকাঝকা করতে যেতেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে এমন স্থির শান্তভাবে শুধু ভুরুটা একটু কুঁচকে তাকাতো সময় যে বসুমতী যেন চোখে অন্ধকার দেখতেন! ধাক্কা খেতে খেতে অভ্যাসটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা করেন, 'সময় কি বলে, বৌমা কি বলে।'

কোন কিছুতেই আশ্চর্য হওয়া অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আজ সময় এমন একটা সংবাদ পরিবেশন করে বসলো যে বসুমতী চমকে না উঠে পারলেন না। না বলে পারলেন না "সে কী!"

অবিশ্যি জানতেন বছর তিনেক ডাক্তারী পড়া পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে সময় কি না কি একটা ব্যবসা ফেঁদেছে দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে, এবং এও টের পাচ্ছিলেন সেই ব্যবসার পথ ধরে মা লক্ষ্মী যেন একটু হুড়মুড়িয়েই আসছেন। কিন্তু এটা এক মহূর্তের জন্যও আন্দাজ করতে পারেন নি যে, লক্ষ্মীর বাড় বাড়ন্ত এতটাই মাপে বাড়িয়ে তুলেছে সময়কে যে, ঠাকুরদার আমলের এই খোলামেলা আলো ধবধবে বাড়ীখানায় তাকে আর আঁটছে না; আর স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি, লক্ষ্মীমন্ত সময় লক্ষ্মীমন্তদের পাড়ায় নিজের মাপ অনুযায়ী পুরোপুরি একখানা বাড়ী তৈরী করে ফেলবে বসুমতীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

সংবাদটা জানালো সময় এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার উপলক্ষে শুভদিন দেখতে পাঁজী খোঁজার অজুহাতে। পাজী খোঁজার প্রশ্ন ভুলে বসুমতী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করলেন "সে কী!"

সমর আজকে স্বভাবগত ভুরু কোঁচকানোর পরিবর্তে একটু প্রসন্নমনে বললো, "কেমন তাক লাগিয়ে দিলাম? ওই জন্যে আগে থেকে বলিনি। তলে তলে করেছি সমস্ত।"

কিন্তু 'তাক্‌টা' যেন একটু বেশীই লাগলো বসুমতীর।

স্থির হতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো। তারপর পাঁজীটা এনে দিযে বললেন, "এ বাড়ীটার তা'হলে কি হবে?"

"ভাড়া দিয়ে দেব, আবার কি হবে!" পাঁজীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো সমব, "যা বাড়ীর চাহিদা আজকাল, এই পুরনো ছোট্ট বাড়ীটারও শ' আড়াই টাকা ভাড়া হতে পারে।"

শেষের কথাটা কানে গেল না বসুমতীর, আগের কথাটাই ধ্বক্‌ কবে প্রাণে বেজেছে। "ছোট্ট বাড়ী!" বাড়ীটা যে ছোট্ট একথা তো কই বসুমতী কোন দিন টের পান নি, সমরের চোখে ধরা পড়লো কি করে?

সমর তখন মহোৎসাহে বলছে, "এই যে পেয়েছি! তোমাদের শুভদিনেব নির্ঘণ্টেই রয়েছে ১৬ই শ্রাবণ, ২রা আগষ্ট গৃহারম্ভ, গৃহ-প্রবেশ ইত্যাদি। বাস, তোড়জোড় সুরু করো। তোমার তো আবার লক্ষ্মী-ষষ্ঠী-ঘেটু-মনসা অনেক কিছু ব্যাপার।" অনেক দিন পরে খোলা গলায় হা হা করে হেসে ওঠে সমব "তেনাদের সব সামলে সুমলে পাকড়ে নিয়ে যেতে বেশ কিছু ব্রেন খরচ করতে হবে তো? তা' ফার্ষ্ট ক্লাশ একখানা ঠাকুরঘর তুমি পাবে এবার! একেবারে তিনতলার ওপর। সিঁড়ির ঘর বটে, কিন্তু চওড়া সিঁড়িতো, ঘরটাও চওডা হয়েছে। তাছাড়া সামনে একটু ঢাকা দালান, ইচ্ছে করলে তুমি সেখানেই ছোট একটা তোলা উমুনে তোমার রান্নাটা করে নিতে পারো। একেবাবে শুদ্ধাচারে। এই সব মুরগী খেকো ম্লেচ্ছদের সংস্পর্শেও আসতে হবে না।" আরও একবার হেসে ওঠে সমর খাপছাড়াভাবে।

হয়তো মার সেই তাকলাগা মুখটা একটু নাডা দিয়ে ফেলেছিল তাকে, তাই এই খাপছাড়া স্বভাবছাড়া হাসি।

কিন্তু বসুমতী যে তবুও কথা বলছেন না।

কি দেখছেন ঘরের মেজের গায়ে?

আরও একবার চেষ্টা করে সমর। "ইয়ে তোমার বৌকে এক দিন দেখিয়ে এনেছিলাম বুঝলে? সে তো তোমার শোবার ঘর দেখে ভারী খুসি। বলে

"কি চমৎকার ছোট্টখাট্টো সুন্দর। আর মোজেক করা মেজেও মার খুব পছন্দ সই। তাই না কি মা, তুমি মোজেক করা মেজে ভালবাসো ?"

এবার বসুমতীর মুখ নড়ে।

কিন্তু বসুমতী কি এতক্ষণ কানে সীসে ঢেলে বসেছিলেন ? না, এ জগতে ছিলেনই না ? নইলে সমরের এত মুখনাড়া আর হাতপা নাড়া বৃথা গেল কেন ?

এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললেন কি না বসুমতী "এ বাড়ীটা সব ভাড়া দিয়ে যাবে বলছো তাহলে বিজয়বাবুর কি হবে ?"

এ পৃথিবীতে আদি অন্তকাল হতে ছন্দ-পতনের যতো উদাহরণ আছে, এর কাছে কি লাগে ?

অন্তত সমরের তাই মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভুরু দুটো কঠিন হয়ে জুড়ে এলো।

আরও কঠিন হলো মুখের চেহারা। সেই মুখ থেকে রায়টা বেরোলো মুহূর্তে। "বিজয়বাবুর ভাবনাটা আর তুমি আমি ভাবতে যাবো কেন ? তিনিই ভাববেন।"

স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকালেন বসুমতী। কেমন অন্যমনস্কের মত বললেন, "নিজের ভাবনা ভাববার মত মানুষই বটে! তাছাড়া ওই তো রোগের দেহ, এই বয়সে যাবেনই বা কোথায় ?"

সমর মনে মনে কিছু বললো কিনা কে জানে, মুখে কিছু না বলেই চলে গেল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে, আর ভুরুটা আরও কুঁচকে। সঙ্কল্প করেছে বাড়ীখানা একবার একটু কলি ফিরিয়ে পুরো করে একজনকে ভাড়া দেবে। রাস্তার উপরকার অত বড় ভালো ঘরখানাই যদি বেহাত থাকে, আশানুরূপ ভাড়া কি আর পাওয়া যাবে ?

ঠিক আছে বিজয়বাবুকে আজই জানিয়ে দেবে।

আর কোন কথা হয় না মায়ে ছেলেতে, কি শাশুড়ী বৌতে। শুধু বসুমতী অনুভব করতে থাকেন তলে তলে সংসার ওঠানোর গোছ চলছে। শেষ পর্যন্ত শুধু লক্ষ্মী, ষষ্ঠী ঘেঁটু, মনসাটুকুই হয়তো বসুমতীর জন্যে বাকী থাকবে, সমরের বৌ সবই ম্যানেজ করে নেবে।

সম্প্রতি একটা বাচ্চা চাকর রাখা হয়েছে সেটাকে গাধার মতন খাটাচ্ছে বৌ,

নিজেও খাটছে যথেষ্ট। তিন পুরুষের সংসারের শিকড় উপড়ানো তো কম নয়? শ্রম সময় দুইই বেশ লাগছে। কোন্‌টা নেবার যোগ্য, কোন্‌টা ফেলে দেবার যোগ্য সেটা বিবেচনা করতেও সময় চাই বৈকি।

কাল চলে যাবার দিন।

দোতলার ব্যাপার প্রায় সবই মিটেছে, রাত্রে শোবার মত বিছানাগুলো শুধু খালি মেজেয় গোটানো গোটানো রয়েছে, আর রয়েছে বসুমতীর ওই লক্ষ্মী ষষ্ঠীর সরঞ্জাম।

লক্ষ্মীর কাঠা কৌটো বৌমা হাতে করে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করবে, আলতা সিঁদুর নতুন শাড়ী পরে। এ নির্দেশ নাকি পুরোহিত দিয়েছেন, বাকী আলটু-বালটু ঠাকুরগুলি গুছিয়ে নিতে নতুন একটা টিনের সুটকেশ আনিয়ে দিয়েছে বৌমা। বলেছে, "এ একেবারে নতুন মা, গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে ওতেই সব ভরে নেবেন, তাহলে আর আপনার ছোঁওয়ার দোষ লাগবে না।"

বৌমাটির কথাবার্তা ভাল, বসুমতীর দেব-দ্বিজ আচার বিচারের ব্যাপারে তার অবহেলা মোটেই নেই, বরং পূর্ণ সহযোগিতাই আছে। সমর কোন সময় বাদ-বিতণ্ডা করলে তার সঙ্গে তর্ক করে বলে, "আচ্ছা এতে তোমার আপত্তি কিসের? বিধবা মানুষদের তো এই রকম আচার বিচার করতেই হয়। আমার দিদিমা-টিদিমাদের তো দেখেছি বরাবর।"

না, বৌয়ের ব্যবহারে কোন দোষ নেই। মায়ামমতাও আছে।

সমরই চিররুক্ষ, চিরনির্মম! ছেলেবেলা থেকে মায়ের দায় বইতে বইতেই হয়তো সর্বদা ওর 'মাতৃদায়গ্রস্ত' মানসিকতা!

লরী এসেছিল, বৌমা বাড়ীর আর যা ভারী জিনিস এখনো পড়ে রয়েছে সেই সব তোলাচ্ছিলেন তাতে। রয়েছে বৈ কি, এখনো কিছু রয়েছে, দালানের বড় দেওয়ালে বাসনের বড় র‍্যাকটা রয়েছে, এ পাশে রয়েছে দু'খানা জলচৌকী আর টুল একটা। রয়েছে লেপের চালি। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা ছেলেমানুষ বৌটা।

সব কিছু ব্যবস্থা করতে করতে ও চাকরটাকে ডেকে বলে ওঠে "দেখ দীনবন্ধু, ওই বিচ্ছিরি লোহার চেয়ারটা আর ওবাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে না, বসে বসে তুমড়ে গেছে ওটা ছাতে ফেলে রেখে আয়, আর ওই ছোট টেবিলটাকে সাবানের গুঁড়ো দিয়ে একটু ঘসে ধুয়ে তুলে দে লরীতে। ভাল

করে ধুস বাপু নইলে এক্ষুণি ঠাকুমা বলবেন ওই রে সব এঁটোকাঁটা হলো।" শেষের কথাটায় বসুমতীর কণ্ঠস্বরের সুর। এই নকল করা ভঙ্গী দেখে হিহি করে হাসতে হাসতে দীনবন্ধু মহোল্লাসে ঘড় ঘড় করে চেয়ারটা টান মেরে টেনে আনে।

পূজো করতে বসে চন্দন ঘষছিলেন বসুমতী।

বেলা হয়ে গেছে, অসময়ে পূজো করতে বসেছেন রেঁধে রেখে এসে। তাই ব্যস্ত হাত!

চেয়ারটার শব্দে চমকে হাত থামালেন। এমন শব্দ হলো কেন? এভাবে শব্দ করে চেয়ার টেনে কখনো বসেন না বিজয়বাবু। তা'ছাড়া ঠিক খাবার টাইমই কি হয়েছে! কি জানি কাজে কাজে—চন্দন কাঠ হাত থেকে নামিয়ে বেরিয়ে এলেন। এসেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দালানের ওই কোণাটার লাল সিমেণ্ট মেজেটা যেন একটা উগ্র আলোয় ফেটে পড়ছে।

চেয়ার টেবিল দু'টোর মিলিয়ে আটখানা পায়া ওখানে বসানো থাকতো, জানালার আলোটা এমন করে মেজেয় এসে পড়তো না কখনো!

পড়তো অনেক অনেক বছর আগে। সাল তারিখের হিসেব নেই, হিসেব আছে শুধু সমরের বয়েস দিয়ে। মাস আষ্টেকের ছেলে তখন সমর। হামা দিয়ে বেড়াতো ওখানে।

কিন্তু ওই আলোটা অত বেশী কড়া দেখাচ্ছে কেন? লাল সিমেণ্টের ওপর পড়েছে বলে?

ছেলের বৌয়ের দিকে তাকালেন বসুমতী।

আজ ওঁর ভুরুর গড়নটা ঠিক সমরের মতন দেখাল। বললেন, "বিজয়বাবুর খাওয়ার আগেই ওগুলো টানা-হেঁচড়া করাচ্ছ কেন বৌমা?"

বৌমা সরল চোখে তাকিয়ে বললো, "আজ থেকে তো আর উনি খাবেন না।"

বসুমতী কি রকম একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, "আজ থেকেই কেন? আজ তো দু'বেলা এ বাড়ীতে রান্নাবান্না হবে।"

"তা' তো জানি না। আপনার ছেলে বলেছিলেন ওঁকে পয়লা থেকে অন্য ব্যবস্থা করে নিতে বলেছেন না কি। আমাকে তো তাই বলে রেখেছেন।"

"উনি কিছু ব্যবস্থা করেছেন?"

বৌমা উত্তর দেয় "তা জানি না অত! আপনার ছেলে যা বলেছেন, করছি।"

অনেকটা সময় দালানের ওই ফাঁকা কোণটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বসুমতী, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "সমর বাড়ী আছে?"

দীনবন্ধু বলে, "বাড়ীতে নেই। বাইরে ওই লরী গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাবু।"

বসুমতী ঈষৎ দৃঢ় সুরে বলেন, "যা একবার ডেকে আন দিকি।"

"ডেকে? লরীর কাছে তবে দাঁড়াবে কে?"

"তুই দাঁড়াগে যা! তাড়াতাড়ি আসতে বলিস, বেলা হয়েছে, পূজো হয় নি।"

এতো অবাধ্য ছেলে তা'বলে সমর নয় যে, মা ডাকছেন শুনে আসবে না।

একটু পরেই এলো।

একটু বিস্মিত হয়েই বললো, "আমাকে কিছু বলছো?"

"হ্যাঁ!" বসুমতী ছেলের মুখের দিকে সরাসর তাকিয়ে বলেন, "বলছি। বিজয়বাবুর খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হলো?"

রাস্তা থেকে ডাকিয়ে এনে এই আয়োজনের পর বক্তব্য কিনা সেই বিজয়-বাবুর খাওয়া!

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল সমরের। বললো, "এই কথার জন্যে কাজ থেকে ডাকলে? 'কি হলো' তা আমি কেমন করে জানব, আমায় ডেকে উনি বলবেন? ঘরটাতো এখনো দিন পনেরোর জন্যে আটকে রাখলেন। ঘর খুঁজেছেন, কি কোথায় খুঁজছেন, বলবেন?"

"তা' আর কি করে বলবেন!' বসুমতী বলেন, "বলবার মানুষ উনি? কিন্তু ভালমত একটা ব্যবস্থা না হলেই বা—"

থেমে যান বসুমতী!

সমর রেগে আগুন হ'য়ে চড়া গলায় বলে ওঠে, "না হলে কি করতে হবে? ওঁকে সুদ্ধ ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হবে?"

বসুমতী একটু বিরক্তভাবে বলেন, "তা তোমার বিবেচনায় কি হয় তাই বল?"

"আমার বিবেচনায় যা হয় তাই বলেছি। হয় ওঁর নিজের ভাইপোদের কাছে গিয়ে থাকুন, না হয় তো একটা মেস-টেস ঠিক করুন। অভাবগ্রস্ত তো নয়!"

বসুমতী এবার কেমন অবুঝের মত স্বরে বলেন, "টাকার অভাবটাই না হয় নেই সময়, কিন্তু আর কি আছে মানুষটার? একটা মেস জুটিয়ে নেবার ক্ষমতাই কি আছে? না ওই পেটরোগা ধাতে মেসের ভাত খেয়ে হজম করবার ক্ষমতা আছে? আর ভাইপোদের কথা বাদ দে। জন্মাবধি দেখলো না তারা!"

"চমৎকার, নিজের ভাইপোদের কথা বাদ দিয়ে আমার ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা! কেন? কি জন্যে? ওঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি? 'পেয়িং গেষ্ট' ছাড়া তো আর কিছুই নয়? চিরদিন তাঁর ভাবনা ভাবতে হবে এমন কোন লেখাপড়া আছে?"

বসুমতী অবাক হয়ে যান ছেলের কথায়।

তিনি তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না বিনয়বাবুর খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে এখান থেকে চাটিবাটি গুটিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব। সমর আদৌ ওর এই অসম্ভাব্যতাটা বুঝতে পারছেন কেন? বেটাছেলে বলে কি এতই অবুঝ হতে হয়; ছেলের বৌয়ের দিকে তাকান বসুমতী। যেন সালিশ মানার ভঙ্গীতে। বলেন, "আচ্ছা তুমিই বল তো বৌমা, যে মানুষটা সাতাশ বছর ধরে এ বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করছে, হঠাৎ তাকে বলা যায় 'কাল থেকে তুমি যেখানে পারো খেয়ো।' তায় আবার বুড়ো মানুষ, রোগা মানুষ! এতটুকু তেল মশলার রান্না সহ্য হয় না।"

বৌমা নির্লিপ্ত মুখে বলে, "এ কথার আর আমি কি উত্তর দেব বলুন? তবে সম্পর্কের দায় যখন নেই তখন শুধু শুধু একটা দায় ঘাড়ে করার মানেও আমি বুঝি না। তেল মশলা খেলে সহ্য হয় না, এরকম মানুষ কি আর জগতে নেই? তাদের যা হয় তাই হবে।"

বসুমতী চিরদিনই নির্বোধ!

জগতের কোথায় কি হচ্ছে, পৃথিবী কোন্ তালে চলছে, বাতাস কোন্ মুখো বইছে, এ সব কোন খবরই কখনো রাখেন না তিনি। খবর রাখেন বাজার দরের, আর খবর রাখেন রান্না ভাঁড়ারের। মানুষ চিনতে তিনি সত্যিই পারেন না। তাই বৌমার কথায় আহত হলেন!

সত্যি, কিছুতেই বুঝতে পারছেন না বসুমতী, একটা নিতান্ত সহজ কথা. একেবারে সাধারণ মানবধর্মের কথা, সেটকু ওরা কিছুতে বুঝতে পারছে না

কেন? পারছে না, না- মনে হচ্ছে বুঝতে চাইছে না? কি আশ্চর্য! কি অনাসৃষ্টি!

আহত হলেন বসুমতী।

বললেন, "মেয়েমানুষ হলেও বেটাছেলের মতন কথা কইলে বৌমা? তা' তোমারই বা দোষ কি, তুমি আর ক'দিনের? সমবই যখন—কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে একটুও কি জানো না, গেরস্থর বাড়ীতে যদি একটা পোষা কুকুর বেড়ালও থাকে তো তার খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে তবে গেরস্থ নড়ে চড়ে। আর এ একটা মানুষ—"

"মানুষ বলেই তো মা!" বৌমা হঠাৎ হেসে ওঠে, "কুকুর বেড়াল অবোলা জীব, তাদের কথা ভাবতে হবে বৈকি! কিন্তু মানুষ তো আর অবোলা জীব নয়?" সহসা আরও একটু জোরে হেসে ওঠে বৌমা, "অবশ্য উনি প্রায় তাদের সমগোত্রই। কিন্তু তার জন্যে আর আমরা ভাবতে যাই কেন?"

বসুমতীর কানে ওই হাসির শব্দটা ক্ষণপূর্বের সেই চেয়ার টানার শব্দটার মত ধ্বক্ করে লাগে। একবার বৌমার মুখের দিকে তাকান, আর একবার দালানের ওই ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকান তিনি, তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর দৃঢ় স্বরে বলেন, "এ বাড়ীটা তো আমার স্বামী শ্বশুরের বাড়ী সমর? জীবনস্বত্ব অবশ্যই আছে? এখানে একখানা ঘরে পড়ে থাকতে চাইলে কি কি কেউ বাধা দিতে পারবে?"

সমর মুহূর্তে কথার টোন্ ধরে ফেলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "কেন, তুমি তা'হলে বিজয়বাবুর ঝাল মশলাহীন ঝোল রেঁধে দেবার জন্যে এ বাড়ীতেই থেকে যাবে না কি?"

"কি জন্যে থাকবো, সে কথা থাক সমর, আমার থাকার অধিকার আছে কিনা সেইটাই জানতে চাইছি। আমি যদি আমার চিরদিনের বাসকরা ঘরখানায় বাস করতে চাই, তোমার আদালতের পেয়াদা এসে টেনে-হিঁচড়ে বার করে দিতে পারে কিনা?"

সমর গম্ভীর মুখে বলে, "আদালতের কথাই যদি তুলতে পারলে তাহলে আদালতকেই জিগ্যেস কোরো মা!"

"আচ্ছা!" বলে মুখ ফিরিয়ে চাকরটাকে উদ্দেশ করে বলেন বসুমতী, "দীনবন্ধু, চেয়ারটা টেবিলটা কোথায় ফেলেছিস, এনে ঠিক জায়গায় রেখে দে।"

বৌমা আরক্ত মুখে বলে, "একজন বাইরের লোকের সামান্য 'খাওয়' দাওয়া' নিয়ে আপনি নিজের ছেলেকে ত্যাগ করবেন ?"

"বালাই ষাট! ত্যাগ করবো কেন? কিন্তু কোন্‌টা 'সামান্য' কোন্‌টা 'অসামান্য', কি বাইরের, কি ভেতরের, এ সব হিসেব বড় গোলমেলে বৌমা। বোঝা শক্ত। দেখি আমার ইষ্টদেবতা কি বলেন!" বলে এতক্ষণ পরে ফের ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসেন বসুমতী।

॥ সাবিত্রী

সকালে স্নানের সময় সিঁথিতে ঘসে ঘসে সাবান লাগাতে হয় সাবিত্রীকে। লালের আভাটুকু পর্যন্ত যাতে না থাকে। রোজই হয়। আর খুলে রাখতে হয় হাতের লোহা গাছাটা।

তারাপদ দেখে আর মুখ খিঁচিয়ে বলে, "রোজ একবার করে যদি লোহা-সিঁদুর ঘুচোতে হয় তো, সন্ধ্যাবেলা ঘটা করে সেগুলো পরা কেন? বলি কেন পরা আদিখ্যেতা করে?"

সাবিত্রীর আচার-আচরণ, বাক-বিন্যাস ভঙ্গী, কোনটাই আর যাই হোক 'সাবিত্রী'-জনোচিত নয়। তারাপদের এ ধরনের মন্তব্য সে সয়েও যায় না, উড়িয়েও দেয় না। লজ্জা পাওয়ার কথা তো ওঠেই না। বরং সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ওঠে, "জানো না কেন? নোয়া-সিঁদুর ঘুচোনোর সুখ আমোদটা রোজ একবার করে চেখে চেখে ভোগ করি।"

"তাইতো করিস!" তারাপদ আরো খিঁচোয়, "কাল থেকে খবদার আর ওসব পরবি না।"

সাবিত্রী ফর্সা শাদা ব্লাউসটার ওপর ফর্সা কালাপাড় শাড়ীখানা গুছিয়ে পরিপাটি করে পরতে পরতে মুখ ঘুরিয়ে বলে, "এই যে, তোমার হুকুমে উঠছি বসছি! আমার ইচ্ছে হলে মুছব, ইচ্ছে হলে রাখব তোমার কথায় না, বুঝলে?"

"সিঁদুর লোহা তুই কার খাতিরে পরিস শুনি? তারাপদ ভাঙ্গা হাঁটুতে হাত চেপে তেড়ে আসে, "এই লক্ষীছাড়া তারাপদ হালদারের পরমায়ুর খাতির নিয়েই তো? আমি মানা করছি, আমি দিব্যি দিচ্ছি। ফের যদি তুই খেলা-ঘরের বৌ খেলার মতন সিঁদুর মুছবি আর সিঁদুর পরবি তো দেখবি মজা। কক্ষনো করতে পারবি না।"

"রোজ করবো, নিশ্চয় করবো"—বলে জরাজীর্ণ সিল্কের চাদরখানা গায়ে

জড়িয়ে টুক্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় সাবিত্রী।

তারাপদ খানিকক্ষণ রাগে ফুঁসতে থাকে, তারপর আবার হাঁটু ঘসটে ঘসটে ঘরের মধ্যে উঠে গিয়ে সকাল বেলা সাবিত্রীর গুছিয়ে রাখা যে জলখাবারটা তেজ করে খায়নি, সেটা টেনে নিয়ে খেতে বসে।

তখন খায়নি, পছন্দ হয়নি বলে।

বলেছিল, 'রোজ রোজ আর রুটির পিণ্ডি গিলতে পারি না। কেন, দু'খানা পরোটা ভাজতে কি হাতে কুড়িকিষ্টি ধরে? লুচি কচুরী, নিমকি, সিঙ্গাড়ার তো বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি, দু'খানা পরোটা, তাও আজ পাঁচ দিন বলে বলে হয় না। গলায় দড়ি আমার, গলায় দড়ি, তাই তোর মতন পরিবারকে নিয়ে এখনো ঘর করি। ত্যাগ দিই না।'

বলেছিল, আর যে পাটা আস্ত আছে, সেই পাটা দিয়ে থালাখানা ঠেলতে ঠেলতে ঘরের কোণে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সাবিত্রীর কি উচিত ছিল না, একটু সাধ্য সাধনা করা? তারাপদ তাই ভাবে, রুগ্ন স্বামী, অনড় স্বামী, তাকে একটু মায়া মমতা করবি না?

কিন্তু সাবিত্রীনামের কলঙ্ক সাবিত্রী একবারও বলেনি 'খাও।' শুধু মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলেছিল, 'এরপর আর ওই রুটির পিণ্ডিও জুটবে না, রাস্তার ধুলো খেতে হবে মুঠো করে।'

রাস্তার ধুলো খেতে যাবে, এমন ক্ষ্যামতাই কি আছে তারাপদর? কেউ সাহায্য না করলে দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে পারে না। তাই এখন ঘসটে ঘসটে এগিয়ে গিয়ে সকালবেলার পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া থালাটাই টেনে টেনে কাছে আনে।

চার পাঁচ বছর থেকে এই অবস্থা হয়েছে তারাপদর। সামান্য একটা সাইকেলের ধাক্কায় ডান হাঁটুটা জন্মের মত শেষ হয়ে গেছে।

জায়গা ছিল কালী মন্দিরের গলি। দিনটা বোধ হয় শনি মঙ্গল কিছু হবে। মানুষের ভীড়ে আর গাড়ীর ভীড়ে কুরুক্ষেত্র চলছিল, তার মাঝখান দিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ্গা ঠ্যাঙ্গা পা দু'খানা নিয়ে প্রায় 'বন পাখীর' ভঙ্গীতে দ্রুতগতিতে আসছিল তারাপদ, তার মায়ের মন্দিরের নিত্য বরাদ্দ ভোগপেসাদের গামলাখানা নিয়ে। একহাতে বলির মাংস কাঁচা পেসাদ।

লাগল হাঁটুতে একটা সাইকেলের ধাক্কা। আচমকা ধাক্কা সামলাতে পারল

না তাবাপদ হাঁটু হুমড়ে পড়ে গেল। গেল তো গেলই, সেই ধাক্কায় সবই গেল। ভীড়ের মাথা বাঁচিযে উ চু করে তুলে ধরা পেতলের গামলায় সাজানো ভাত, তরকারি হাত থেকে ছিটকে পড়ে ভীড়ের পাযের তলায় পিষে গেল। এক হাতে ধরা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে বাঁধা বলির পাঁঠার দরুণ একপোযা কাঁচা মাংস মাটিতে পড়ে থেঁৎলে গেল।

আর গেল তাবাপদর 'মাযেব' বাড়ীব চাকরী। যে চাকরী থেকে দৈনিক দুপুরে একটা করে অন্নপ্রসাদ আর এক পো করে কাঁচা মাংস জুটতো, সন্ধ্যেয ফুলপাতা সিন্দুব চটকানো একডালা কাটা ফল জুটতো, আর জুটতো মাস গেলে ন'আনা রোজ হিসেবে গোটা সতেবো টাকা।

তারাপদর যা কাজ ছিল, তাতে ওই ন'আনাই রোজ। কিন্তু যাই হোক, যত অকিঞ্চিৎকর বোজগারই হোক, তারাপদর আর সাবিত্রীব তো পেট চলে যেত। এক গামলা ভাত দু'জনে খেযে উঠতেই পারত না বরং।

চাকরী গেল।

মাযের চবণের ফুলজল সরানোর চাকরী।

তারাপদ পারবে না বলেই নয শুধু, অঙ্গ-হীন লোক মাযের চরণ স্পর্শ করতে পারবে না বলে। হাঁটুব সঙ্গে পাযের তিনটে আঙুলও গেছে যে।

কিছুদিন পর্যন্ত তারাপদ সাবিত্রীকে খোসামোদ করত, 'যা মাযেব মন্দিরে গিয়ে আঁচলটা পেতে বসগে যা, তাতেই দুটো পেট চলে যাবে।'

প্রখরা সাবিত্রী ঝলসে উঠত, ক্ষেপে উঠত। 'কালীঘাটের ক্যাঙালী হবো? বলতে মুখে আটকালো না?'

তারাপদ প্রবোধ দিত, 'আরে বাবা ক্যাঙালী এ জগতে কে নয? রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র থেকে আরম্ভ করে দুনিযাখানাই তো ক্যাঙালী। কে না আঁচল পেতে বসে আছে? 'ভাত দাও কাপড় দাও' এ সব তো ছোট কথা। আবও কত দাও। যার সব আছে সেও ক্যাঙালীর মতন আঁচল পেতেছে 'ওগো আমায় মান দাও, যশ দাও. নৈবিদ্যি দাও, পূজো দাও, বাহবা দাও, ভোট দাও। দেখছি তো সব। এক ওই মাযের মন্দিবে বসেই জগৎখানাকে দেখছি।'

এত উদাহরণ দেখাল তাবাপদ, তবু সাবিত্রী অনমনীয। বলে, 'ও-সব ভিক্ষেতো চোখে দেখা যায না। এ যে প্রত্যক্ষ! কালীঘাটের ক্যাঙালী হতে পারবো না।'

ক্রমশঃ সাবিত্রীর সামান্য যা কিছু সোনার আঁচড় গায়ে ছিল, সে সব গেল, তারপর পৈত্রিক ঘটিবাটি পেতল কাঁসা যা ছিল তা গেল, শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর অনেকখানি তেজও গেল।

ভিক্ষে না করুক, রোজগারের চেষ্টায় পথে বেরোতে হল সাবিত্রীকে।

ভাঙা পচা ওই একতলা ঘর দু'খানা পৈত্রিক আমলের ছিল বলে তবু মাথাটা গোঁজবার আশ্রয় ছিল, নইলে পৃথিবীর জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে যেতে হত তারাপদ হালদারকে আর সাবিত্রী হালদারকে।

আরও রক্ষে, ছেলেপুলে হয়নি। শুধু দুটো পেট, দুটো মুখ।

কিন্তু সাবিত্রীর মতন মুখ্যু মেয়েমানুষের রোজগারের আর পথ কি, রাঁধুনী বৃত্তি ছাড়া? হালদার বামুনের মেয়ে, রান্নার কাজ জুটে গেল সহজেই। কিন্তু মনিবদের মস্তবড় সংসার দুবেলায় চল্লিশ পঞ্চাশখানা পাত পড়ে, জল খাবারের পত্তনই একটা পুরো রান্না। কাজেই বলতে গেলে চারবেলা রান্না। সাবিত্রী পারল না। সাবিত্রী নিজের সংসারে নিজে কখনো রেধে খায়নি, প্রসাদেই চা[illegible]।

বেশী দিন শরীর রইল না।

বেশ বড় করে অসুখে পড়ল। হাড়ির হাল করে কাটল সে ক'দিন। চাকরীটা গেল।

এবারে সাবিত্রী একটা ছোট সংসার খুঁজল।

কাজ খুঁজতে গিয়েই পুরো পেশাদার রাঁধুনীর মতন জিগ্যেস করতে সুরু করল, 'বাড়ীতে কজন লোক? ক'জন বড়, ক'জন ছোট?'

কলকাতা শহরে ভ্যারাইটির অভাব নেই। চাহিদা মত চাকরী সাবিত্রী পেয়ে গেল। কিন্তু কপালে যার সুখ নেই, তার যন্ত্রণা ভুঁইফুঁড়ে ওঠে। বাড়ীতে মেম্বার কম, গিন্নীর কাজ কম অতএব কাজের জন্যে লোক রেখে গিন্নী তার পিছনে টিকটিক করা কাজটি বেছে নিলেন। তাছাড়া—তাঁর কৌতূহল অদম্য। সাবিত্রীর জীবনেব নিভৃত কোণটুকুর পযন্ত খবর নিতে চান তিনি। চান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

স্বামী আছে, পাঁচটা ছেলেমেয়ে নেই। তবে সাবিত্রী চাকরী করতে বেরোল, কেন, এই তাঁর প্রশ্ন! কেন বেরোল, সে সত্য প্রকাশ করলেই চুকে যেত, কিন্তু সাবিত্রীরও গোঁ, বলবে না তার স্বামী খোঁড়া, স্বামী ঘরে বসে থাকে।

বলে যে, স্বামীর টাকা ধার শোধে যায়।

ধার শোধে?

তা' এত ধারই বা করল কোন্ উপলক্ষে? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়নি, ছেলের পৈতে দিতে হয়নি, ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়নি।

তা' কত কি থাকে মানুষের। সাবিত্রী বলে নানা রোগ হয়েছিল এর আগে স্বামীর তাতেই ধার।

ওমা, গেরস্থ ঘরে এত কি চিকিৎসার খরচ? সাহেব ডাক্তারকে দেখিয়েছ নাকি? অবশ্য বুঝে তো ব্যবস্থা। আর তিন কুলে কেউ নেইও নাকি? বাপ মা, ভাই, বোন?

প্রশ্নের জ্বালায় সে কাজ ছেড়ে দিল সাবিত্রী।

তারপর বারে বারে ঘাট বদলে বদলে অনেক ঘাটের জল খেল, কিন্তু দেখল সব ঘাটের জলই একটা জায়গায় এক। মুখে দিলেই লোনা।

সাবিত্রীর স্বামী আছে, পাঁচটা ছেলেপুলে নেই তবে সাবিত্রী রাঁধুনীগিরি করবে কেন, এ প্রশ্ন সবাইয়ের মনে। কারো বা সেটা মুখে ফোটে, কারো বা চোখে ফোটে।

সাবিত্রী বলতে সুরু করল স্বামীর রোজগার কম, কুলোয় না।

ঠিক আছে। কিন্তু কেন বল? কোথায় কাজ করে? কি কাজ করে?

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আবার দু'একজন বললেন, হাতে টাকা আছে। একদিন এনো তো তোমার বরকে। দেখবো কিসে নন্দিনীর বরণ।

সাবিত্রী যে দেখতে একটু ভাল, সাবিত্রীর যে বয়েস কম, এইটাই সকলের যন্ত্রণা!

কিন্তু ভুল সাবিত্রীরই।

খোঁড়াকে খোঁড়া বললেই সব মিটে যেত। বলে না। এতটুকুও বলে না।

কাজেই কাজ ছাড়া আর ঘোরাঘুরি। অবশেষে গোঁয়ে একটু ভাঙন ধরল। বলতে লাগল স্বামীর অসুখ।

অসুখ!

চোখ কপালে উঠে গেল মনিবের। কি অসুখ? কত দিন ভুগছে? কোনও খারাপ রোগ নয় তো? না বাবা দরকার নেই, পিছটানওলা লোকে কাজ নেই তাঁদের।'

একজন তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলেই বসলেন, 'না বাছা এ ধরনের লোক খুঁজছি না আমি। তুমি সধবা মানুষ, বয়েস কম, কাজ করতে করতে কাচ্চাবাচ্চাই না হয়ে পড়ল, বলা তো যায় না। ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই আমি। নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা মানুষ চাই।'

সেই ভদ্রমহিলার কথার মধ্যে যেন সাবিত্রী অনেক দিনের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেল।

নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা যেন তার কেউ অত প্রশ্নমুখর হয়ে ওঠে না। বিধবা, তিনকুলে কেউ নেই, কাচ্চা-বাচ্চা বলতে নির্ঝঞ্ঝাট, বামুনী চাকরাণী রাখতে সবাই চায়।

পাড়া ছেড়ে অনেক দূরে—এগিয়ে গেল সাবিত্রী, কাজ করতে। সংস্কার ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেল সে কাজে প্রশ্নহীন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করতে।

পরনে শাদা ব্লাউজ, শাদা কালো পাড় শাড়ী, গায়ে সিল্কের চাদর। সিঁথির রেখা। বিধবাত্ব স্পষ্ট ছিল, মণিবন্ধে একগাছি কেমিক্যাল চুড়িতে যেন বক্তব্যকে অস্বীকারের ক্ষীণ প্রয়াস।

কেউ কোথাও নেই।

পিছুটানে কেউ না। কিন্তু তাতেও প্রশ্ন থেকে যায়।

তবে দু'বেলা বাড়ী গিয়ে কি করে সাবিত্রী। একজনের জন্যে বেঁধেই বা খাবে কেন? মনিববাড়ী থাকলেই পারে।

বাঃ, প্রশ্নের কি তার উত্তর নেই? শ্বশুরের ভিটেখানা যে রয়েছে। আর রয়েছে গৃহবিগ্রহ। তাতেই তো গৃহবদ্ধ সাবিত্রী। সেই দামোদর শিলার জন্যে ভোগের অন্ন যে রাঁধতেই হবে। শ্বশুর শাশুড়ী এই এক ঠাকুর গলায় গেঁথে দিয়ে কম জব্দ করে রেখে গেছেন সাবিত্রীকে?

যাক, এতদিনে যেন পায়ের তলায় মাটি পায় সাবিত্রী। আর কারো চোখের কোণে সন্দেহের ছুরি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায় না। যেখানে 'ঠাকুর' সেখানে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা।

মৃত শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা, গৃহদেবতায় ভক্তিমতি আচার-পরায়ণা বিধবা সাবিত্রীকে সবাই সমীহ করে চলে, 'মান্য করে'। ঘরে ওর একটা রক্তমাংসের মানুষ আছে ভাবলেই অনেক অস্বস্তি। পাথরের পুতুল আছেন, শুনলে কান জুড়োয়, প্রাণ জুড়োয়।

এ বাড়ীর গিন্নী স্নেহশীলা, ভক্তিমতি।

একাদশী দ্বাদশীতে ইচ্ছে করে সাবিত্রীর হাতে একটু মিষ্টি গুঁজে দেন, পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সাবিত্রীর ঘরের দামোদরের নাম করে শশাটা কলাটা ধরে দেন।

তিনিই একদিন পাড়লেন কথাটা।

বললেন, 'আমার সংসারে তো কাজ কম, তোমার সময় বেশী লাগে না আর একটা ছোট্ট কাজ করতে পারবে বামুন মেয়ে?'

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকাল।

যে মূর্তি তারাপদ দেখে, সাবিত্রীর সে মূর্তি বাইরের জগতে অচেনা। বাইরে সে শান্ত স্বল্পভাষী।

গিন্নী বললেন, 'আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই বিয়ে থাওয়া করে নি, মা-টি আর ছেলেটি ছিল। সম্প্রতি মা মারা গেছেন, কিন্তু চাকর-বাকরের হাতে মোটে খেতে পারে না, কষ্ট পাচ্ছে। তুমি যদি আমার কাজ সেরে গিয়ে ওই একটা মানুষের রান্নাটুকু করে দাও। তার হচ্ছে বেলায় কাজ, দশটায় গেলেই হবে।

শঙ্কিত সাবিত্রী বলল, 'বাড়ীতে আর কেউ নেই?'

'আর ওই একটা চাকর আছে। একলার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না বামুন মেয়ে, সে ভাই আমার দেবতা। সোনায় কলঙ্ক আছে তো, তাতে কলঙ্ক নেই। আর তোমাকেও তো দেখছি বাছা! এ কালে এমনটি চোখে পড়ে না। তাই তো বলছি সাহস করে। জানি, সাহসের মান তুমি রাখবে।'

ঝট করে চোখ নামাল সাবিত্রী।

হাঁ, সাহসের মান সে রাখবে।

বললে, 'কবে থেকে করতে হবে বলুন?'

'আজ পারো তো কাল বলি না।'

একটা কেরোসিন ষ্টোভ, একটা স্পিরিট ষ্টোভ, একটা প্রেসার কুকার, একটা ইলেকট্রিক-হিটার, আর একটা ইকমিক্। একজনের রান্না, দশ রকম সাজ সরঞ্জাম। দেখে শুনে সাবিত্রী বসে পড়ে, বলে 'এত কি হবে কেষ্ট?'

কেষ্ট চুপি চুপি বলে, 'পাগল পাগল বামুনদি, বদ্ধ পাগল! আমার রান্না পছন্দ হয় না, তাই বলে, 'নিজে রাঁধবে। এসব হচ্ছে কিসে সুবিধে হয়, কিসে

সহজে শীগ্‌গির হয়, তার পরীক্ষে। তা পারলে তো? না খেয়ে জান যাচ্ছে। ও বাড়ীর পিসিমা তাই তোমাকে ঠিক করে দিল।'

অতঃপর বাবুর সম্পর্কে অনেক তথ্যই পরিবেশন করে কেষ্ট হেসে হেসে। সাবিত্রী হাঁ করে শোনে। হাঁ করবে না তো কি, সাবিত্রীর জীবনে এমন মানুষ কবে দেখেছে? যে মানুষ মাইনের টাকা এনে চাকরের হাতে ধরে দেয়, ধোপা দশটা জিনিষ হারিয়ে দিলে টের পায় না, চাকরকে শীতে লেপ আর বর্ষায় ওয়াটারপ্রুফ দেয়, এবং সে সিনেমা থিয়েটার দেখতে চাইলে শুধু যে ছুটিই দেয় তা নয়, দেখতে টাকাও দেয়।

'মানুষ দেবতুল্য' কেষ্ট বলে, 'তবে কিনা জ্ঞানগম্যি বলে কিছু নেই।'

জ্ঞান-গম্যি যে নেই, এ কথা ক্রমশঃ সাবিত্রীও টের পায়। মনিব হঠাৎ রান্নার মাঝখানে এসে বসে পড়ে মহোৎসাহে বলে, 'রোস সাবিত্রী, আমি তোমায় একটা নতুন রান্না শেখাই।' বলে আর জল ঢেলে বাসন ছড়িয়ে একাকার কাণ্ড করে শেষ পর্যন্ত কেষ্টর কাছে বকুনি খেয়ে সরে যায়, এবং সরবে বলে, 'হতো ঠিকই আর একটু হয়ে হলেই—'

কেষ্ট বলে 'হাাঁ গো বাবু, আপনি যানতো—! বামুনদিকে রাঁধতে দেন। ওকে বাড়ী ফিরতে হবে না কি?'

লজ্জিত হয় তখন মনিব।

বলে 'ইস তাইতো, দেরী করিয়ে দিলাম তোমার সাবিত্রী। রাগ করনি তো?

রাগ কেষ্ট করে। বলে 'চাকর-বাকরকে কি ওকথা বলতে আছে বাবু? মনিবের ওপর রাগ করবে?' মনিব বলে, 'কেন করবে না? মানুষ নয়?'

আবার এমনও অনেক দিন হয়, মনিব রাঁধুনীকে ডেকে বলে, 'এত বেলা হয়ে গেছে, তুমিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নাওনা সাবিত্রী! খিদে পেয়েছে তো?'

সাবিত্রী আগে আগে কথা বলত না, ঘোমটা দিত, এখন জোর গলাতেই কথা বলে। উপায় কি, যেমন মানুষ! ও কথার উত্তরে বলে, 'খেয়ে যাব মানে? আমি কি আমার চাল নিয়েছি!'

মনিব নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে বলে, 'তাতে কি, আমাদের না হয় একটু কমই হল!....কি বলিস কেষ্ট, দুজনের ভাত তিন-জনে ভাগ করে খাওয়া যায়, না? কত তো বেশী বেশী হয়।'

কেষ্ট হাসে। বলে, "কি, বামনদি খাবে?'

সাবিত্রী তাকে বকে ওঠে, 'তুই থাম্ দিকি কেষ্ট!'

মনিব আরও ম্রিয়মাণ হয়ে বলে, 'তা' চাল তো চারটি বেশী নিলেই পারো সাবিত্রী।'

সাবিত্রী অনেক সংস্কার ত্যাগ করে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাই ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে 'কী যে বলেন। বামুনের বিধবা এই সব হেঁসেলে খেতে পারে, না খায়!'

'ওঃ ইস। ছি ছি। ধ্যেৎ।'

তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায় পাগলা মনিব।

কেষ্ট বলে, 'বাবু ওমনি। নিত্য ঠাকুমাকে বলে বসত, 'রান্না যা হয়েছে মা ফার্স্ট ক্লাশ, খেয়ে দেখো বুঝবে।'

ঠাকুমা রাগ করে বলতো, 'হতভাগা ছেলে ওই সব আমি খাই?'

তখন ভয়ে এমনি করে ছুট মারতো।

সাবিত্রী চুপি চুপি বলে 'এই পাগলাপনার জন্যেই মা বিয়ে দেয়নি, কি বল কেষ্ট?'

'তাই হবে।' বলে কেষ্ট নিজের কাজ সংক্ষিপ্ত করে।

কিন্তু কেন কে জানে, পুরনো চাকরীর ওপর এই বাড়তি চাকরীর কথাটা সাবিত্রী তারাপদর কাছে বলে না। কেন বলে না, সে কথা হয়তো সাবিত্রীর অন্তর্যামীও জানে না।

বলতে ইচ্ছে হয় না।

জানে না তারাপদ।

কাজেই মেজাজ তার ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠে ওঠে। সাবিত্রীর ফিরতে রোজ বেশ খানিকটা দেরী সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। রোজই বাড়ী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হবে যায় একপালা।

কুৎসিত ভঙ্গীতে মুখভঙ্গী করে তারাপদ বলে, 'এতক্ষণ হচ্ছিল কি? মনিবের সঙ্গে নতুন করে সোহাগ বাড়ছে বুঝি? তাই বেলা দুপুর অবধি তার গোয়ালে ধোঁয়া দিচ্ছিলি।'

সাবিত্রী দাওয়ার ধারে বসে আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, 'বাড়ছেই তো সোহাগ। থাকবোই তো বেলা দুপুর অবধি। যতক্ষণ

বাড়ীর বাইরে থাকি ততক্ষণই শান্তি। ওই শ্রীমুখের বাক্যি শুনতে হ'য় না।

'হুঁ', এ শ্রীমুখের বাক্যি এখন তো তেতো লাগবেই অনেক নতুন মুখ দেখছিস যে। কদর বাড়বে বলে বিধবার সাজে সেজে যাচ্ছিস সোহাগের মনিবের মন ভোলাতে! বুঝি না কিছু আমি?'

'তা' আর বুঝবে না কেন!' সাবিত্রী সভা চল্যে বলে 'খোকা তো আর নও। মন্দ মেয়েমানুষ চোখে কখনো দেখনি, তাও না।'

'পোড়া মুখে কিছু আটকায় না যেন বলতে। লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ! যা খুসি তাই বলিস যে!

সাবিত্রীও সমান তেজে বলে, 'বলবো না কেন? তোমাকে আমি পরোয়া করি? পরিবারের রোজগারে বসে খেতে হয় যার, তার আর অত নাক নাড়া সাজে না, বুঝলে?'—বলে উনুন ধরিয়ে কাপড় কাচতে যায় সাবিত্রী।

আবার এক প্রস্থ রান্না!

সেই আদি থেকে অন্ত।

দিনে তিন দুগুণে ছবার করে রান্না।

চাল ধোয় আর ভাবে সাবিত্রী। কিন্তু গাগনা বাবুর বাড়ীর রান্নায় যেন কোন কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই। সে যেন খেলা, না গান গাওয়া! বাড়ীটায় ঢুকলেই প্রাণটা আহ্লাদে ভরে ওঠে। শরীরে শক্তির জোয়ার আসে।

হবে না কেন, কেমন মানুষের বাড়ী! মানুষ তো নয় দেবতা, বাড়ীতো নয়, মন্দির। ধূপ-ধুনো জ্বলে না, তবু যেন মনে হয় ধূপ ধুনোর গন্ধ খেলছে।

আর এই উনচুটে বাড়ীতে এসে ঢুকলে? আগুন, আগুন জ্বলে ওঠে মাথা থেকে পা অবধি। এ গলিতে ঢোকার আগে থেকেই আগুনের সুরু।

একে স্বামী, তায় খোঁড়া অনড়, তাকে খাওয়ার খোঁটা দেওয়া মহাপাপ, তা কি বোঝে না সাবিত্রী—। কিন্তু মানুষের শরীর তো তার। তুমিই বা কেমন স্বামী যে, সাত ঘণ্টা খেটে এসে ঢুকল যে মানুষটা তাকে অকথা-কুকথা গাল মন্দ!

ছি ছি! কত জন্মের পাপ ছিল, তাই এমন ইতর ছোটলোকের হাতে পড়েছিল সাবিত্রী।

বামুন।

বামুনের মুখে মারো ঝাঁটা! ওই তো মানুষ দেখে আসছে সাবিত্রী। সে না কি কায়স্থ, তারাপদ যাদের শুদ্দুর বলে। অমন শুদ্দুরের পা ধোওয়া জল খেলেও তারাপদর মতন বামুন তরে যায়।

উঃ সাবিত্রী যদি শুদ্দুরের ঘরের মেয়ে হত তাহলে অন্ততঃ তারাপদর হাতে পড়তে হত না তাকে।

কিন্তু কার হাতে তবে পড়ত সাবিত্রী?

কার হাতে পড়লে সুখী হতো?

উঃ পাগলা না পাগলা!

কি বলে আর কি না বলে! কি কাণ্ডই করল আজ! ভাগ্যিস তখন কেষ্ট বাজারে গিয়েছিল। রাস্তায় আসতে আসতে ভাবনার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। তারাপদর ভাত বাড়তে বাড়তে ভাল করে ভাবতে চেষ্টা করল সাবিত্রী তখনকার কথাটা। ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়, তবু ভাবে।

তখনও সেই ভাত বাড়ার সময়।

দু'হাতে থালা নিয়ে আসতে গিয়ে মাথার কাপড়টা গেল খস্ করে খুলে। সাবিত্রী ভেবে পায় না কি করে। কোন রকমে থালাটা পাতের সামনে নামিয়ে, দিয়ে হাত উল্টে ঘোমটা টানতে যাবে, আর ঠিক সেই মহা মুহূর্তে বাবু খপ্ করে সাবিত্রীর একগোছা চুল ধরে বলে উঠল, 'ইস সাবিত্রী তোমার কত চুল! আর কী বাহার!'

সাবিত্রীর যে অনেক চুল, আর সে চুলের অনেক বাহার, একথা সাবিত্রী জীবনে এই প্রথম শুনল। তবু সাবিত্রী গম্ভীর হল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'এত লেখা-পড়া শিখেছেন বাবু, আর কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় শেখেন নি! দাসী-বাঁদীদের চুলের বাহারের কথা মনিবের বলতে আছে?'

সাধারণতঃ পাগলাবাবু সব তাতেই একটু অপ্রতিভ হয়। কিন্তু আজ হয়নি। আজ সেও গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'তোমাকে আমার দাসী-বাঁদী বলে মনেই হয় না।'

'তবে কি মনে হয় শুনি?'

'এমনি', ভাতে ডালে চটকে মাখতে মাখতে পাগলাবাবু বলেছিল, 'এমনি বাড়ীরলোক বলে মনে হয়।'

'বাড়ীর লোক মানে ?' ভুরু কোঁচকায় সাবিত্রী।

'মানে আবার কি!' পাগলাবাবুও রেগে গিয়ে বলে, 'এমনি যেমন বাড়ীর লোক হয়। মা বোন বৌ এই রকম আবার কি ?'

সাবিত্রী ফস করে বলে বসেছিল, 'আপনি সময়ে একটা বিয়ে করলে ভাল করতেন বাবু! বিয়ে না করেই আপনি এ রকম নাবালক থেকে গেলেন। বিয়ে না করলে পুরুষ মানুষের বুদ্ধি পাকে না। করেন নি কেন বলুন তো।'

পাগলাবাবু বলেছিল, দিব্যি সহজেই বলেছিল, 'কি জানো সাবিত্রী, মেয়ে-টেয়ে দেখলেই আমার বরাবর কেমন ভয় লাগত। তাই মা যখনি বিয়ের কথা বলতো 'না না' করতাম।

'কই এখন তো আর ভয় লাগে না।'

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছিল সাবিত্রী।

পাগলাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'ও বাবা, করে না আবার! খুব করে। রাস্তায় তো শুধু নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটি।'

তবু সাবিত্রীর কথা বলায় পেয়েছিল।

ভূতে পাওয়ার মতই প্রায়।

'কই আমাকে দেখে তো ভয় করে না আপনার।'

তারপরটা আর যেন ভাবতে পারে না সাবিত্রী, ভাবতে গেলে চোখে ধোঁয়া দেখে। পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল,—ঠিকই বলেছিল কেষ্ট। আর নয় তো একেবারে অবোধ শিশু।

অবোধ শিশু যেমন স্বচ্ছন্দে সাপের ছানাটা তুলেও মুখে দিয়ে বসে, পাগলাটা তেমনি স্বচ্ছন্দে বলে বসেছিল 'তোমার কথা আলাদা। তোমায় এত আপনার মনে করি তোমায় দেখে ভয় করবো কেন।'

উঃ কি করে যে সেখান থেকে রান্নাঘরে পালিয়ে এসেছিল সাবিত্রী, ঈশ্বরই জানেন। কতক্ষণ যেন বুকের কাঁপুনি থামে নি। তা' এখনি কি থেমেছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে ওঠে তারাপদ 'ভাত বাড়তে বাড়তে কোন-ভাবের লোকের কথা ভাবছিস। জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছিস না কি। আঁচল

খসে পড়ে ডালের বাটিতে মাখামাখি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস? একেবারে ম্লেচ্ছ বনে গেল!'

না সাবিত্রীর চুলের বাহারটা দেখতে পায় না তারাপদ, তার আচার-ভ্রষ্টতাটা দেখতে পায়।

কিন্তু আশ্চর্য! তারাপদর এতবড় কটূক্তির উত্তর দেয় না সাবিত্রী। শুধু নিঃশব্দে আঁচলটা তুলে নিয়ে ধুতে চলে যায়।

খেতে খেতেও খিঁচোয় তারাপদ, 'কাল থেকে আগে যেমন টাইমে ফিরতিস, তেমনি ফিরবি। আমার বিশ্বাস মন্দ' হচ্ছে, তুই রোজ রোজ আর কোথাও যাচ্ছিস।'

বলে, আর অবাক হয়ে তাকায় তারাপদ। কই সাবিত্রী তো কোমর বেঁধে তেড়ে আসে না। বলে না, যাই-ই তো, একশো বার যাই। তা গেলে তুমি কি করবে শুনি। ক্ষ্যামতা থাকে তো টিকটিকি পুলিশ হয়ে যেও পিছু পিছু!

না, কোন কিছুই বলে না সাবিত্রী। শুধু কাছে এসে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আর ভাত চাই?'

'উচ্ছন্নে গেছিস! উচ্ছন্নে গেছিস! নির্ঘাৎ মন্দ হচ্ছিস!' বিড়বিড় করে বলে তারাপদ।

সাবিত্রী যেন অন্য হয়ে গেছে। কেমন এক রকম ভদ্র ভদ্র। যেন এ বাড়ীতে ওকে মানাচ্ছে না। সাবিত্রীর ওই এ বাড়ীতে বেমানান চেহারাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে তারাপদ, 'মন্দ না হয়ে গেলে, তোর চোখের চেহারা অমন মরামাছের মত দেখায় কেন? তোর সে তেজ কোথা গেল? মেয়েমানুষের তেজ গেছে মানেই চরিত্তির গেছে?'

তবুও তেজ দেখায় না সাবিত্রী। শুধু উঠে যায়। আর উঠে যাবার সময় শান্ত গলায় বলে যায়, 'বেশ তো চরিত্তির খারাপ পরিবারের হাতে আর খেয়ো না।'

ঘরে গিয়ে অন্ধকার দেখা চোখে দিশেহারার মত ভাবতে থাকে সাবিত্রী। সে কি কাজ ছেড়ে দেবে? সে তো সত্যিই তারাপদর কথার উত্তর দিতে পারল না। সে তো বোঝে চরিত্তির শুধু এই দেহখানারই বজায় রাখলে

সব মিটে যায় না, মনেরও চরিত্তির রাখতে হয়। পর-পুরুষকে ভাল লাগাও পাপ।

কিন্তু সকাল হতেই চাকরী ছাড়া হয় না। কে যেন সহস্র বাহু দিয়ে টানতে থাকে। ও বাড়ির স্নেহশীলা মনিবানী বলেন, 'বামুন মেয়ে, তোমার শরীরটা কি ভাল নেই। রান্না তো তেমন ভাল দেখি না আজকাল।'

সাবিত্রী থতমত খায়। রান্না ভাল করবার চেষ্টা করে। শতবার ভাবে এই মুখে বলে বসবে, 'ও' জায়গায় চাকরী পোষান আর পারব না আমি। আপনার ভাইয়ের জন্যে অন্য লোক দেখুন।'

বলতে পারে না।

দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা আর আতঙ্ক, এই দুটোর টানাপোড়েন চলে, আর আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে যেতে থাকে সাবিত্রী।

আর সব কিছু খারাপ লাগে না।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য পড়ল সকালে আর সিঁথিতে সাবান ঘষতে হচ্ছে না। কতদিন থেকে যেন সিঁদুর পরতেই ভুলে গেছে। যে সিঁদুর তারাপদর অত খিচুনি সত্ত্বেও দিনান্তে একবার অন্তত পরতে ভুলত না। তারাপদর কল্যাণ কামনা করতো, আর মোটা করে বেশী লাগাতো। মানত মানতো মা কালীর কাছে।

সাবিত্রী কি তবে সত্যিই পিছিয়ে যাচ্ছে?

স্বামীর কল্যাণ অকল্যাণেও কিছু এসে যায় না তার?

যাচ্ছে, সাবিত্রী খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নইলে নিজের বাড়ী তার এত বিষ লাগে কেন আজকাল? কেন শুধু ইচ্ছে করে সেই একখানি ছবির মত ছোট্ট বাড়ীর ঠাণ্ডা চৌকাঠে বারান্দার কোণে চাটাই বিছিয়ে পড়ে থাকে।

সারাদিনের এত খাটুনি সত্ত্বেও শরীর ঘুম আনতে চায় না, আকাশ-পাতাল ভাবনা আসে। এ তার কি হল। পরপুরুষের দিকে মন এত টানে কেন। সে না বামুনের মেয়ে? না কা[illegible]রেই না বাস তার।

কিন্তু আবার সকাল হলেই—শাদা ব্লাউস আর শাদা কালাপাড় শাড়ী টানতে থাকে তাকে। নীরবে পরে, বেরিয়ে যায়।

তারাপদর খিঁচুনিতেও আজকাল যেন ভাটা পড়ে এসেছে। তবু সে জড়িয়ে জড়িয়ে, যাবার সময় বলে, যাচ্ছিস তো বামুন-বিত্তি করতে, রোজ এত ফর্সা

পোষাকের ঘটা কেন শুনি ?'

কথার ঝঙ্কার গেছে, আছে শুধু শব্দের শবদেহ। সেই শবটুকু দিয়ে বলে সাবিত্রী, 'বাসন মাজতে তো যাচ্ছি না। ময়লা কাপড়ে গেলে হাতে খেতে প্রবৃত্তি হবে মানুষের ?'

সে কথা পাগলাবাবুও বলে, 'এই তুমি কেমন ফসা কাপড় পরেছ সাবিত্রী! দেখলে ভাল লাগে। আরকেষ্টা রাঁধতে আসবে একটা তেলচিটে হাফপ্যাণ্ট পরে। হাতে খেতে প্রবৃত্তি হয় ?'

কেষ্টাকে সেদিন বলে সাবিত্রী, 'এই ফর্সা কাপড় পরতে পারিস না ?'

কিন্তু কি থেকে যে কি হয়ে যায়, কেষ্ট ফট্ করে একটু মুচকি হেসে বলে বসে, 'আমার আবার ফর্সা ময়লা। আমার দিকে তো আর কেউ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না বামুনদি!'

পা থেকে মাথা অবধি একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়। সাবিত্রী হাতের খুন্তি ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'কি বললি।'

কেষ্ট অপ্রতিভভাবে বলে, 'ঠাট্টা করেছি বাবা, ঠাট্টা করেছি।'

সাবিত্রী গম্ভীর হয়ে বলে, 'ঠাট্টা! তুই করবি আমায় ঠাট্টা। অভাবে পড়ে কাজ করতে এসেছি বলে ভাবিসনে কেষ্ট, পায়ে মাথায় এক হয়ে গেছে।'

পায়ে মাথায়! উদাহরণটা চাবুকের মত।

কেষ্টরও শরীরে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে। সে বলে, 'তা' তো বটেই বামুনদি! তোমার সঙ্গে আমি ? এই দেখনা কেন, ওবাড়ীর পিসিমার সঙ্গে কথা কয়ে তোমাব মাইনে ঠিক হয়েছিল দশ টাকা, বাবু আমার হাত দিয়ে এই তিরিশ টাকা পাঠিযে দিয়েছে তোমায় দিতে। আমায় দেবে তা ?'

'তার মানে।' ঠিকরে ওঠে সাবিত্রী।

'মানে তুমিই জানো। বাবুর মায়ার শরীর,' হিংসুটে কেষ্ট হাসে, বলে—'বাবু বললে, 'আহা দশ টাকায় ওর কি করে চলবে কেষ্ট। গরীব মানুষ! এইটা দিয়ে দিগে তুই, আমার বলতে লজ্জা করে।'

সাবিত্রী নিঃশব্দে এঁটো হাত ধুয়ে টাকাটা হাতে নেয়, তার থেকে একটা নোট আঁচলে বেঁধে, বাকী দু'খানা নোট নিয়ে এ ঘরে এসে বলে, 'টাকা আপনার বেশী থাকে বাবু, রাস্তার ভিখিরিকে দেবেন। আর আমিও ভিক্ষের ভাত খেতে হয়তো মায়ের মন্দিরে আঁচল পেতে বসবো। বড় মানুষ মনিবের দয়া

হাত পেতে নিলে আমাদের জাত যায়। রান্নার কিছু বাকী আছে, কেষ্টকে বলে যাচ্ছি। ওবেলা থেকে আমি আর আসবো না।'

দুটি বিমূঢ় অভিভূত চোখের সামনে থেকে সরে এসে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে আসে সাবিত্রী।

পরপর দু'দিন দেখে তারাপদ আর থাকতে পারে না, বলে, 'কিরে, কাজে যাচ্ছিস না যে বড় ?'

'যাচ্ছি না ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'ইচ্ছে হচ্ছে না! বাঃ!' তারাপদ প্রমাদ গণে, বলে, 'তোর ইচ্ছের বশে মনিব চলবে ?'

'মনিব আবার কিসের!' সাবিত্রী গম্ভীরভাবে বলে, 'মনিব টনিব কেউ নেই আমার। আমিই আমার মনিব।'

'ও! চাকরী গেছে বুঝি।'

'গেছে!' সাবিত্রী ঘুরে দাড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'সাবিত্রী বামনীর চাকরী কখনো যায় না। সে নিজেই ছাড়ে। চাকরী আর করবো না আমি।'

ভবিষ্যতের ভয়ে ক্ষিপ্ত তারাপদ খিঁচিয়ে ওঠে, 'চাকরী করবো না! করবি না তো চলবে কিসে ?'

সাবিত্রী উদাস গম্ভীর মুখে বলে 'ক্যাঙালাদের যাতে চলে। চাকরী যদি আমি চিরকাল না করতে পারি! চিরকাল যদি গতর না চলে, জোর আছে কিছু? কাল থেকে ভিক্ষেয় বসবো। 'ভিখিরি' ছাড়া আর কে কি ভাবে আমাদের!'

॥ মহুয়া মাদল

গোঁফ নেই, গোঁফের রেওয়াজও নেই, মিথ্যে জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালটা বাদ দিতে গিয়ে পুরুষের প্রধান পৌরুষ ভঙ্গীটাই গেছে বাদ। জুত করে একটু গোঁফে তা দিলে যেমন বিশ্বনস্যাৎ ভাবটি ফোটে, তেমন আর কোন ভঙ্গীতে?

কিন্তু উনবিংশের ফ্যাশান তো আর বিংশে চলে না! অথচ ভঙ্গীটা চাই। ওই বিশ্বনস্যাৎ ভঙ্গী। তাই বিকল্পে টাই স্যুট পরা টিপ্‌ টপ্‌ শরীরটার কোনাচে খোঁচ দুটোকে মাঝে মাঝে একটু ঝাঁকিয়ে নিতে হয়, হয় হাত দুটো একটু কায়দার সঙ্গে উল্টোতে। যার নির্গলিতার্থ অর্থ "কি জানি মশাই, আপনারাই বোঝেন।'

কিন্তু আজ আর সেন সাহেবের এ কায়দা তাকিয়েও দেখল না শোভেন ঘোষাল, সেন সাহেব অনুমতি করবার আগেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, "ব্যাপার তো বেশ গড়িয়ে এল স্যার।"

"কেন, আর নতুন কি হ'ল?"

প্রবল ঔৎসুক্যকে অবহেলার ছদ্মবেশ পরিয়ে আসরে নামলেন সেন সাহেব।

ইতিমধ্যে ঘোষাল পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে ফেলে, এবং যদিও কেউ নেই, অথবা বিনা তলবে কি বিনা এত্তালায় হুট করে ঢুকে পড়বারও সম্ভাবনা নেই, তথাপি গলাকে খাদে নামিয়ে বলে, "ইস্তাহার তো ছাপতে চলে গেছে। অনেক চালাকি খেলিয়ে প্রেস থেকে একটা গ্যালি প্রুফ বার করে এনেছি। ভাষার বহরটা একবার দেখুন স্যার!"

কাগজটা বাড়িয়ে ধরে ঘোষাল ওপরওলার নাকের সামনে।

নাঃ, আর ছদ্মবেশ বজায় থাকে না। "কই দেখি"—সেন সাহেব খস করে টেনে নেন কাগজটা।

তা ভাষাটা ওজস্বিনী সন্দেহ নেই।

মুনাফাবাজ মালিকের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট শ্রমিকের অভিযোগের ভাষা যতটা ঝাঁজালো হওয়া উচিত তা হয়েছে, এবং পরিশেষে সংকল্প মন্ত্র পাঠ, একটি সর্বদলীয় পাকা-পোক্ত ইউনিয়ন গড়ার জন্য। যে ইউনিয়ন, কর্মীদের সর্ববিধ স্বার্থ সংরক্ষণের ভার নেবে ও মালিককে বুঝিয়ে দেবে শোষণের যুগ আর নেই। এই উদ্দেশ্যে মিটিংয়ের জন্য তারিখ ঠিক হয়েছে, সেই তারিখে যেন সমস্ত ওয়ার্কারেরা ওয়ার্কশপের বাইরের মাঠে জমায়েত হয়।

"তারিখটা দেখেছেন স্যার—" শোভেন ঘোষাল অবহিত করিয়ে দেয়, "কোম্পানীর, কি বলে গিয়ে, প্রতিষ্ঠা দিবস! পাঁচজনের সামনে অপদস্ত করার তালে—"

ডাঁটুস সেন সাহেবের সঙ্গে এত মুক্ত-বাক্যে ভাব প্রকাশ করতে তাঁর কর্মচারীরা কেউ পারে না, কিন্তু শোভেন ঘোষালের কথা আলাদা। শোভেন তাঁর গুপ্তচর। আর এ রকম একটি চর না থাকলে কারখানার অফিস চলে না।

বাপের আমলের একটি স্বদেশী চিরুনির কারখানা ছিল, আর ছিল ব্যাঙ্কে বেশ কিছু মজুত টাকা। দুটো ভেঙে বেশ একটা জমজমাট প্ল্যাস্টিক কারখানা খুলেছেন সেন সাহেব, এবং লাভের অঙ্ক দিন দিন প্রত্যাশার মাত্রা ছাড়াচ্ছে' আর সেইটাই কর্মিবৃন্দের 'দীর্ঘ-শ্বাস' সৃষ্টির কারক।

সেন সাহেবের বাপের টাকায় আর তাঁর নিজের প্রখর মেধায় যে বৃক্ষটি গড়ে উঠেছে, তার পাকা ফলটি সেন সাহেব একা না খেয়ে তারা সবাই মিলে কেন খাবে, এ কথা ভাবছে না কেউ। বেশ তো তোরাও যা না, খুল গে না আরও বড় বড় প্রতিষ্ঠান, বারণ তো করেনি কেউ। একজন মাটি খুঁড়ে বীজ পুঁতে সার দিয়ে আর জল ছিটিয়ে সে গাছটিকে বাড়ালো, তার ফল খাবার সময় সবাই কেন হাত বাড়াবে, এ সেন সাহেবের বুদ্ধি অগম্য।

ঠিক যেন দেশের জ্ঞাতির মত।

জীবনে কেউ তারা সেন সাহেবের অপকার বই উপকার করেনি, সেন সাহেব বিলেত গেলে তাঁর বাপকে ব্যঙ্গ প্রশ্ন করেছে "দেশে বুঝি আর তোমার ছেলের বিয়ে ধরলো না, তাই বিদেশে গিয়ে—" অথচ তারাই অনায়াস অক্লেশে মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়া, শক্ত রোগের চিকিৎসায় খরচের জন্যে সেন সাহেবের কাছে হাত পাতে। আশানুরূপ না পেলে 'চামার' বলে গাল দেয়। সেন সাহেবের বাড়ীর সাজসজ্জা দেখলে তাদের চোখ টাটায়, যেমন টাটাচ্ছে তাঁর

কোম্পানীব লাভের অঙ্ক দেখে কোম্পানীর কর্মীদেব।

মজুরি বাডানো, ছুটি বাডানো, এবং বোনাস বাডানো নিযে অসন্তোষ ধূমাযিত হতে হতে এবার আগুন জ্বলে উঠেছে। সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে তারা। চালাকি দেখ, কোম্পানীর 'বার্ষিক' উৎসবের দিন, যেদিনে নাকি সেন সাহেব তাঁর বড বড খদ্দেরদেব নেমন্তন্ন করে খানাপিনার স্রোত বহান, সেইদিন তারা ফ্যাক্টরিব মাঠে জমাযেত হয়ে বক্তৃতার স্রোত বহাবে!

"দেখছেন স্যার দুর্বুদ্ধিটা।"

"দেখছি" সেন সাহেব কাঁধটা ঝাঁকিযে নেন, "মাত্রাটা ছাডাচ্ছে মনে হচ্ছে, টেম্পাবেচাব নামানো দবকার!"

"নামাবেন! কি করে পারবেন স্যার? ওদেব ঝাণ্ডা ডাণ্ডা সব যে তেতে উঠেছে!"

"ঠাণ্ডা করতে হবে।"

ঘোষাল স্থান কাল পাত্র ভোলে। টেবিলের কোণ চেপে ধরে বলে ওঠে, "হবে না স্যার, হবে না। ওদেব চেনেন না আপনি, আগুন, আগুন একেবারে। যতদূর দেখছি ওদেব দাবিই মানতে হবে—"

কথা শেষ করতে পায় না বেচারা তীক্ষ্ণ হাসির ঘাযে, "ঘোষাল কি আজকাল ও পক্ষ থেকে ঘুসটুস নিচ্ছ নাকি?"

"স্যাব! বরং আমার মাথায় দু'ঘা জুতো মারুন। এ কথা বলার চাইতে তাও বরং—"

"তুমিই বলাচ্ছ! বলি দাবি মেনে নেওযার মানে জানো? এখনকাব দাবি মেনে নিলেই আবার দাবির ধুযো ধরবে, "পরিবারের ব্যবস্থা"। বলবে বিনি ভাডার বাড়ি চাই, বিনি মাইনের ইস্কুল চাই, নিখরচার মেটার্নিটি হোম চাই, রোগে ওষুধ চাই, রোগীর পথ্যি চাই, মরলে পোড়াবার কাঠ চাই, 'চাইযের' শেষ থাকবে না, বুঝলে ঘোষাল।"

"তা হলে স্যার?"

"যাতে আর কোন কিছু না চায তার উপায দেখতে হবে। এখন যাও তুমি।"

অতএব গেল ঘোষাল।

গেল আর কোথায়!

সেই ও পক্ষের কাছে! গেল সরল শুভ্র অকলঙ্ক মুখে।

কিন্তু ওরা দূরে থেকেই মুখ বাঁকায়, "ওই যে আসছেন টিকটিকি!"

"ইচ্ছে করে ওর ওই টিয়ে নাকটা ঘুষিয়ে চ্যাপ্টা করে দিই।"

"বেটা বিভীষণ! মীরজাফর! উমিচাঁদ!"

"ঘুঘু নাম্বার ওয়ান!"

"এবার ঘুঘু ওব ভিটেয় চরবে।"

শোভেন ঘোষাল শিশুর অকপটতা মুখে মাখিয়ে এর ওর কাছে ঘোরাঘুরি করে, পাত্তা পায় না।

খানিক পরে সহসা এক ঝড়।

সেন সাহেব স্লিপ্ পাঠিয়েছেন, কাজের শেষে কেউ যেন চলে না যায়, তাঁর কিছু বক্তব্য আছে।

ব্কুম.

বটে!

ফুসে ওঠে অগ্নিকণার ঝাঁক, "কক্খনো না, কেউ থাকবো না! দেখি কি করে আটকায়। গেট বন্ধ করে দেবে? দিয়ে দেখুক না।"

দলের চাই অনিল বিশ্বাস বলে, "বুঝছ পলিসি? বেটা টিকটিকি কিছু লাগিয়ে ভাঙিয়ে এসেছে, তাই আবার কিছু বক্তব্য। বলি, কি আর বলবি তুই? সেই তো নতুন বোতলে পুরনো মদ ঢালবি! স্রেফ্ কোম্পানীর হিসেব খুলে বোঝাবি, যা কিছু লাভ তার সবটাই লোকসান। তারপর লম্বা লম্বা কথা কেঁদে 'ও দেশ' দেখাবি, সোভিয়েট দেখাবি, চীন দেখাবি, কর্ম আর ঘর্মের মূল্য বোঝাবি, শেষ অবধি বিল্বিপত্তর শুকিয়ে ছেড়ে দিবি। ওসব ছেঁদো কথা ঢের শোনা গেছে দাদা, ওতে আর নয়।"

"তা হলে আমরা অটল?"

"নিশ্চয়। আমরা হেলব না, ডুলব না, টলব না।"

"ছেঁদো কথায় ভুলব না।"

কাজ আর হয না তারপর, খালি জটলা। চলে যাওয়া হবে না, থাকা হবে।

শেষ অবধি কৌতূহলের জয।

দেখাই যাক কোন বগড়ের কথা বলেন সাহেব।

কিন্তু এ কী।

এ কোন অলৌকিক বাণী।

ধারণার সাত ক্রোশ, সম্ভাবোর যোজন তফাত।

ওযার্কশপের মধ্যে রবীন্দ্র জযন্তী হোক এই প্রার্থনা সাহেবের। বিনীত ভঙ্গী, মধুর স্নরেলা গলা, আবেগপূর্ণ আবেদন!

রবীন্দ্র জযন্তী!

হ্যাঁ, শতবার্ষিকী উৎসব।

কেন নয? সারা পৃথিবী যে উৎসবের জোযারে ভাসছে, সে জোযার কি শুধু তাঁর ওযার্কশপের প্রাচীরে ধাক্কা খেযে ফিরে যাবে? ভাসিযে ডুবিযে মাতিয়ে তুলবে না তাঁদের? সেন সাহেবের প্লাষ্টিক ফ্যাক্টরি কি পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে?

হঠাৎ দলের চাঁই মাজা চাচা গলায চেঁচিযে ওঠে, "আমাদের আবার রবীন্দ্রনাথ। আমরা কি মানুষ নাকি?"

"ছি ছি, ও কথা বলবেন না অনিলবাবু।"

রেগে নয, তেড়ে নয, বিগলিতকরুণা বুদ্ধের মত বাণী বিতরণ করেন সেন সাহেব, "হতে পারি আমরা দীন দুখী অভাবী, হতে পারে আমাদের জীবনে সমস্যার শেষ নেই, আমরা পীড়িত বঞ্চিত ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট, কিন্তু বিশ্বের দরবারে সংস্কৃতিতে হারবো কেন আমরা? বাঙালীর আজ কোন সম্বল নেই, সম্বলের মধ্যে ওই সংস্কৃতিটুকু। আর সম্পদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। সেটুকু আমরা উপলব্ধি করবো না? স্বীকার করবো না? না না তা হয না। করুন আপনারা রবীন্দ্র জযন্তী, করুন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অভিনয আবৃত্তি নাচগান সব কিছু দিযে ভরিযে তুলুন তাপদগ্ধ মনকে। আমি জানি আপনাদের সকলের মধ্যেই লুকিযে আছে একটি শিল্পী, ক্ষেত্র পেলেই সে তার প্রতিভা দেখাতে পারবে। আর সেইজন্যেই—" আরও নানা কথার ঝঙ্কারে সমস্ত আবহাওয়া

মধুর করে তুলে ঘোষণা করেন সেন সাহেব, বাইরে থেকে মহিলা আর্টিষ্ট আনুক অনিল বিশ্বাসরা, আনুক গাইয়ে বাজিয়ে, সব খরচ সেন কোম্পানীর।

শেষোক্ত ঘোষণায়, অস্ফুট একটা ব্যঞ্জনা উঠল।

কিন্তু কিসের? কৃতার্থম্মন্যের?

না ব্যঙ্গের?

হ্যাঁ, ব্যঙ্গেরই। যেন 'ওঃ ভারী বদান্যতা! টাঁক খেতে পার না আর উনি....' কিন্তু গুঞ্জন ভাষায় ধ্বনিত হয়ে ওঠবার আগেই আর একবার সেন সাহেবের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে পড়ল,—না না, এ তার বাহুল্য বদান্যতা নয়, সামান্যতম কর্তব্য-পালন মাত্র। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান থেকেই টাঁককে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে এই জাতীয় উৎসবের জন্যে। সরকার বাহাদুর দিকে দিগন্তরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করছেন, সেন সাহেবের ক্ষমতা সামান্য, কিন্তু সেই সামান্যটুকুও যদি তিনি করতে না পান, তিনি যে জাতীয় কর্তব্যচ্যুত হবেন। সেন সাহেব আর তার কোম্পানী কি বিশ্বপ্রবাহের একটি অংশ নয়?

অভিজাত ঘরের সন্তান, গলা সুরেলা, কথা শেষ হবার পরও যেন একটা মূর্ছনার মাদকতা।

চাঁই নীরব, কাজেই সকলেই নীরব।

সেন সাহেব উচ্চাসন থেকে নেমে এসেছেন তবু আর একবার অবহিত করিয়ে দেন, "কিন্তু সময় আর নেই অনিলবাবু, যত চটপট পারেন ব্যবস্থা করে ফেলুন। অন্তত নাটকটা যেন বলবার মত হয়। আমার ডীলারদের নেমন্তন্ন করা যাবে সেদিন।"

ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসেই কাঁধের সেই বিশেষ ভঙ্গীটি করেন সেন সাহেব। পিছন পিছন সুড়সুড়িয়ে আসে ঘোষালও। "আপনি যে তাজ্জব করলেন স্যার।"

"তাজ্জবের কি আছে!" জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত মুখে সেন সাহেব বললেন, "এটা আমাদের কর্তব্য। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে না পারলে নিজেদেরকে অসংস্কৃত বলে পরিচয় দেওয়া হয়।"

শোভেন ঘোষালের হাঁ আর বুজতে চায় না।

ওদিকে প্রবল উত্তেজনা।

সাহেবের এ সমস্তই পলিসি, এ ফাঁদে পা দেবে না তারা। তারা হেলবে না দুলবে না, ভুলবে না টলবে না।

অনিল বিশ্বাস বলে, "নিবারণদা, তুমি তো লিখিয়ে পড়িয়ে আছো, রিফিউজ্যাল লেটারটার খসড়া করে ফেল, সবাই সাইন দিয়ে পাঠিয়ে দিই।"

বিশু আঢ্যি বলে, "আর সেই চিঠির মধ্যে বেশ দু'চারটে ঝাঁজালো কথা ঠেসে দিও নিবারণদা, বলো যাদের পেটে দানা নেই, তাদের আবার সংস্কৃতি. তাদের আবার ঐতিহ্য!"

চটপট চেষ্টা করেও চটপট হয়ে ওঠে না।

নানা আজেবাজে কথায় সময় কেটে যায়। আনমনা সুরেন দত্ত বলে, "যাই বলিস, সাহেবের ভাষাটা কিন্তু খুব চোস্ত। বাতদিন তো ইংরিজী কথা কয়! অত ফাষ্ট কেলাস বাংলা শিখলো কি করে বল দিকি।"

বিকাশ মণ্ডল ঝেঁকে ওঠে, "উঁচু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বললে, অমন শুনতে মধুরই লাগে হে সুরেনদা, বুঝলে? চিরদিন মাটিতে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে মরলাম. মধু আর ঝরবে কোথা থেকে?"

"তা যা বলেছ।"

সায় দেয় সকলেই।

কিন্তু প্রত্যাখ্যানপত্র আর লেখা হয়ে ওঠে না।

হট্টগোলের মাঝখানে বেরিয়ে পড়ে সবাই।

পরদিন।

বিকেল নয়, সকাল।

অর্থাৎ পুরো চব্বিশ ঘণ্টারও ব্যবধান নয়, কিন্তু দেখা গেল বাতাসের মোড় অদ্ভুতভাবে ঘুরে গেছে। সারা রাত্রির চিন্তায় চিন্তের গতি বদলে গেছে সকলের। সত্যিই তো, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? কেন করবে না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান? উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাণী বিতরণ করতে কেমন লাগে একবার চেখেই দেখা যাক না। ইউনিয়নের কাজটা না হয় কিছু পিছোল, তারা তো আর হেলছেও না, দুলছেও না, টলছেও না ভুলছেও না। বেটা ধড়িবাজের পয়সায় একটু আমোদ আহ্লাদ করেই নেওয়া যাক।

কাজ সেদিন শিকেয় ওঠে। বাইরে থেকে কোন কোন মহিলা শিল্পীকে

আনা হবে তারই মুখরোচক আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে পয়ামর্শ সভা। তা ছাড়া নাটক নির্বাচন, নিজেদের মধ্যে ভূমিকা ভাগ, সেও তো কম আকর্ষণীয় আলোচনা নয়।

নাঃ, কাজ আর হয় না সেদিন।

কিন্তু শুধুই কি সেদিন?

পর পর কতদিন পর্যন্ত কাজ কি আর কেউ করতে পারে? দশটা কন্যাদায়ের বাড়া যে এই সাংস্কৃতিক দায়!

মান অভিমান, রাগ বীতরাগ, দলত্যাগ আবার দলে প্রবেশ ইত্যাদি অনেক লীলার শেষে "শেষরক্ষা"র রিহার্সাল শেষ হয়। আর দেখা যায় সেন সাহেবের কথাই ঠিক, সকলের মধ্যেই সুপ্ত ছিল এক একটি শিল্পী, ক্ষেত্র পেয়ে জেগে উঠেছে সেই সত্তা।

গানে, বাজনায়, তবলায়, অভিনয়ে, আবৃত্তিতে, কিসে নয়?

দলের চাঁই মাঝে মাঝে বিনীত পদক্ষেপে সেন সাহেবের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় নির্দেশ চাইতে। তিনি সহাস্যে বলেন, "ওসব হচ্ছে আপনাদের ব্যাপার। আপনারা যা ভাল বুঝবেন! আমাকে খানকতক কার্ড দেবেন দয়া করে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অনুষ্ঠান দেখবো, এই আর কি।" ভুরু নাচিয়ে বলেন, "বেশ সোনালী বর্ডার দিয়ে কার্ডটা ছাপবেন, আগের টাকায় না কুলোয় কোম্পানী আবার দেবে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে ঝাঁকিয়ে নেন সেন সাহেব, যেন কোম্পানীকে ফাঁদে ফেলে বেশ আমোদ পাচ্ছেন।

"কার্ডটা ওঁর মনের মত হওয়া চাই, বুঝলে অনিলদা।"

"তা তো উচিতই, কিন্তু কথা হচ্ছে কার্ড তো ছাপতে দেওয়া হবে, কিন্তু প্রিসাইড করছে কে? চীফ গেষ্ট কে?"

অ্যা, তাই তো!

এতদিন তো এটা খেয়াল হয়নি।

সভাপতি আর প্রধান অতিথি না হলে আবার রবীন্দ্র জয়ন্তী কিসের।

এখন কাকে ধরা যায় ?

কবি ?

সাহিত্যিক ?

অধ্যাপক ?

এম এল এ ?

মন্ত্রী ?

কিন্তু সময় আর কোথা !

এত কম সময়ে কি শিকার ধরা যাবে ?

মণ্ডল বলে, "আসবে না ! কেউ আসতে চাইবে না। আমার ভাগ্নেটা ওদের পাড়ার না ক্লাবের জয়ন্তীর পাণ্ডা হয়েছিল, ছোকরা আ-দক্ষিণ-উত্তর কলকাতা চষে বেড়িয়েছে সভাপতি সভাপতি করে, বলে যার কাছেই যায় তিনিই বলেন ছ'মাস আগে থাকতে সাবা এপ্রিল মে-র জন্যে বুক্‌ড্‌ হয়ে আছেন। তা ছাড়া শরীর ! সে তো প্রত্যেকেরই খারাপ। মহিলা সাহিত্যিকদের আবার সঙ্গে একজন—"

"নিকুচি করেছে হাবিজাবি কথায়"—নিবারণ ছিটকে ওঠে। "অনেক গুলো টাকা দিয়েছে কোম্পানী, সেন সাহেব বলবে কৃতজ্ঞতা নেই আমাদের, ওকেই বরং সভাপতি—"

"সেন সাহেব !"

অনেকগুলো কণ্ঠে এক সঙ্গে উচ্চারিত হ'ল ওই একটি শব্দ।

অতঃপর ?

ঝপাঝপ ভোট পড়ে যায় সেই নামে। দেখে মনে হ'ল ওই নামটাই বুঝি সকলের মুখের আগায় মুখিয়ে ছিল, শুধু চক্ষুলজ্জায় মুখের বাইরে বেরোতে পারছিল না। একটা ঘুলঘুলি খোলা পেয়ে পাঁচিল ভেঙে বাঁচল। তা তো হ'ল !

কিন্তু চীফ গেষ্ট ?

"ওর আর ভাবনার কি আছে ? মিসেসের নামটাই ছাপো !"

"আসতে রাজী হবেন ?"

"না হবেন কেন ? অ্যান্যুয়েলে তো আসেন ফি বারই চল না সকলে মিলে

ইয়ে করে আসা যাক।" বললেই হবে তোষাজ করে, "আমরা রবীন্দ্রনাথের কি বুঝি বলুন, আপনারা না এলে—"

সেন সাহেব কার্ডের গোছা হাতে ক'রে বিব্রত বদনে বলেন, "এটা যে আপনারা কী করলেন। মিসেস সেন তো বেজায় লজ্জিত!"

অনেকগুলো হা হা হা করে ওঠে, "এ কী বলছেন স্যার!"

"আমি তো আপনাদের ভাবনা টাবনা দিতে পারব না; যা পারেন উনিই করবেন মশাই। যা দেখছি ডোবাবেন আপনাদের।"

অমায়িকের অবতার।

স্যার এবারও যেন বিনয়ে পা'রা দেনেই।

অবশেষে এসে পড়ে সেই মহাদিন।

বাঁধিয়ে নিয়ে আসা হয় ক্যালেণ্ডারের একখানি দাড়ি সম্বলিত নিরীহ বৃদ্ধের মুখচ্ছবি। তাঁর সামনে সাজিয়ে রাখা হয় একশতটি মাটির প্রদীপ।

কে বলবে জীবনে কখনো কোনও ফাংশান করেনি এরা?

আলো, প্যাণ্ডেল, মাইক, ডেকোরেশান, ফুলমালা ধূপ, আলপনা, আয়োজনে খুঁত নেই।

উঃ, জীবনে এত আনন্দ এত সার্থকতা থাকে, থাকতে পারে! কী রোমাঞ্চ, কী রোমাঞ্চ!

মাইক টেষ্টের সময় যে পারে একবার করে 'হ্যাল্লো হ্যাল্লো" করে নেয়, কারণ সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চ তো নিজের কণ্ঠস্বরখানি সপ্তস্বরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ায়!

আর সত্যি বলতে কি, কম রোমাঞ্চ লাগে না যখন মিসেস সেন এসে অবাক অবাক মিষ্টি গলায় শুধান, "এত সুন্দর আলপনা দিল কে?"

আরও কত রোমাঞ্চ, তিনি যখন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে হতাশ ভঙ্গীতে বলেন, "নাঃ, মেয়েদের অহঙ্কার করবার আর কিছু রাখলেন না আপনারা!"

রোমাঞ্চের প্লাবন বইতে থাকে যখন মিষ্টার এবং মিসেস মঞ্চে আরোহণ করেন, আর তাঁদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় সেই বৃহদাকার গার্ল্যাণ্ড দুটি, যে

ছুটি সেদিনকার নিউ মার্কেটের মালাব দোকানেব সব সেবা।

তাবপর বিচিত্রানুষ্ঠান, তারপব অভিনয়। এ কি স্বপ্ন? এ কি মাযা? এ কি স্বর্গ? এ কি স্বর্গেব ছাযা?

বোমাঞ্চে আব কুলোয় না, দেখা দেয় অশ্রু কম্প স্বেদ।

হবে না?

আশ্চর্য ধৈযেব সঙ্গে কর্তা গিন্নী বসে বসে সব দেখেন যে।

কিন্তু এটাই কি শেষ?

প্রধান অতিথি বলেন, জীবনে কখনো 'শেবরক্ষা'ব এত সুন্দব অভিনয তিনি পেশাদাব বঙ্গমঞ্চেও দেখেননি। সভাপতি বলেন, অভিনেতাদেব বৌপ্যপদক দিতে না পাবা পর্যন্ত তিনি যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না। পাঁচখানি পদকের ঘোষণা হয।

সভাপতি আবও বলেন, তার কর্মনিষ্ঠ ষ্টাফদেব মধ্যে যে এতখানি শিল্প চেতনা ছিল লুকিয়ে, এ কথা কে জানতো। বলেন কোম্পানী ব্যয মঞ্জুর কববে, এঁবা যেন বছরে অন্তত কযেকবাব কোন কিছুব উপলক্ষ্য ব্যতীতই এরূপ রূপময আমোদ-প্রমোদেব আযোজন করেন। কে বলতে পাবে, এই সামান্য অনুষ্ঠানেব মধ্য থেকেই কোন অসামান্য প্রতিভাব আবির্ভাব ঘটবে কি না।

কিন্তু বিনয আব প্রশস্তিব পাল্লায এরাই কি কম যাবে?

এরাও মাইকের সামনে দাঁড়িযে হাত কচলে কচলে প্রভু ও প্রভুপত্নীব স্নেহ, সহানুভূতি ও বদান্যতার ব্যাখ্যা কবে।

তারপর শুরু হয খানাপিনা।

সমস্ত ষ্টাফকে অভিভূত করে বিগলিত করুণা বৃদ্ধ-যুগল তাদেব আযোজন থেকে দু'টি কোকাকোলা তুলে নেন। আব একবাব বলেন, "সত্যিই অনিলবাবু তাজ্জব করেছেন আপনারা। কিন্তু লোভ লাগিযে দিলেন মনে রাখবেন।"

শোভেন ঘোষাল টাকের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এসে বলে, "তাজ্জব যে আপনিই করলেন স্যার। ওই কিম্ভূতকিমাকার অভিনযকে আপনি 'সাকসেসফুল' বলে এলেন? ওকে কি অভিনয বলে?"

কাঁধের সেই বিশেষ ভঙ্গিটি করে স্বর্গীয একটু হাসি হাসেন সেন সাহেব,

"অভিনয় 'সাকসেসফুল' বলেছি, কার অভিনয় তা তো বলিনি স্পষ্ট করে।"

"এদিকে তো ইতিমধ্যেই আগামী নাটকের জল্পনা চলছে—"

"আহা সে তো চলবেই, জানতাম। দেখো এর পর তোমার ওই পাণ্ডারা ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে ইউনিয়ন না গড়ে থিয়েটার ইউনিট গড়বে।

"গড়বে।"

"গড়বে বই কি। ইয়ে তোমার হাঁ-টা বোজো ঘোষাল, তাকাতে পারছি না।"

"কিন্তু স্যার—"

"ওর আর কিন্তু নেই ঘোষাল। দেখো সারা বচ্ছর বুঁদ হয়ে থাকবে, নেশা কাটিয়ে এদিক ওদিক তাকাবার অবকাশই পাবে না।"

কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নেন সাহেব। সেই বিশেষ ভঙ্গীতে।

॥ স্বপ্নলীনা

একটু আগে ঘড়ি দেখেছে কঙ্কা। রাত আড়াইটে।

বিমানের মাথার কাছ থেকে আস্তে উঠে এল গলির দিকের জানালাটা খুলে দাঁড়ালো। নীচের তলার ঘর, জানালাটায় তারের জাল, তবু বিমান খুলতে দেয় না। বলে জানালার নীচের খোলা ড্রেন থেকে গ্যাস উঠে ওর জীবনীশক্তি কমিয়ে দেবে।

জীবনীশক্তি!

জানলার দিক থেকে বিমানের দিকে একবার চোখ ফেরাল কঙ্কা।

পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা রয়েছে বিমানের, কঙ্কাই ঢেকে দিয়েছে একটু আগে। ঢেকে দিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে পাতল, ওই চাদরটার নীচে ঠিক যেখানটায় বিমানের হৃৎপিণ্ডটা সেখানটায় সামান্যতমও একটু ওঠাপড়া করছে কিনা। চাদরটা নড়ে নড়ে উঠছে কিনা।

না, নড়ছে না।

অদ্ভুত রকমের স্থির হয়ে গেছে যেন।

আর একবার ভাবল, জীবনীশক্তি।

হাসল একটু।

আবার মুখ ফেরাল গলির দিকে।

কঙ্কার জীবনীশক্তি এত প্রচুর কেন। কঙ্কা যে সারাজীবন খোলা ড্রেনের মুখোমুখি বসে আছে তার পাঁক থেকে নিশ্বাস নিচ্ছে' তবুও কঙ্কার জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না। তবুও সমস্ত দিন অকথ্য পরিশ্রম করে, সমস্ত রাত জেগে ঘুরে বেড়াতে পারে কঙ্কা।

স্বপ্নলীনা

রাত আড়াইটে।

সাহাবাড়ির ছাতের পাঁচিলের কোণ থেকে আস্তে উঁকি মারল সে। ক্ষয়-রোগগ্রস্ত পাণ্ডুর মুখে এক চিলতে মৃত বিবর্ণ হাসি হেসে ইশারায় হাতছানি দিল কঙ্কাবতীকে।

কঙ্কা দেখতে পেল সেই পাণ্ডুর মুখের বিবর্ণ হাসিটা যেন অশরীরী আত্মার হতাশ নিশ্বাসের মত ছড়িয়ে পড়ল সাহাবাড়ীর ছাত থেকে মল্লিকদের ভাঙা দেওয়ালে, বিমলাদের রোয়াকের কিনারায়। আরো নেমে এল। কঙ্কাদের জানালার নীচের কাঁচা নর্দমার অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আজ রাত আড়াইটে।

সব দিন একরকম না। দুটো, আড়াইটে, তিনটে সেদিন যখন সময় হয় তার এমনি করে ছাদের কোণ থেকে ইশারা করে কঙ্কাকে।

কঙ্কা আস্তে পা টিপে ছাদে উঠে যায়। সে বলে আমার এই অসুখ মুখটা দেখতেই তুমি ভালবাসো দেখি, আমি সেদিন ভাল থাকি, অনেক হাসতে পারি, সেদিন তো কই আমার দিকে তাকাও না। অনবরত বিমানের ওই গাল বসা চোখ কোটরে পড়া রোগে কুৎসিত মুখটা দেখতে দেখতে ওইটেই বুঝি অভ্যাস হয়ে গেছে তোমার? উজ্জ্বল কিছু ঝকঝকে কিছু সহ্য করতে পার না।

কঙ্কা কিছু বলে না।

শুধু স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে থাকে। না, মাঝে মাঝে কিছু ভাবেও কঙ্কা। ভাঙা-চোরা এবড়ো খেবড়ো আলশেয় ঘেরা ওদের ওই একতলা ঘরের ছাতটায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ঘুরতে ঘুরতে ভাবে, সাহাদের বাড়ির ছাতের কোণ থেকে নিঃশব্দ পায়ে কে যেন নেমে আসছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না তার, আগাগোড়া কেমন যেন একটা কালো কাপড়ে মোড়া। সে নেমে এল কঙ্কার ওই তারের জাল ঘেরা জানালার নীচে থমকে দাঁড়াল, দেখলো কঙ্কা ঘরে নেই, বিমান শুয়ে আছে। ঘুমচ্ছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে। ওর পাতলা চামড়া ঢাকা হাড়ের খাঁচাখানার মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধুক ধুক করছে।

কঙ্কা ঘরে নেই তা তো দেখেই এসেছে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া লোকটা। দেখে এসেছে ছাতে বেড়াচ্ছে কঙ্কা। তাই সাহস বেড়েছে

জানালার ধার থেকে অদ্ভুত কৌশলে ঢুকে গেল ও ঘরের মধ্যে। বিমানের

মাথার কাছে দাঁড়াল, বিমান টের পেল না। ও ছায়ার মত হাল্কা হাতখানা বাড়াল, বিমান জানতে পারল না, ধুক ধুক করা হৃৎপিণ্ডটা মুঠোয় করে চেপে ধরল, চাপ দিল, আরও চাপ দিল, হিঁচড়ে টানল, ছিঁড়ে তুলে আনল। তারপর মুঠোয় চেপে নিয়ে যেমন করে এসেছিল তেমনি করে বেরিয়ে গেল।

বিমান বুঝতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে কঙ্কা নীচে নামল। ঘরে ঢুকল, বিমানের মাথার কাছে দাঁড়াল একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠল—'ও মাগো, কখন এমন হল, আমি তো বুঝতে পারিনি!'

ওর চীৎকারে সবাই উঠে এল বাড়ির মধ্যে থেকে। অনেকে ছুটে এল বাড়ির বাইরে থেকে। সবাই বলল, 'আহা চোরের মতন কখন এসে অমূল্য ধন চুরি করে নিয়ে গেল বৌমা!'

ছাতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই সব ভাবে কঙ্কা। অগাধ ছাত নয়, দুখানি ঘরের মাথা। এরই এক কোণে আবার গোছানো তরঙ্গিনীর সংসারের কয়লার গুঁড়ো, নারকেলের মালা, তালের আঁটি, আখের খোলা, ভাগ করে করে জড় করা আছে।

ওইগুলো বাঁচিয়ে হাত কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি।

কিন্তু ভাবনাটাকে যত ইচ্ছে দৌড় করাতে তো আর জায়গা লাগে না। আরো পাঠিয়ে দেয় কঙ্কা ভাবনাকে। ভাবে তারপর কঙ্কাও এক রাতে অমনি কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে গলির দিকে দরজা খুলে ফেলবে, ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে দৌড়তে থাকবে ঘুমন্ত রাস্তার ওপর দিয়ে।

দৌড়বে শুধু দৌড়বে।

কোথায় গিয়ে থামবে তা জানে না। আর ভাবতে পারে না। আকাশের ওই মরা মরা আলোর ওপর নতুন দিনের আলোর আভাস এসে পড়ে। কোথায় যেন কাক ডাকতে থাকে বিশ্রী সুরে। রাস্তায় জল দেবার সাড়া পাওয়া যায়। ময়লা ফেলা গাড়িগুলোর চাকার শব্দ ওঠে।

কঙ্কা নেমে আসে।

বিমানের ঘরে ঢোকে।

আর কোথায় যাবে, আর ঘর নেই। আর একটা ঘরে তরঙ্গিনী আর বিজয় তিনচারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। অনেকটা বেলা না হলে ও ঘরের দরজা খুলবে না।

হ্যাঁ, আরও একটা ঘর আছে বটে, রান্নাঘর। রাতের রান্না আর খাওয়ার কুৎসিত চিহ্ন নিয়ে পড়ে আছে। একটু পরে ঠিকে ঝিটা এসে ওই নোংরা নোংরা বাসনগুলো ঝনঝন করে টেনে নামাবে, ঝাঁটার শব্দ তুলে জল ঢেলে ঢেলে ঘরের মেজেটা ধোবে, তারপর কখন এক সময় চেঁচিয়ে ডাক দেবে—অ ছোট বৌদি, উনুন ধরে খাঁ খাঁ করছে যে গো!

কঙ্কা ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলবে 'যাচ্ছি' তারপর বিমানের হাতে তোয়ালেটা ধরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ওর মুখ ধোওয়ার জল ভর্তি পিকদানিটা তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যাবে।

বিমান পিছন থেকে বিশ্রী ভাঙা গলায় বলবে, 'এত রান্নার তাড়া কিসের! এত পিণ্ডি গেলে কে?'

তা ওর কথাটা কেউ শুনতে পায় না।

তরঙ্গিনী তখনও ওঠে না।

তরঙ্গিনী কেন উঠবে? খোলা ড্রেনে গা ঘেঁষা এই ইঁট বার করা একতলা বাড়ীটার সাম্রাজ্ঞী নয় সে? এ' সংসারে যত কিছু খরচ, সব বিজয়ের টাকায় নয়?

কিন্তু আজকের কথা আলাদা।

আজ একটু আগে বিমানের গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়েছে কঙ্কা, মাথার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, ঢাকা দেওয়া চাদরের নীচে, ঠিক যেখানে বিমানের হৃৎপিণ্ডটা ধুক ধুক করতো, সেখানটা কি রকম অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু, 'ও মাগো, কি করে এমন হল গো' বলে চেঁচিয়ে ওঠেনি কঙ্কা। উঠবেও না। এখন এই রাত-আড়াইটে থেকে সেই ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিথর থমথমে রোমাঞ্চময় সময়টুকু আস্তে আস্তে বুঝে বুঝে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবে কঙ্কা।

ছাতে উঠে গেল কঙ্কা।

আস্তে পা টিপে।

সাহাদের বাড়ির ছাতের কোণটা আরো কাছাকাছি এল। কঙ্কাকে সে ইশারায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে কঙ্কার দিকে চেয়ে রইল।

কঙ্কার মনে হ'ল ও দৃষ্টি কি ব্যঙ্গের? না কি শুধু সকরুণ মমতার?

ও দৃষ্টি কি বলছে, 'কঙ্কা, তুমি এইবেলা পালাও।' বলছে, 'কঙ্কা, পৃথিবী বড় শক্ত ঠাঁই, হয়তো আর কোনদিন পালাতে পারবে না তুমি।'

কিন্তু না, কঙ্কা আর ভয় খাবে না।

ও অনুভব করতে পারছে, এরপর গলির দিকের দরজাটা যখন ইচ্ছে খুলতে পারবে। ঘরে কেউ তাকিয়ে থাক না না তো কঙ্কার দিকে।

বিমানের সরু চৌকিতে পাতা বিছানাটা ফেলে দেবার পর আর কিছু পাতা হবে না চৌকিটায়।

দরজাটা খুলে রেখে এসে আর একবার শুধু চৌকিটায় বসবে কঙ্কা, আস্তে নিজেকেই বলবে, আমি চেষ্টা করেছিলাম, অনেক চেষ্টা করেছিলাম।'

এ সমস্তই তো এরপর কঙ্কার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। তবে এখন এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সময়টুকু বসে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করবে না কেন কঙ্কা?

সাহাদের বাড়ির দিকের আলসেয় মুখ রেখে দাঁড়াল কঙ্কা। দেখল সেই ক্ষয়রোগগ্রস্ত পাণ্ডুর মুখটা কোথায় যেন সরে গেছে। ওদের চিলেকোঠার আড়ালে না কোথায়।

দেখল সাহাদের মেজ বৌয়ের ঘরে মৃদু ঘুমন্ত নীল আলো জ্বলছে। দেখল ঘরের সীলিঙে বন্‌বন্‌ করে পাখা ঘুরছে। ওই হাওয়ার ঠেলাঠেলিতে জানালার নেটের পর্দাটা উড়ছে।

জানলার ধারেই মেজ বৌয়ের বাপের বাড়ির পাওয়া বিয়ের খাট, মোটা মোটা ছত্রি, ভারী ভারী বাজু, কালচে লাল গাঢ় মেহগিনি পালিশ। তাতে সাদা ধবধবে বিলিতি নেটের মশারি ঝুলছে। বাতাসে দুলছে, উড়ছে, তবু

ভিতরের রহস্য ভেদ হয়ে পড়ছে না। মশারির ঝালরে ভারি ভারি সুতোয় বোনা লেস্।

চোখ ঠিকরোতে ঠিকরোতে চোখ জ্বালা করে উঠলেও কিছু দেখা যায় না। তা এখন আর দেখতে চেষ্টাও করে না কঙ্কা, আগে করতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত।

তখন বিমানের অসুখ করেনি।

তখন সারারাত বিমানের মাথার কাছে বসে থাকতে হ'ত না কঙ্কাকে। বিমান তখন অর্ধেক দিন রাতে ফিরত না।

তখন মাঝে মাঝে সাহাদের মেজ বৌ ওদের খিড়কির দরজা খুলে পচাগলি ডিঙিয়ে এ বাড়ি বেড়াতে আসত। হাতিপাড় শাড়ী পরা ভারীসারি দেহখানি নিয়ে এসে সে বলত, 'দেখতে এলাম ভাই তোমাকে। জলজ্যান্ত দু'দুটো পাশ করা মেয়েমানুষ কেমন দেখতে হয় তাই দেখতে এলুম।'

সেই দেখতে আসাটা অবশ্য ছল, দেখাতেই আসত মেজ বৌ। গহনা কাপড়, স্বামীর সোহাগ। দেখাত, আর মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্ময়ের পাথারে ডুবে যেত। বলত, 'ওমা খাট পালঙ্ক কিছু নেই তোমার? কেন ভাই বিয়ের সময় সে সব পাওনি? দেননি তোমার বাবা? কী আশ্চয্যি! খাট বিছানা শাড়ী গহনা না দিলে আবার বিয়ে হয়?'

আবার বলত, 'বিমানবাবু কাল অত রাতে কোথা থেকে ফিরলেন ভাই? নেমন্তন্ন গেছলেন বুঝি? আমরা তো অবাক! রাত দুটো বেজে গেছে, তখন বিমানবাবু দোর ঠেলাঠেলি করছেন।"

কঙ্কা বলত, 'কি কাণ্ড, আপনারাও অত রাত অবধি জেগে ছিলেন? বাড়িতে তো তাহলে আপনাদের দারোয়ান না রাখলেও চলে।'

সাহাদের মেজ বৌ রাগ করে উঠে যেত।

কিন্তু বেশীদিন রাগ করে থাকতে পারত না। নতুন কোনও গহনা গড়ান হলেই রাগ ভেঙে চলে আসতে হতো তাকে। দুটো পাশ করা মেয়েকে নইলে পেড়ে ফেলবে কিসের জোরে?

এসে বসত আর বলত, 'তুমি তো আর যাবে না ভাই, আমিই এলাম মান খুইয়ে।'

এখন আর সাহাদের মেজ বৌ আসে না।

বিমানের অসুখে ওইটুকুই লাভ। পাড়ার কেউ আর আসে না।

বিমানেব অসুখটা যে নোংরা কুৎসিত ইতর! ভদ্র পরিচ্ছন্ন তরঙ্গিনী নাক কুঁচকে কুঁচকে পাড়ায় পাড়ায় জানিয়ে এসেছে সে খবর।

কিন্তু কঙ্কা জানে কাল ওরা সবাই আসবে। বিমানের ওই গলা পযন্ত ঢাকা চাদরটা টেনে মুখ পযন্ত ঢেকে দেওয়া হয়েছে, এ খবর পেলে সবাই আসবে!'

সাহাদেব মেজ বৌ বলবে, 'ওমা এত অসুখ করেছিল? কই টের পাইনি তো! ডাক্তারের গাড়ি টাড়ি আসা চোখেই পড়েনি। তা কোন কোন ডাক্তার দেখল ভাই?'

আর বিমলা এসে বলবে, 'আহা, সামান্য দু'গাছি কাঁচের চুড়িতেও কত শোভা ছিল। তা একগাছা করে হাতে কিছু রেখ বৌদি নইলে বড্ড যেন খাঁ খাঁ করে!'

মল্লিক গিন্নি ওকে কিছু বলবেন না, তবঙ্গিনীকে বলবেন। উনি তরঙ্গিনীর বন্ধু।

তরঙ্গিনী এসে বলবে, যা হবার তা তো হয়েই গেল ছোট বৌ, তা বলে না খেয়ে তো আর চিরকাল থাকতে পারবে না? উঠতেও হবে, মুখে দিতেও হবে। ঘরে বসে থেকে আর কি করবে বল? ওঠো, তবু কাজে-কর্মে মনটা ভাল থাকবে।'

এসব কথা কেউ কোনদিন বলেনি কঙ্কাকে, তবু কঙ্কা জানে কাল থেকে ওরা এই সব বলবে।

কিন্তু কঙ্কা তো আর এই খোলা ড্রেনের গা ঘেঁষা তারের জাল ঢাকা জানালাটায় দাঁড়িয়ে থাকবে না তখন। গলির দিকের দরজাটা খুলে নেমে যাবে:

নেমে গিয়ে দৌড়বে, কেবল দৌড়বে। জীবনটাকে নিয়ে যা খুশি করবে।

সবই কঙ্কার হাতের মুঠোয় এসে গেছে এখন। যে কঙ্কার প্রচুর জীবনী শক্তি আছে। সারাজীবন পাঁক থেকে নিশ্বাস নিয়েও যার সে শক্তি ফুরোয়নি।

সাহাদের বাড়ির দিক থেকে সরে এল কঙ্কা। সিঁড়ি ঘরের দেয়ালটায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল!

নীচের তলায় ঘরটার কথা কিছুতেই আর ভাববে না ঠিক করলে, তবু কি করে যেন ঘুরে ফিরে সেইটাই মনে পড়ছে!

এখন রাত আড়াইটে কি তিনটে, কি জানি কত। হয়তো আরও বেশী। হয়তো এই এক্ষুনি রাস্তায় জল দেবার শব্দ পাওয়া যাবে। বিশ্রী সুরে কোথায় যেন কাক ডেকে উঠবে। আর ময়লা ফেলা গাড়িগুলো ঝড়াং ঝড়াং করে ঘুমন্ত শহরের চেতনায় ধাক্কা মারবে।

কিন্তু তখন রাত ছিল মাত্র বারোটা।

তরঙ্গিনী আর বিজয় দরজায় খিল দিয়েছিল, অনেকক্ষণ আগে। এ ঘর থেকেও বিজয়ের নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

বিমান মশায় ছটফট করছিল।

মশারির ভেতর শোবার উপায় নেই বিমানের—নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। অনেকদিন ভেবেছে কঙ্কা একদিন জোর করে মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে দেখবে, সত্যিই বিমানের ওই ধুক্ ধুক্ করা দমটা বন্ধ হয়ে যায় কিনা।

কিন্তু কিছুতেই সেইটা আর দেখা হয়ে ওঠেনি কঙ্কার। বিমান তার ওই হাড়ের খাঁচাখানার মধ্যে এখনো যেটুকু জীবনীশক্তি আগলে রেখে দিয়েছে তার জোরেই কঙ্কার হাত থেকে পাখার বাতাস খায়, যতক্ষণ না ঘুম আসে।

কিন্তু সবদিনই কি ঘুম আসে?

আসে না।

ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, গোড়ায় কিছুতেই সে ওষুধ খেতে চায় না। যেন কঙ্কাকে খাটাবার জন্যেই, নিজে যতক্ষণ পারবে কষ্ট সইবে।

কঙ্কা শিশিটায় হাত দিতে গেলেই খিঁচিয়ে ওঠে বিমান। কর্কশ গলায় বলে, 'হয়ে গেল? পতিব্রতা সতীর পতিসেবা হয়ে গেল। আর পাঁচ মিনিট বাতাস করলে হাত ক্ষয়ে যাবে?'

কঙ্কা আবার পাখাখানা তুলে নেয়।

আজও তাই নিয়েছিল।

গরম আর মশা দুইয়েব সঙ্গে যুদ্ধ করছিল সেই আধভাঙা পাখাটা দিয়ে।

বিমান বলল, 'জল দাও!'

কঙ্কা উঠল, জল দিল।

বিমান বলল, 'গায়ের ঢাকাটা খুলে দাও।'

কঙ্কা খুলে দিল ঢাকাটা।

আরো খানিকক্ষণ উঃ আঃ করল বিমান। তারপর হঠাৎ রেগে বলল, 'দাও, চুলোর ছাই ওষুধটাই গিলিয়ে দাও।'

কঙ্কা উঠল। ওষুধের শিশিটা আনল। জল নিল। দেখল ওষুধটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নতুন এসেছে, প্রায় পুরো শিশিই রয়েছে।

'এত দেরী কিসের? খেঁকিয়ে উঠল বিমান, ওষুধে মন্তর পড়ছ নাকি?'

কঙ্কা কথা বলল না ওষুধ ঢেলে দিল বিমানের মুখে।

ওষুধ খেল বিমান। মুখটা একবার বিকৃত করল। 'চাদরটা পায়ে ঢেকে দাও' বলল খিঁচিয়ে।

একটু নীরবতা।

চোখটা জড়িয়ে এসেছে বিমানের, জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বলছে, কঙ্কা হাতের পাখা থামিয়ে দেখছে, রেগে উঠছে কিনা বিমান।

রেগে উঠছে না।

কাঠ হয়ে বসে আছে কঙ্কা, দেখছে গাযে মশা বসলে নড়ে উঠছে কিনা বিমান। নড়ে উঠছে না।

মশারিটা টাঙিয়ে দেবে কঙ্কা?

আজকে দেখবে পরীক্ষা করে?

না, মশারি কঙ্কা টাঙাল না।

সকাল বেলা তরঙ্গিনী ঢুকবে এ ঘরে, বিজয় ঢুকবে। বলবে, 'মশারি কে টাঙাল?' বলবে 'মশারির মধ্যে শুলে ওর দমবন্ধ হয়ে আসে না?'

তাই শুধু বসে থাকল কঙ্কা।

নিজের নিশ্বাসটাও সহজভাবে ফেলছে না, পাছে বিমানের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিটা ধরা না পড়ে।

একটু পরেই স্তব্ধ হয়ে গেল বিনান। শান্ত হয়ে গেল। সেই হাড়ের খাঁচার মধ্যেকার পাখীটা আর নড়ে না।

কঙ্কা ওর পায়ের কাছ থেকে চাদরটা টেনে গলা অবধি ঢাকা দিয়ে দিল। দেহের সমস্ত স্নায়ুকে চোখের দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত করে তাকিয়ে রইল! নিঃসন্দেহ হল।

তখন ঘড়ির দিকে তাকাল কঙ্কা।

দেখল রাত আড়াইটে।

গলির দিকে জানলাটা খুলল। দেখল সাহাদের বাড়ির ছাত থেকে কৃষ্ণা-অষ্টমীর পাণ্ডুর চাঁদের মরা আলো অশরীরী আত্মার হতাশ নিশ্বাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে মল্লিকদের ভাঙা দেওয়ালে, বিমলাদের রোয়াকের ধারে কঙ্কাদের জানলার নীচের খোলা ড্রেনে।

ছাতে উঠে গেল কঙ্কা আস্তে পা টিপে।

এখন সিঁড়ির ঘরের দেওয়ালে পিঠ ঠেসিয়ে বসে সব দেখতে পাচ্ছে। নিজেকেও দেখছে। দূরে থেকে, সিনেমার ছবির মত।

এইবার কি তবে নীচে নেমে যাবে কঙ্কা? সকাল না হতেই? ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে উঠবে 'ও মা গো। এমন কখন হল গো?'

অনেক লোক ছুটে আসবে সে কান্নায়।

বারবার উচ্চারণ করতে লাগল কঙ্কা ওই কথাটা। আস্তে, জোরে, তাড়াতাড়ি, থেমে থেমে।

কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না।

কানে খট্ খট্ করে বাজছে।

বেসুরো হয়ে যাচ্ছে।

তবে কি নেমে গিয়ে, ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা গোটানো মাদুরটাকে টেনে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়বে? ঠিকে ঝিটা যখন ডাক দেবে 'অ ছোটবৌদি, উনুনটা যে জ্বলে খাঁ খাঁ করছে—' তখন সাড়া দেবে না। ভয়ঙ্কর গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকবে।

তখন তরঙ্গিনী উঠবে বিরক্ত হয়ে। এ ঘরের দরজায় এসে বলবেন, 'হ্যাঁ গা

ছোট বৌ, আক্কেলটা কি তোমার? এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ? এক উনুন কয়লা পুড়ে গেল! এ কী মরণ ঘুম ঘুমোনো গো!

বলেই সত্যিই তেমন ঘুমওলা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে বলবে 'ঠাকুরপো!' আর তক্ষুনি আবার চিলের মত চেঁচিয়ে ডাকবে 'ও গো, শীগগির একবার এ ঘরে এসো তো।'

বিজয় ছুটে আসবে।

কঙ্কা তখন হঠাৎ জেগে ওঠার মত উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

একদণ্ডে পাড়ার লোকে বাড়ি ভরে যাবে বিজয়ের হাউমাউ চীৎকারে, আর তরঙ্গিনীর মড়া কান্নায়। পাড়ার লোক বলবে, 'হঁ্যা, ভাই ভাদ্দ ভালবাসতো বটে লোকটাকে। ওই তো গুণের অবতার ভাই।'

পাড়ার লোক আরও বলবে 'বৌটার কী কাঠ প্রাণ গো, কাঁদল না।'

তা বলুক। এই পদ্ধতিটাই সোজা মনে হল কঙ্কার। উঠল কঙ্কা। সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়াল। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কঙ্কা একটু আগে ওই সিঁড়িটা দিয়েই উঠে এসেছে ভেবে অবাক হয়ে গেল, পিছিয়ে এল।

চোখ বুজে নামবে?

কিন্তু শুধুই তো সিঁড়িটা পার হওয়া না কঙ্কাকে গিয়ে সেই ঘরেই তো ঢুকতে হবে, যে ঘরে একটা শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া মানুষ শুয়ে আছে—চাদর ঢাকা দিয়ে। যে মানুষটাকে এখন আর মশা কামড়াচ্ছে না। যার এখন গরমও হচ্ছে না। গায়ের চাদরটা মুখ অবধি ঢেকে দিলেও হবে না।

না, না, ওঘরে গিয়ে ঢুকতে পারবে না এখন কঙ্কা।

রাত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেই কঙ্কাকে। ভোর হলে নেমে গিয়ে তরঙ্গিনীকে চেঁচিয়ে ডাক দেবে 'ও দিদি, শীগগির এসো একবার, দেখ বুঝি সর্বনাশ—'

তরঙ্গিনী ছুটে আসবে। কেঁদে উঠবে।

জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাবে, 'তুমি কোথায় ছিলে ছোটবৌ'।

তবে একটু শুয়ে নিতে পারে কঙ্কা।

ছাতের মেজটা ধুলো ভর্তি।

তা হোক; দেয়াল ঘেঁষে গুটিসুটি শুয়ে পড়ল কঙ্কা

কিন্তু কঙ্কা তো ভাবেনি ঘুমবে।

তবু এত ভয়ঙ্কর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল কি করে? ঘুমের ওষুধ না খেয়েও।

কখন যে রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ উঠে শেষ হয়েছে, কখন কাকগুলো বিশ্রী বিশ্রী করে ডেকেছে, আর কখন ময়লা ফেলা গাড়িগুলো ঝড়াং ঝড়াং আওয়াজ তুলে শহরের ঘুমন্ত চেতনায় আঘাত হেনে বেড়িয়েছে, কিছুই টের পায় নি।

টের পায় নি কখন পুবের আকাশ থেকে খানিকটা সাদা রঙের রোদ কঙ্কার গায়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ কে কোথায় যেন একটা কাচের বাসন ভেঙে ফেলল! খনখন করে শব্দ উঠল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কঙ্কা।

কাচের বাসন নয়, তরঙ্গিনীর বড়মেয়ের গলা।

'ধন্যি বটে ছোটকাকীমা, এইখানে পড়ে মজা করে ঘুম মারছো! ওদিকে ছোটকাকা ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোবার জল না পেয়ে রেগে হাত-পা ছুঁড়ছে!'

অভিনয় নয়, সত্যি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কঙ্কা।

তরঙ্গিনীর মেয়ে ফের বলে, 'ওঃ ঘুমের ঘোর কাটেনি বুঝি এখনো? কথা মগজে ঢুকছে না? ছোটকাকা উঠে মুখ ধোবার জল না পেয়ে রাগারাগি করছে, বুঝতে পেরেছ?'

গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নেয় কঙ্কা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় তাড়াতাড়ি। মনে মনে বলে, 'আমি জানতাম। আমি জানতাম। এই রকমই একটা কিছু হবে জানতাম আমি। গলির দরজা খুলে দৌড়ে পালান আমার হবে না।'

নীচে এসে ঘরে ঢুকল।

বিমান ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ছিলে কোথায় এতক্ষণ? একটা রোগা মানুষ যে গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে তার খেয়াল থাকে না?'

কঙ্কা কথা বলল না।

পিকদানিটা এগিয়ে দিল। কলাই করা মগে করে জল দিল টেবিলে, মাজন দিল। তোয়ালে দিল। তারপর সেল্ফের ওপর সাজানো ওষুধের

শিশিগুলোব দিকে তাকিয়ে দেখল। ঘুমের ওষুধেব শিশিটা নতুন এসেছে। প্রায় পুরো শিশিই রয়েছে।

শিশিটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে উঠল কঙ্কা, 'চেষ্টা করেছিলাম অনেক চেষ্টা করেছিলাম, আমি পারিনি।'

॥ ছদ্মবেশী

কোন একটা ষ্টেশনের কাছাকাছি এলেই বাঁধা গতি এক কাজ, রেলগাড়ীর জানালা বন্ধ করতে হবে। বারে বারে এই একই ব্যাপার চালিয়ে যাচ্ছে কুঙ্কুম। অথচ জানলার ধারে বসাও চাই। আর গাড়ী চলতে সুরু করলেই দেখাও চাই উন্মুক্ত পৃথিবীকে।

যাই ভাগ্যিস দু'বার্থের কামরা, তাই অন্য যাত্রীর চোখ নেই কুঙ্কুমের ওপর। দেড়দিন ধরে নিশ্চিন্ত নিষ্কণ্টকেই চলছে তার, কিন্তু অনবরত জ্বালাতন করছে কুণালকে ওই জানালা জানালা করে।

'নাঃ তোমায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখছি ঝকমারিই করেছি—' বলল কুণাল জানালাটা উঠিয়ে দিয়ে। বসে পড়ে ফের বলল, 'তুমি এমন করবে তা ঠিক আগে বুঝতে পারিনি।'

'বাঃ কেমন আবার'—কুঙ্কুম অপ্রতিভের ফিকে হাসি হেসে বলে, 'জানালাটা ত একবার বন্ধ করতে তোমার কষ্টটাই বা কী?'

'আমার কষ্ট কিছু নয়। তোমার কষ্টটা দেখাই কষ্টকর হচ্ছে আমার পক্ষে।'

কুঙ্কুম কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'এতদিনের মধ্যে এদিকে তো আসিনি, কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।'

কুণাল গম্ভীর ভাবে বলে, 'কে তোমাকে মনে রেখেছে? কে হৃদয়পটে খোদাই করে রেখেছে তোমার মুখ? তাই ট্রেনের জানালায় চকিতে একবার দেখলেই চিনে ফেলবে তোমাকে! সংসার তোমায় ভুলে গেছে, বুঝলে?'

'বেশ গেছে তো গেছে।' কুঙ্কুম আবদারের ভঙ্গীতে বলে, 'আমার ইচ্ছে আমি একশোবার জানালা খুলব আর বন্ধ করব।'

'তবে করো।' বলে হেসে ফেলে কুণাল।

কুঙ্কুম যথারীতি চলন্ত গাড়ীর জানালায় মুখ রেখে চলন্ত প্রকৃতিকে দেখতে থাকে।

গাড়ীতে যে আর একজন আছে, মাঝে মাঝে যেন সে কথা ভুলে যাচ্ছে কুঙ্কুম।

ওকে বেড়াতে বার করে দেখছি ভুলই করেছি, কুণাল ভাবল মনে মনে। ভাবল, একটু যেন বাড়াবাড়ি করছে কুঙ্কুম। আবার ভাবল, হয়তো এইটাই স্বাভাবিক। এই লজ্জার আতঙ্ক।

তবু, কোনও ষ্টেশন এলে যে একটু নামতে পাচ্ছে না, এটা ভাল লাগছে না কুণালের।

অথচ তেমন জোর করে বলতেও পারছে না কিছু।

বলা কি যায়? জোর করা কি যায়, বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে? না, তা' যায় না।

বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা যায়, সোহাগ করা যায়, ধমক দেওয়া যায় না। ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর জোর খাটানো যায় না।

গাড়ীর রিজার্ভেসন স্লিপে লেখা আছে—মিষ্টার এণ্ড মিসেস। কুণালের কর্মস্থল ডুয়ার্সের চা বাগানের লোকেরা সকলেই জানে মিসেস, কিন্তু কুণাল তো জানে তাদের সেই জানাটা কত ভুল।

যে মহিলাটি কুণাল সেনের সঙ্গে শুধু তৃ' বার্থের গাড়ীতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি কুঙ্কুম সেন নয়, কুঙ্কুম ব্যানার্জি। কিন্তু সেই অদ্ভুত বিশৃঙ্খলাটা ধরা পড়বে, আয়োজনে এমন ত্রুটি নেই।

ধরা পড়ে নি। পড়বেও না হয়তো, তবু ধরা পড়ার আতঙ্কে আতঙ্কিত চোরের মত গাড়ীর জানালাটা নিয়ে কি ছেলেমানুষী করছে কুঙ্কুম।

সেই অনেকদিন আগে—যেদিন কুণাল সেন আর কুঙ্কুম ব্যানার্জির জীবন সহসা এক খাতে মিশে গেল বিবাহ বিচ্ছেদের আইনটা তখনও পাশ হয় নি।

তখনও ওই নিয়ে আন্দোলন চলছে।

কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত হলেই কি তার সুযোগ নিতে বসতো কুঙ্কুম? নালিশ রুজু করতো আদালতে? স্বামীকে ছেড়ে আর এক পুরুষের দুর্বার আকর্ষণে সে ভেসে যেতে বসেছে, শুধু এই কারণটুকু দাখিল করলেই কি আদালত তাকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দিত?

না, আদালত অত সদাব্রত খুলে বসেনি!

আইন অত হাতের জিনিস নয়।

অনেক জল ঘোলা করে, অনেক কলঙ্ক গায়ে মেখে, নয়তো অনেক কাদা অপর পক্ষের গায়ে মাখিয়ে, তবে তো প্রমাণ করতে হবে বিবাহ বন্ধনটা তাদের কাছে এখন নিতান্তই বন্ধন।

'তার চাইতে পালানো ভাল!'

বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পাশ হবার আগে তার ধারা উপধারাগুলো তখন বিস্তারিত ক'রে কাগজে বেরোচ্ছিল। আর পড়ে কুঙ্কুম ভেবেছিল তার থেকে পালানো ভাল!

সেই ভালটাই বেছে নিয়েছিল কুঙ্কুম। আইনের অপেক্ষায় দিন গোনেনি।

নিতান্তই সেই আদি অন্তকালের পচা পদ্ধতিটা অবলম্বন করেছিল। স্রেফ পালিয়েছিল।

শুধু সেই পালানোটা হয়েছিল অদ্ভুত রকমের অসমসাহসিক। একটা বিয়ে বাড়ীর নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে উৎসবের অসতর্কতার মাঝখান থেকে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াটা হয়তো কিছু অদ্ভুত কঠিন নয়, অদ্ভুত হচ্ছে পরিকল্পনাটা?

অথবা পরিকল্পিতও ছিল না সেটা।

ভয়ঙ্কর একটা দৈব মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলেছিল দুটো মানুষকে।

নিরালাটা অবশ্য দৈব ছিল না।

সেটা কুঙ্কুমের সৃষ্টি করা। উৎসব কক্ষের কল-কোলাহল থেকে সরে এসে পিছন দিকের ছায়া ছায়া অন্ধকার বারান্দাটায় দাঁড়াবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ অন্তত ছিল না।

তবু কুণালের চোখে ধরা পড়তে দেরী হয় নি, কুঙ্কুমের ঐ সকলের মাঝখান থেকে পিছনে সরে গিয়ে ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা।

ধরা পড়তে দেরী হবার কথাও না। কুণালের চশমাপরা চোখজোড়া তো শুধু কুঙ্কুমকেই অনুসরণ করে ফিরছিল।

'এত পরীর মত সাজবার কি দরকার?'

বলেছিল কুণাল।

কুঙ্কুম আরক্ত হয়ে বলেছিল, 'বাঃ বিয়ে বাড়ীতে সাজব না?'

'না সেজেও তো একাই বিয়ে বাড়ীটা আলো করে রাখার ক্ষমতা আছে।'

বড্ড যেন কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল কুণাল। ওর গায়ে ফেলা জরিপাড়ের উড়ুনিটা কুঙ্কুমের গায়ে লাগছিল। মৃদু একটা পুষ্পসারের সৌরভ কি এক উতলা শিহরণ এনে দিচ্ছিল খোলা বারান্দায় উদো উড়ো বাতাসে। কুঙ্কুম বুঝতে পারছিল না এই সেন্টের গন্ধটা কুণালের উড়ুনির না তা'র নিজেরই বেশবাসের।

কোন্ কথার কোন্ পরিণাম বোধকরি সে খেয়াল হারিয়ে ফেলেছিল কুঙ্কুম। তাই বলে বলেছিল, 'হুঃ বিবেবাণী! কোন কিছু আলো করবার ক্ষমতা থাকলে কি আ'র—'

তা একা কুঙ্কুমই খেয়াল হারায় নি।

কুণালও জ্ঞানবুদ্ধি সব কিছুই হারিয়ে বসেছিল। নইলে ওই কথাটুকুতেই কেন অমন করে চেপে ধরেছিল বন্ধুর স্ত্রীর হাত। যে হাতখানা নিতান্ত আলগা ভাবে বারান্দার রেলিঙের ওপর রাখা ছিল।

'থামলে চলবে না। কথা শেষ কর।'

কি রকম যেন একটা ভয়াবহ শুনিয়েছিল কুণালের স্বরটা। কুঙ্কুম ভয় পেয়েছিল। তবু নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারেনি। শুধু বলেছিল 'সব কথা কি শেষ করা যায়?'

'তবে শেষটা ভাববার স্বাধীনতা শ্রোতাকে দাও।' বলেছিল কুণাল। তারপর বলেছিল আরও অনেক কথা।

আর বলেছিল, আজ রাত্রের গাড়ীতেই কলকাতা ছাড়বে সে। রাত দশটার গাড়ী। তখন ডুয়ার্সের এই কাজটা ছিলনা কুণালের, সে রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজারী করতো।

'তাহলে আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র সময়। তারপর কোথায় তুমি আর কোথায় আমি।' বলেছিল কুঙ্কুম! আর ঠিক সেই সময় বলে বসেছিল কুণাল সেই ভয়ঙ্কর কথাটা, যা তার স্বপ্নের ত্রিসীমানাতেও ছিল না।

'ইচ্ছে করলে একই জায়গায় পৌঁছতে পারি তুমি আর আমি।'

'কি বললে?'

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। যেন কে ছুরি মেরেছে কুঙ্কুমকে। যে কুঙ্কুম এই ক'দিন আগেও ভেবেছিল তার চাইতে পালানো ভাল। হয়তো সেটা নিশ্চিন্ত নিজের কথা বলে ভাবেনি। ভেবেছিল সকলের হয়ে। অত কেলেঙ্কারীর চেয়ে

পালানো ভাল।

কুণাল নির্বিকারের মত দাঁড়িয়েছিল।

হাত ঘড়িটা অন্ধকারেও চোখের কাছে তুলেছিল। তারপর বলেছিল; 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। জীবনের পথ নির্ধারণ করে ফেলতে এ সময়টুকু খুব কম বলে মনে হচ্ছে তোমার? তাই না। আমি কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ডেই ঠিক করে ফেলতে পারতাম।'

'কী বলছ কুণাল?'

হতাশ গলায় বলেছিল কুঙ্কুম।

আর কুণাল তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়িয়েছিল, 'আচ্ছা বিদায়। আমার কথাগুলো পাগলের পাগলামী ভেবে ক্ষমা করতে চেষ্টা কোরো। শুভরাত্রি।'

'কুণাল!' এবার হাত চেপে ধরে ছিল কুঙ্কুমই কুণালের।

না তার পরের কথা স্পষ্ট করে মনে পড়ে না কুঙ্কুমের। মনে পড়ে না সে কী বলেছিল, আর কি বা বলেছিল কুণাল।

শুধু যখন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে চেতনা এসেছিল, তখন দেখেছিল অন্ধকারের পটভূমিকায় একখানা ট্রেন চলেছে, তাতে দুটি আরোহী। আরোহী দু'জন যেন কত চেনা চেনা।

নাকি একেবারে অচেনা?

তারপর অনেকদিন ভাবতে চেষ্টা করেছিল কুঙ্কুম—তারপর সেই বিয়ে বাড়ীটার চেহারা কিরকম হয়ে উঠল।

নিশ্চয় প্রথম খোঁজ পড়ল খেতে বসার সময়। তা' সেটা বোধ হয় গোলমালে কেটে গেল। হয়তো কেউ বলল ফার্স্ট ব্যাচে খেয়ে গেছে কুঙ্কুম, কেউ বলল নিজের হাতে পরিবেশন করে বাইরেছে সে।

কুঙ্কুম জানে এ রকম হয়।

এরকম সবজান্তা লোক কিছু কিছু থাকে সংসারে। সে ঝোঁকটা কাটল।

তারপর এল মোক্ষম ঝোঁক।

বাড়ী ফিরবার সময় শাশুড়ী ননদ জায়েরা অতবড় তিনতলা বাড়ীটা তচনচ করে বেড়াল কুঙ্কুমকে খুঁজতে। তারপর ননদ রাগ করে বলল 'নিশ্চয় ছোড়দা আগে নিয়ে গেছে বৌকে, বৌয়ের গরম লাগছে বলে। দেখছ না ছোড়দা নেই।'

অম্লান যে কখনোই কোন উৎসব বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, আগে পালায়, সে কথা আর কারুর মনে থাকল না।

সারা বাড়ী অম্লানের স্ত্রৈণতার নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠল।

শাশুড়ী ননদ আর জায়েরা ভাসুরেরা চলে এল বিয়ে বাড়ী থেকে! আর তখনই নাটক শেষ দৃশ্যে এসে পৌঁছল।

চাকর বলল—'ছোট বৌদিতো আসেন নি। ছোটদাবাবু অনেকক্ষণ এসে শুয়ে পড়েছে।'

নিশ্চয় তখন সেই রাত্রে এবাড়ীর ওবাড়ীর, যত সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য আত্মীয় আর বন্ধুদের বাড়ীর বাতাস তোলপাড় হয়ে উঠেছিল টেলিফোনের মারফৎ মুহুর্মুহু প্রশ্নে। নিশ্চয় তারপর অম্লান গাড়ী বার করে তোলপাড় করে বেরিয়েছিল কলকাতার রাস্তা—কার সঙ্গে কোন সময় চলে গেল কুঙ্কুম তার সন্ধানে।

নিশ্চয় তারপর বাড়ী এসে বলেছিল। 'আর খোঁজবার দরকার নেই।'

কুণালকে কেউ সন্দেহ করবে কেন?

উৎসববাড়ীর সবাই তো জানতো, কুণাল সেই রাত্রেই দশটার গাড়ীতে কলকাতা ছাড়বে। আগে আগে খেয়ে নিয়েছিল কুণাল ট্রেন ফেল হবার ভয়ে।

সওয়া নটা পর্যন্ত কুণালকে সবাই বাইরের আসরে দেখেছিল আর কুঙ্কুমকে দেখেছিল বাসরের উল্লাসের মধ্যে।

'আর খোঁজবার দরকার নেই'—একথাই তাহলে বলেছিল অম্লান? কিন্তু কেন? অজানিত একটা দুর্ঘটনার ভয়ে কাতর হয়ে অস্থিরতা না করেই ওই দীর্ঘ নিষ্ঠুর বাণীটা উচ্চারণ করেছিল কেন?

কুঙ্কুম জানেনা কি করেছিল অম্লান, আর কি না করেছিল, তবু নিজে নিজেই ঠিক করে নিয়েছিল। পাথরের মত মুখ করে বলেছিল অম্লান, 'আর খোঁজবার দরকার নেই।'

ভেবেছিল ওই কথা বলবে অম্লান। আর অম্লানের সেই নিষ্ঠুরতায় নিজেকে কঠিন করে নিয়েছিল সে। ওদের বাড়ীর ছোটবৌটা হারিয়ে যাবার পর ওরা সকলে কি করেছিল তা আর মনে আনেনি। মন থেকে মুছে ফেলেছিল কে তারপর ওদের সকাল বেলাকার চা তৈরী করছে, ওদের বাড়ীর বড় ভাসুরের জন্যে দিন চল্লিশটা করে পান সাজছে?

রেওয়া ষ্টেটের সকলে জেনেছিল ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে এনেছে কুণাল। বউ দেখে সবাই কুণালের প্রশংসা করেছিল রত্নালঙ্কার ভূষিতা জরির শাড়ী পরিহিতা কুঙ্কুব নব-বিবাহিতার মতই কম্পমান লজ্জা নিয়ে শুধু চুপ করে থেকেছিল।

সেখানের দিনগুলো যেন ঝাপসা।

সেখানের কুঙ্কুম যেন আড়ষ্ট।

তারপর চেষ্টা চরিত্র করে চা বাগানের এই কাজটা জুটিয়ে ফেলেছিল।

আর সেখানে কুঙ্কুম যেন একেবাবে নতুন মূর্তিতে ঝলসে উঠেছিল। উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল কুঙ্কুম। ভুলে গিয়েছিল তার কোন অতীত ছিল।

কুঙ্কুম আব কুণাল ওরা দু'জন যেন ওদের দুজনেব জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে আর ওরা যেন জানতে এসেছে পৃথিবীতে কত গান আছে, কত সুর আছে, কত আলো আর কত বাতাস আছে।

এমনি করেই কেটে গেছে অনেকগুলো বছর।

কী খেয়াল হ'ল এবার ছুটি নিয়ে দিল্লী আগ্রা হরিদ্বাব বৃন্দাবন বেড়াতে এল কুণাল কুঙ্কুমকে নিয়ে।

কিন্তু কে জানতো আগ্রায় অম্লানের ভাগ্নে থাকে আর দিল্লীতে অম্লানের ভাইঝি থাকে। আর কেই বা জানতো সেই আতঙ্কে সমস্ত লাইনটাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে কুঙ্কুম।

'আর তোমাকে নিয়ে লোকালয়ে বেড়াতে আসছি না'—বলে কুণাল। 'এতগুলো বছর কেটে গেল, তবু এত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছো কি জন্যে এ এক রহস্য। পৃথিবীর সবত্রই তো কোথাও না কোথাও অম্লানের আত্মীয়বর্গ থাকতে পারে।'

কুঙ্কুম বলল, 'বেশ নয় আমি বোকামীই করছি। কিন্তু তুমি? ধর তোমার সঙ্গে ওদের কারুর দেখা হল! কি করবে?'

'কি আবার করব!' কুণাল বলে 'কারুর সঙ্গে কেন, যদি অম্লানের সঙ্গেই দেখা হয় প্রথমেই বলব 'কথা বলবে না পুলিশ ডাকবে?' তারপর তার উত্তরের উপর নির্ভর। আমার সবটাই হচ্ছে ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে। তোমার মত বিপদের ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে হয়ে দেহ মনের বিপদ ডেকে আনি না।'

'বেশ তা'হলে সব জানালা খোলা থাক!' রায় দেবার ভঙ্গীতে বলে ওঠে কুঙ্কুম। 'সব ষ্টেশনে ষ্টেশনে প্লাটফর্মে নামবো আমরা।'

'এত হৃদযবল হবে?'

'দেখ। নামবো, পকৌড়ি চাণাচুর কিনে খাবো, পুতুল কিনবো. কিনবো গালাব খেলনা, মাটির ফুলদানী, কাঁচের চুড়ি।'

'সাধু সংকল্প।' বলে হাসল কুণাল।

কিন্তু সহসা এত বেশি পরিবর্তিত হওযাও বিস্ময়কর বৈ কি। জানালা খুলে বসে থাকছে কুঙ্কুম, প্লাটফর্মে নামছে। প্রত্যেকটা মানুষের মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকাচ্ছে, বেশী কথা কইছে বেশী চেঁচাচ্ছে।

যেন সহসা নিজেকে ঘোষণা করবার সংকল্প নিল সে।

কুণাল বলে 'ভাবি যে সাহস।'

কুঙ্কুম হাসে, 'না সত্যি—অকারণ তোমাকে জ্বালাতন করছি। বোঝা উচিত ছিল পৃথিবী অনেক বড়। সে পৃথিবীতে অনেক লোক। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে নেই।'

'যাক এতক্ষণে বুঝলে।'

তারপর ওরা চা খেল, খাবার খেল, আবার গাড়ী চড়ল, গন্তব্যস্থলে নামল। সেখানে কালীবাড়ীতে উঠল।

কুণাল মত চেয়েছিল কুঙ্কুমের। কুঙ্কুম বলল, 'ঠিক আছে।'

ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

এই মন্ত্রই জপ করবে এখন কুঙ্কুম।

দিল্লীতে—উঠল কালীবাড়ীতে।

অনেক জাযগা তবু অনেক ভীড়। পাশের ঘরের একটি বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হল কুঙ্কুমের, বেশ শান্ত নম্র হাসিমুখ। বছর তিনেকের একটি ছেলে সঙ্গে আছে। স্বামী অফিসের কি এক জটিল কাজ নিয়ে এসেছেন, সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটান।

'ছেলেটি বড় সুন্দর মিষ্টি'—বলল কুঙ্কুম, 'আর তেমনি শান্ত।'

'দেখে যতটা ভাবছেন, ততটা না।'

ছেলের মা হাসে।

'নাম কি? নাম কি তোমার বাবু?' বলে কুঙ্কুম। সাধারণ সহজ একটা

কথার কথা হিসেবে। ছেলেটি সপ্রতিভ, চড়া গলায় বলে উঠল, 'সব্বাইয়ের খালি ওই কথা। নাম নাম। কই বাপী তো বলেন না, তুমি তো বল না?'

ছেলের মা অপ্রতিভের একশেষ।

বলে, 'ছি ছি বাবু, তুমি এমন অসভ্য। উনি নাম জানতে চাইলেন, আর তুমি এই করলে? আমরা তোমার নাম জিগ্যেস করবো কেন? আমরা তো জানি। উনি কি জানেন? বল। বলে ফেলো।'

'আমার নাম অজাতশত্ত্রুর ব্যানার্জী। হল? বিচ্ছিরি নাম।'

অজাতশত্ত্রুর।

হেসে ওঠে কুঙ্কুম, 'সত্যি তো বাপু, যে নাম ছেলে বলতেই পারে না, তেমন নাম কেন? কিন্তু অজাতশত্রু তোমার নামটা আমার ভাল লেগেছে। কে রেখেছে নামটা?'

'বাপী। আবার কে!' অজাতশত্রু বিরক্তভাবে বলে, 'বাপীই তো আমার সব কাজ করে দেন।'

'বাঃ ভারী সুন্দর বাপী তো তোমার।' নবপরিচিতার চোখে চোখ রেখে রহস্যের হাসি হাসে কুঙ্কুম 'শুধু ছেলেরই সব কাজ করে দেন, না, কর্মক্ষেত্র আরও সুদূরপ্রসারী।'

'বাজে কথা শোনেন কেন।'

'ছোটরাই সব থেকে খাঁটি কথা বলে। অজাতশত্রু, তোমার বাপীর নাম কি?'

এওতো একটি সাধারণ কথা।

ছোট ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমাতে এই তো ভাষা। কিন্তু উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিটকে উঠল কুঙ্কুম, উঠল আর্তনাদ করে।

'কী? কী বললে?'

'শুধু শুধু চেঁচাচ্ছ কেন?' অজাতশত্রু ভুরু কুঁচকে বলে, 'কতবার নাম বলব। বলছি তো বাপীর নাম অম্লানকুসুম ব্যানার্জি।'

কুঙ্কুমের ভাববৈলক্ষণ্য মহিলাটির চোখ এড়ায় নি, 'কি হল হঠাৎ?' সে অবাক হয়ে তাকায়।

'কোথায় থাক তোমরা?'

বাহ্যজ্ঞান শূন্যের মত প্রশ্ন করে কুঙ্কুম, 'বল না কোথায় থাকো?'

'কলকাতায়।' ছেলের মা-টি আস্তে আস্তে বলে।

'কলকাতায়? কোথায়? কলকাতা বললেই বুঝি সব বলা হয়ে গেল? রাস্তার নাম নেই? বাড়ীর নম্বর নেই?'

তীব্র তীক্ষ্ণ প্রশ্নে—থতমত খাইয়ে দেয় কুঙ্কুম মহিলাটিকে।

'রাস্তার নাম। রাস্তার নামতো—'

সহসা নিতান্ত অভদ্রের মত সে ঘর থেকে উঠে যায় কুঙ্কুম। গিয়ে আছড়ে পড়ে নিজের ঘরে।

কুণাল ছিল না।

কুণাল এল।

অবাক হয়ে বলল 'কি হয়েছে কি? শরীর খারাপ লাগছে?'

'ও আবার বিয়ে করেছে—' ডুকরে উঠলো কুঙ্কুম।

'বিয়ে করেছে!' থতমত কুণাল বলে, 'কে বিয়ে করেছে?'

'ওই তোমার সাধের বন্ধু। বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে একটা। বৌ নিয়ে ছেলে নিয়ে বেড়াতে এসেছে আমি থাকবনা, আমি চলে যাবো।'

'কিন্তু কোথায় জানলে এসব? দেখা হয়েছে?'

বিপন্ন কুণাল অসহায়ের মত চারিদিকে তাকায়।

'আমি জানিনা। আমি বলব না। আমি চলে যাবো। এক্ষুনি চলে যাবো।'

'বেশ যাচ্ছি—' কুণাল গম্ভীর গলায় বলে, 'তোমার রহস্য তুমিই জানো। কিন্তু আমার জীবনের রহস্যলেখা আজ উদ্ধার হয়ে গেল। প্রস্তুত হও, আমি গাড়ী আনছি। একেবারে ষ্টেশনেই ফিরবো। বেড়ানোর ইচ্ছে মিটেছে।'

'তুমি রাগ করছো?'

কাতর প্রশ্ন করে কুঙ্কুম।

'রাগ?' ম্লান হাসি হাসে কুণাল, মানুষের মনে ওর চাইতে গভীরতর স্তরও আছে কুঙ্কুম।'

না তাজমহল দেখা হয়নি ওদের। আরো অনেক বেড়ানোও হয়নি।

ডুয়াসের সেই চা বাগানেই ফের ফিরে চলেছে ওরা। আর এই দীর্ঘপথ সেই যন্ত্রণার জায়গাটায় হাত দেয়নি কেউ।

এখন আর গাড়ীর জানালা নিয়ে কোন ছেলেমানুষী করছেনা কুঙ্কুম। শুধু তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দীর্ঘপথ ট্রেনে অতিক্রম করতে হবে। হাওড়া, দমদম, পেনে আলিপুরদুয়ার, তারপর মোটরে চা বাগান।

কিন্তু তারপর?

জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কঠোর সত্য জেনে ফেলার পর আর কি?

আমি শুধু ভাবছি কোথায় ওর সঙ্গে দেখা হল তোমার।'

অনেকগুলো ঘণ্টা পার হবার পর বলল কুণাল।

'ওর সঙ্গে নয়—' হতাশ নিস্তেজ গলায় বলে কুঙ্কুম, 'ওর বৌয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে।'

'বৌয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে!'

কুণাল বিস্ময়াহতের মত প্রশ্ন করে, 'কিন্তু কোথায়? তুমি তো আমার সঙ্গে ছাড়া, একলা বাইরে—'

'বাইরে নয় বাইরে নয়,' কুঙ্কুম অসহিষ্ণু স্বরে বলে, 'কালীবাড়ীতে। একেবারে পাশের ঘরে। সেই বাচ্চা ছেলেটা? সব সময় ছটফট করতো? আলাপ করতে গেলাম। কেনই যে গেলাম।'

'কি বললো তারা।'

কুণালও অসহিষ্ণু হচ্ছে।

'ওই ছেলেটা! ওর বাবার নাম বলল।'

একটু চুপ থেকে কুণাল ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'ওর বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। নামটা শুনে প্রথমে অবশ্য আমিও চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু এত কথা ভাবতে পারলে, আর একথা তোমার মনে এল না কুঙ্কুম, একই নামের লোক জগতে দু'দশজন থাকতে পারে।'

'তুমি আমায় ঠকাচ্ছ—।'

আবেগে উচ্ছলে উঠল কুঙ্কুম।

'লাভ কি?' কুণাল হাসল। 'আমার দাম তো নির্ণয় হয়ে গেছে, আর বানিয়ে বাজে কথা বলে লাভ কি আমার?

তারপরে চুপ হয়ে গেছে দু'জনে।

গাড়ী চলার দুরন্ত ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। শুধু মনের মধ্যে অজস্র শব্দ!

একজন ভাবছে কী নির্বোধ আমি, কী নির্বোধ। এই দীর্ঘদিন ধরে শুধু ঠকেই এসেছি।

আর একজন ভাবছে, 'কী নির্বোধ আমি, কী নির্বোধ! কেন চলে এলাম। কেন দেখে এলাম না। নিশ্চয়ই অম্লানই ছিল ওখানে। কুণাল ঠকাল আমায়!

পাছে দেখা হয়ে যায় এই আশঙ্কার ছদ্মবেশে, শুধু দেখা হওয়ার আশাই করেছে কুঙ্কুম। এটাই খালি টের পাচ্ছে না সে।

॥ তা হলে ?

না—কামড়ে কোনদিন দেয়নি।

সত্যি বলতে—লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কামড়াতে আসেওনি কোনদিন।

নিজের উন্নত নাসিকা আর উন্নাসিকতা নিয়ে অলস রাজকীয় ভঙ্গীতে বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় ও। বড় জোর অতিথি অভ্যাগত এলে সেই তার লম্বা নাকটি বাড়িয়ে তাকে একটু শুঁকতে আসে।

আর তাইতেই, কিন্তু তাইতেই বা বলি কেন, ওকে দেখলেই হাড়চামড়ার তলায় অবস্থিত হৃৎপিণ্ডটা যেন রক্ত চলাচল থামিয়ে হঠাৎ বরফ মেরে যায় পিকলু বিশ্বাসের। সে হৃৎপিণ্ডে আর স্পন্দন থাকে না কিছুক্ষণ।

বলছি মিসেস সামন্তর ওই নেকড়ের মত প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ানটার কথা, আদর করে যার নাম রেখেছেন তিনি জিঘাংসু।

একজন মহিলার পক্ষে তার পোষাপ্রাণীর জন্যে এহেন নাম নির্বাচন কি করে সম্ভব হতে পারে, পিকলু বিশ্বাসের কাছে দুর্বোধ্য। যদিও রাহুল রায় বলে, 'একজন মহিলার পক্ষে যদি ওকে পোষা সম্ভব হয়, পিঠ চাপড়ে আর গালে হাত বুলিয়ে আদর করা সম্ভব হয়, তবে আর নামকরণটায় আশ্চর্য হ'বার কি আছে? শখ, নিদারুণ প্যাটার্নের শখ।' তথাপি পিকলুর মনে হয় কেবলমাত্র নিছক শখ নয়, অর্থ নিহিত আছে ওই নামকরণের মধ্যে। গভীর অর্থ। কে বলতে পারে পিকলু আর পিকলুর মতই হতভাগ্য প্রসাদপ্রার্থীদের অবহিত রাখার জন্যেই এই নাম নির্বাচন কিনা। ওই নামের মধ্যেই জানানো হচ্ছে কিনা। সাবধান, সামন্ত বাড়ির গেট ডিঙোতে গেলে একটু ভেবো।'

কিন্তু? তবু?

অবহিত হ'তে পারে কই পিকলু বিশ্বাস? কই পারে নিজেকে সামলাতে? কবে পারে সামন্ত বাড়ির গেট না ডিঙোবার সংকল্প অটুট রাখতে? প্রত্যহই

তো গলির ঘুরপথ দিয়ে ঘুরে বাড়ির পিছনের বাগানে ঢুকে চুপি চুপি বাতায়ন পথে এসে কাতর প্রশ্ন করে 'ঝিলমিল! কুকুরটা ?'

ঝিলমিল মানে ঝিলমিল সামন্ত। মিষ্টার এবং মিসেস সামন্তর একমাত্র অলোক-সামান্য দুহিতা। ঘটনাচক্রের লীলা। প্রতিদিন ঠিক এই সময়টাতেই, মানে ঠিক যে সময়টায় পিকলু বিশ্বাস এ বাড়িতে এসে পৌছয়, কি করে যেন ঝিলমিলও ওই ওদের বাগানের দিকের ঘরটায় অকস্মাৎ এসে পড়ে। যে ঘরের জানলার নীচের কার্নিশে উঠে পিকলু ওই কাতর প্রশ্নটি করে। পিকলুর ইচ্ছাশক্তি অথবা ভাগ্যশক্তি কে যে ঝিলমিলকে এ সময় এখানে এনে ফেলে, সেটা এক ঈশ্বরই বলতে পারেন, তবে এটা ঘটে. রোজই ঘটে। পিকলু বিশ্বাসকে কোনদিনই শূন্য বাতায়ন পথে তাকিয়ে হতাশ নিশ্বাস ফেলতে হয়নি। যেইমাত্র সে জানলায় উঠে কুকুর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে, সেই তৎক্ষণাৎ ঝিলমিল সামন্তর লাল কালো গোলাপী হলদে নানাবর্ণে চিত্রিত মথটা জানলার কাছাকাছি সরে এসে ঝলসে ওঠে। আর ঝলসে ওঠে লিপস্টিক-টুকটুকে ঠোটের ফাঁকে জিভের আগাটুকু। মুখভঙ্গীটাও পিকলু বিশ্বাসকে একদম ঘায়েল করে ফেলবার মত,

'ঝিলমিল, কুকুরটা, মানে ?'

'আহা ইসে, মানে আর কি কুকুরটা কোথায় ?'

'ওঃ জিমি। ওই তো ওখানে।' ঝিলমিল চোখের ইসারায় তার পিছনের দরজাটা নির্দেশ করে।

পিকলু মাথাটা যতদূর সম্ভব উচু করে উকি ঝুকি মেরে কাতর কণ্ঠে বলে 'বাঁধা না খোলা ?'

'আশ্চর্য পিকলু, কতদিন বলেছি বাঁধা কোনদিনই থাকে না জিমি। বলিনি, বাঁধলে ও ক্ষেপে যায় ?'

'বাঁধলে ও ক্ষেপে যায়।'

দার্শনিক দার্শনিক একটা উদাস নিশ্বাস পড়ে, "কি ঝিলমিল, না বললে যে আমার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ—'

'তোমার ? ওঃ হো হো —'হাসি থামতেই চায় না ঝিলমিলের, উছলে উছলে ওঠে, 'তুমি ? মানে তোমার কথা বলছো ? তুমি আর নতুন করে কি ক্ষেপবে ?

'যা খুশি বল, কিন্তু দোহাই তোমার, অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যে বাঁধো ওকে। আমাকে একবার বাড়ির মধ্যে—'

তা হলে ?

'অসম্ভব ! জিমুকে বেধেছি জানতে পারলে জিমুর চাইতে বেশী ক্ষেপে যাবেন মা।'

'ঝিলমিল। তুমি কী নিষ্ঠুর। তা' হলে আমার উপায় ?'

'উপায় ? হি হি হি ? উপায় এই জানলা। খাচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে বনের পাখী ছিল—'

'কিন্তু খাঁচার পাখী হবার দরকার কি ? তুমি তো ইচ্ছে করলেই এখানে চলে আসতে পারো, এই বাগানে।'

'আমি ? হুঃ।' ঝিলমিল অবজ্ঞার হাসিতে ঝিলমিলিয়ে ওঠে, 'সঙ্গে সঙ্গে জিমুও বাগানে। বুঝলেন মশাই।'

'বুঝলাম।' পিকলু বিশ্বাস তার অনেক বড়ো ছিটের প্রিন্ট করা হাওয়াই সার্টের কলারটা ঝাকিয়ে বলে, 'বুঝলাম তোমাকে পাহারা দেবার জন্যেই ওকে বাঁধা হয়েছে।'

'ইস্।' ঝিলমিল ঘাড় বাঁকিয়ে আর এক অপূর্ব ভঙ্গী করে বলে ওঠে, 'তাই বৈকি ! ওকে বাঁধা হয়েছে আমাকে ভালবাসার জন্যে।'

'ভালবাসবার জন্যে। ঝিলমিল ! তোমাকে ভালবাসার জন্যে ওই নেকড়ের মত কুকুরটাকে—'

'তাতে কি। মানুষের ভালবাসার চাইতে কুকুরের ভালবাসা অনেক খাটি, বুঝলে ? দেখবে একবার ডাকলেই কেমন—' সহসা অত্যন্ত একটা সরু সুরে শীস দেওয়ার মত ডেকে ওঠে ঝিলমিল, 'জিমু। জিমু।'

সত্যিই মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে এসে বাঘা কুকুরটা। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে না, বীরগতিতে। এসে দুই পায়ে ভর দিয়ে প্রায় সোজা খাড়া হয়ে উঠে—বাকী দুই পা জানলার উপর চাপিয়ে ঝিলমিলের পাশাপাশি দাঁড়ায়।

ঝিলমিলের গায়ে গা ঘেঁষে।

বলা বাহুল্য এই দাঁড়ানোর পূর্ব-মুহূর্তেই পিকলু বিশ্বাস নিচে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাত দশেক দূরে।

'কি হল ?' আবার সেই উছলে ওঠা হাসি, 'জানলার বাইরে থেকেও এত ভয় ?'

'ঝিলমিল। তোমার মুখের পাশ থেকে ওর মুখ সরাও। সরাও বলছি।'

'কী আশ্চর্য। তুমি কী হিংসুটে। কই বাহুল তো এমন করে না। সে

আমার জিষুকে কত টফি খাওয়ায়, কত আদর করে—'

'উচ্ছন্ন যাক তোমার রাহুল।'

বলেই হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে গটগট করে চলে যায় পিকলু বিশ্বাস তার চিত্তির বিচিত্তির করা নাইলন সার্টের কলার উড়িয়ে।

এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

পিকলু যে ভাবে গটগটিয়ে চলে যায়, দেখলে আশঙ্কা করা যেতে পারে জীবনে আর সামন্ত বাড়ির রাস্তামুখোও হবে না সে, কিন্তু আবার হয়। পরদিন আবার ঠিক একই সময় আর ঠিক ওই একই জায়গায় ফের জানলার এপার থেকে পিকলু বিশ্বাসের কণ্ঠ ভেসে ওঠে 'ঝিলমিল, কুকুবটা ?'

আর দৈবাতে নির্বন্ধে ঝিলমিল সামন্তও তো ঠিক সেই সময়ই ভয়ানক একটা দরকারে তাদের বাড়ির পিছনের বাগানের দিকের এই ঘরটায় এসে পড়েছে, কাজেই ওই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তার লাল কালো হলদে গোলাপী ইত্যাদি বহু বর্ণে চিত্রিত মুখটা ঝলসে ওঠে জানলার কাছাকাছি।

কিন্তু ঠিক ওই জানলার মাথার উপর ঠিক ওই রকম একটা জানলা আছে, যেটা নাকি বাড়ির দোতলার ঘরের, সেখানেও ঠিক এই সময়টিতে একখানি মুখ ঝলসাতে থাকে আগুনের তাপে বেগুনের মত। সে মুখ মিসেস্ কেতকী সামন্তর।

পিকলু বিশ্বাসের এই আগমন আর বহির্গমনের দৃশ্য কেতকী সামন্ত নিত্য পর্যবেক্ষণ করেন। হ্যা শুধু আগমন আর বহির্গমনের দৃশ্যই, কারণ জানলার ঠিক নীচেটায় কি ঘটছে না ঘটছে তা' ঠিক বোঝা যায় না। জানলার গ্রীলগুলো ভেঙে ফেলে উঁকি না দিলে বোঝা যাওয়া সম্ভবও নয়। মাঝে মাঝে সে ইচ্ছেও যে না করে কেতকী সামন্তর তা' নয়। ইচ্ছে করে গ্রীলগুলো খুলে ফেলে বাধামুক্ত সেই ফোকরটায় দেহের আধখানা বার করে দিয়ে ঝুঁকে, আরও ঝুঁকে দেখে নেন ওই লক্ষ্মীছাড়া পিকলুটা, বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ড গবেটটা, জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী এত কথা কয়! কার সঙ্গেই বা কয়। যদিও কার সঙ্গে কয়, সেটা না দেখেই বোঝা যায়। তবে ঝিলমিল মাতৃসকাশে স্বীকার করে না, জীবনে কোনও দিনও সে নীচের ওই জানলাটার কাছ বরাবরও গেছে, আর জীবনেও কোনদিন পিকলু বিশ্বাসকে ওখানে আসতে দেখেছে। এ বিষয়ে জেরা করতে গেলেই সে হি হি করে হেসে উঠে বলে 'দিবাস্বপ্ন দেখা একটু কমাও মা,

তা হলে?

একটু কমাও।'

অথচ সরাসর গিয়ে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলবেন এ উপায় কেতকী সামন্তর নেই। না, একেবারেই উপায় নেই।

কেতকী সামন্তর হার্টের অসুখ।

ডাক্তারের বারণ খাট থেকে নামা। জানলায় দাড়ান তিনি ডাক্তারকে লুকিয়ে নার্সকে ঘুস দিয়ে।

কিন্তু অনেক সহ্য করেছেন কেতকী, আর পারছেন না। ওই হতচ্ছাড়া ছোকরাটার কাঁধ নাচিয়ে বেরিয়ে যাওয়া দেখে রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাচ্ছে তাঁর। এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না তিনি।

তার পরামর্শ করতে ডেকে ছেন ননদাইকে। ঝিলমিলের পিসেমশাই। বিরূপাক্ষ বাহুবলীন্দ্রকে।

'হেস্তনেস্ত আর কি', ঝিলমিলের পিসেমশাই বিরূপাক্ষ বাহুবলীন্দ্র সোফায় বসে পা নাচাতে নাচাতে শালাজের সমস্ত দুশ্চিন্তা নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, 'এক্ষেত্রে হেস্তনেস্ত হচ্ছে হস্ত পীত হস্ত করা। ছোকরাটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলুন।'

'বিয়ে দিয়ে ফেলব? বলছেন কি আপনি?'

ননদাইয়ের আগমন মাত্রেই কেতকী সামন্ত সম্পূর্ণ শয্যালগ্ন হয়েছিলেন এবং চি চি শব্দে কথা বলছিলেন, সহসা আবেগের বশে উঠে বসে বেশ গলা খুলেই বলে ফেলেন, 'এই আপনার সমাধান হল?'

'কেন নয়?' বিরূপাক্ষ বাহুবলীন্দ্র অলস ভঙ্গীতে ধোঁয়া উড়িয়ে বলেন 'কেন নয়? আপনি যা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে আমাদের মেয়ের প্রতি কিছু অনুরাগ জন্মেছে ছোকরার, কেমন কি না?'

কিঞ্চিৎ অনুরাগ?' মিসেস সামন্ত স্পাইনের গদি ঝাকিয়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, 'একে আপনি কিঞ্চিৎ অনুরাগ বলেন? এই বাগানের পাচীল টপকে আসাকে? আমি বলবো এ হচ্ছে রীতিমত আসক্তি।'

'আহা ওই হল। ও আপনার গিয়ে দুইই এক। না হয় অনুরাগ নয়, আসক্তিই। কিন্তু তার দাওয়াই ওই বিয়ে ছাড়া আর কি? বিয়ের পর তিনটি মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, তারপর দেখুন! দেখুন সেই আসক্ত ঘোরতর অনাসক্তিতে পরিণত হয়েছে কিনা। স্ট্যাম্পো কাগজ আনুন লিখে দিচ্ছি।

দেখলাম তো অনেক, আপনার গিয়ে ওই অনুরাগকে বীতরাগে পরিণত করতে, আসক্তিকে অনাসক্তিতে তুলতে, বিয়ের মতন এমন দাওয়াই আর নেই।'

'ঠাকুর জামাই।' মিসেস সামন্ত তীব্র অভিমানে বলে ওঠেন 'আপনি কি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন?'

হ্যাঁ, বহুদিন পরিত্যক্ত 'ঠাকুরজামাই—' সম্বোধনটিই করে বসেন কেতকী সামন্ত। রাগ-অভিমান ক্ষোভ হতাশা বহুবিধ আবেগে আলোড়িত হয়েই করেন। আগে, অনেকদিন আগে যখন গজানন সামন্ত অভিজাত পাড়ায় এই শৌখীন বাড়িখানা করেননি, কেনেননি এ হদ্দ ও হদ্দ লম্বা ওই গাড়িখানা, ঘরে ঘরে আধুনিক আসবাবপত্রের রাশি এনে ঠাসেননি, এবং মিসেস সামন্ত অ্যালসেশিয়ান পোষেননি, তখন ননদাইকে ঠাকুরজামাই বলেই সম্বোধন করতেন কেতকী সামন্ত।

এখনকার কথা অবশ্য আলাদা। এখন কেতকী ননদাইকে 'মিষ্টার বাহুবল' বলেন। সম্পর্ক হিসেবে তামাসা করাও হয়, আবার শুনতেও সভ্যভব্য হয়। তা'ছাড়া বাহুবল না হলেও বাহুবলাক্ষ যে কেতকী সামন্তর বল বুদ্ধি ভরসা তা'তে আর সন্দেহ কি?

যদিও শ্রীযুক্ত গজানন সামন্ত কেবলমাত্র বুদ্ধিবলেই কুঁড়ে থেকে প্রাসাদে উঠেছেন, মাটি থেকে গাড়িতে, তবু কেতকী সামন্ত আত্মপরায়ণা নন। গজাননের প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি আচার আচরণেই তিনি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পান! আর যদিও বিপাশাক্ষ বাহুবলাক্ষ বাপের জমিদারী বিক্রী করে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারী ফেল করে দেশে ফিরেছিলেন এবং এ যাবৎ শুধু কোঁকড়ের উপর দিয়েই দামী দামী স্যুট আর মোটা মোটা চুরুটের চাল চালিয়ে এলেন, তবু তাঁকেই সর্বক্ষেত্রে বেশী প্রাধান্য দেন কেতকী সামন্ত।

এই সোফায় আধখানা গা হেলিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসা এই অনায়াস অবলীলায় ঘরের মধ্যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে চলা, এই কেবলমাত্র কথার জোরে রাজা উজির মারা, এ সবের প্রতি ভারী একটা মোহ আছে কেতকী সামন্তর। ননদাইকে তিনি স্বামীর চাইতে অনেকটা বেশী দামের মানুষ বলে মনে করেন! তাই যাবতীয় পরামর্শের ব্যাপারে ওঁকেই তলব করেন। আজও তাই করেছেন।

তা হলে ?

শালাজের ক্ষুব্ধ প্রশ্নে বিরূপাক্ষ অলসভঙ্গী ত্যাগ করে সোজা হয়ে বসেন সকৌতুকে বলেন, 'মিসেস কি রাগ করলেন নাকি ?'

'রাগ নয় মিষ্টার বাহুবল, রাগ নয়,' কেতকী সামন্ত ছলছল চোখে বলেন 'অভিমান। আমি চিন্তায় পড়ে আপনার কাছে পরামর্শ চাইছি, আর আপনি কিনা—'

'কী মুস্কিল! আমি তো যথার্থ কথাই বলছি মিসেস! আপনি চান ওই ছোকরা আপনার মেয়ের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করুক এই তো ?'

'হুঁ, সেই কথাই তো বোঝাচ্ছি আপনাকে।'

বিরূপাক্ষ বাহুবলীন্দ্র টেবিলে একটা প্রচণ্ড থাবা বসিয়ে বলেন, 'আমি ঠিকই বুঝেছি মিসেস, বুঝছেন না আপনি। এ রকম ক্ষেত্রে বাধা দিতে যাওয়া মানেই তো বিপদ ডেকে আনা। প্রেম আর জেদ—একে কখনো বাধা দিয়ে রুখতে পারা যায় না। দিতে গেলেও চড়চড়িয়ে বেড়ে ওঠে। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাধা দিয়ে কে কবে প্রেমকে শায়েস্তা করতে পেরেছে ? বিয়ে দিয়ে দিন, দেখবেন ওসব প্রেম-টেম একেবারে ভিজে কাঁথার মতন চ্যাবচেবে হয়ে উঠবে। আর ওই ছোকরা তখন, যা আপনি চাইছেন, আমাদের মেয়েটাকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করবে !'

'মিষ্টার বাহুবলী!' কেতকী সামন্তর বোধকরি এতক্ষণে খেয়াল হয় তিনি হার্টের রোগী, তাই আর্তনাদের স্বরে এই ডাকটি ডেকে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়েন। তারপর মিনিটখানেক হাঁপিয়ে নিয়ে কাঁদোকাঁদো গলায় বলেন, 'আপনি যে দেখছি মিসেস সামন্তর মতন হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। বিয়ের পর আমার মেয়েকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলে, আমার সান্ত্বনা পাবার কি আছে ?'

'ও সরি! তা' নেই বুঝি ?'

'না। তা'ছাড়া ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা কি আমার মেয়ের যোগ্য পাত্র ?'

'সে কি, কেন ? আপনি যে বললেন ছোকরা বড়লোকের ছেলে। তার ওপর নাকি ওর বাপ-মাটা মরে ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়ে গেছে।'

'আহা সে না হয় বলেছি। কিন্তু পয়সা ছাড়া আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে ওর ?'

'ব্যস ব্যস!' বিরূপাক্ষ ললাটাক্ষ হয়ে ওঠেন, 'আবার কি কোয়ালিফিকেশন

চাই? লঙ্কার মধ্যে কি আপনি নবরস খোঁজেন? খোঁজেন না তো? তার ঝাল থাকলে হলো। তেমনি হচ্ছে মেয়ের বিয়ের পাত্তর। তার কাছে বাড়তি কিছু চাইবার দরকার কি? না, কোনো দরকার নেই, পয়সাটি থাকলেই হলো।'

'তাই কি ঠিক মিষ্টার বাহুবল?'

কাতর কাতর চাউনি নিক্ষেপ করেন কেতকী সামন্ত।

বিরূপাক্ষ আকণ্ঠ বোঝাই ধূমকুণ্ডলী ধীরে ধীরে ছাড়তে ছাড়তে বলেন, 'একশোবার ঠিক। এই আপনার জীবন দিয়েই দেখুন না? শালাবাবু যখন ইস্কুল মাষ্টার ছিলেন, পয়সা ছাড়া আর সবই ছিল তার? বিদ্যে বুদ্ধি সভ্যতা ভব্যতা, নম্রতা, বিনয়, কিন্তু আপনি কি সুখী ছিলেন? ছিলেন না! অথচ এখন? এখন ওসব আলটু বালটুগুলো সমস্ত খসে গেছে, তবুও আপনি কত সুখী! কেন? বলুন কেন?'

'আর সুখ!' কেতকী সামন্ত নিশ্বাস ফেলে বলেন, সুখের মুখও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে অসুখেও ধরলো।'

'আহা সে তো ধরবেই। ওটাই তো পয়সার পরিচয়পত্র মিসেস। হার্টের অসুখ সুখের যমজ বোন।'

'আপনার যত সব উদ্ভট কথা।' মিসেস কেতকী সামন্ত বুকের ওপর দুই হাত জড় করে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে থাকেন। তারপর বলেন, 'কিন্তু ওই বখাটে ছোকরাটাকে কি লোকের কাছে জামাই বলে পরিচয় দেওয়া যায়? বলুন মিষ্টার বাহুবল।'

'আপনি একটা ভুল করছেন মিসেস! মানে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আপনি দেখছি সেই পৌরাণিক মনোভাবই নিয়ে বসে আছেন। পরিচয় কি মুখে বলে বলে দিয়ে বেড়াতে হয়? পরিচয় দেবে তার গাড়ীর মডেল, তার জামাজুতোর কোয়ালিটি, তার কায়দাকানুন। পয়সা থাকলে এ সমস্তই হয়ে যাবে। ও আপনার বেবিই দু'দিনে দোরস্ত করে নিতে পারবে।'

'কিন্তু মিষ্টার বাহুবল! ওই রাহুল!'

'রাহুল? রাহুল কি?'

'রাহুল রায়! ওই যে ছেলেটি রোজ আসে, 'মাসীমা-মাসীমা' করে কত ভালবাসে আমায়, এসেই আগে আমার স্বাস্থ্যের খবর নেয়, কতোক্ষণ আমার

তা হলে ?

কাছে বসে থাকে। আমার জিবুকে টফি খাওয়ায়, চকোলেট খাওয়ায়—'

'হুঁ। ওই রকম এক ছোকরাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

বিরূপাক্ষ বাহুবলীন্দ্র অসতর্কে টেবিলে পা তুলে ফেলেছিলেন, মনে পড়ে গেল একজন মহিলার সামনে এটা অশোভন, তাই তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিয়ে বলেন, 'তা' কি ? সেও কি বেবির প্রতি আসক্ত ?'

'মিষ্টার বাহুবল। অনুগ্রহ করে 'আসক্ত' শব্দটা ব্যবহার করবেন না। রাহুল অতি সভ্য ভদ্র ছেলে, বলুন বেবির প্রতি তার অনুরাগ।'

'আচ্ছা হল না হয় তাই। তা' আপনি কি তাকেই জামাই করতে চান ?'

'তাকে ?' মিসেস সামন্ত একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'তা যদি চাইতে পারতাম, মিষ্টার বাহুবল।'

'ম্যারেড !' মিসেস সামন্ত আবার ভুলে যান তিনি হার্টের অসুখের রোগী। তাই আবার উঠে বসেন। বলেন, 'মিষ্টার বাহুবল ! আপনি যে সত্যিই মিষ্টার সামন্তর মতই বোকা হয়ে উঠছেন। একটা বিবাহিত ছেলেকে আমি বাড়িতে আসাযাওয়া করতে দিচ্ছি এই আপনি ধারণা করছেন ?'

'ওঃ তাও তো বটে। তবে কি ? মানে জামাই করতে চাওয়ায় বাধাটা কোথায় ? কোনরকম অসুখ টসুখ ?'

'না না মিষ্টার বাহুবল, অতি সুস্থ সুন্দর ছেলে সে।' মিসেস সামন্ত ফের শুয়ে পড়েন। ফের ঘন ঘন হাঁপাতে থাকেন।

'তাই তো !' বিরূপাক্ষ আর একবার ভুলে টেবিলে পা তুলতে গিয়ে পা নামিয়ে নেন, নিয়ে চিন্তিত মুখে বলেন, 'তবে কি—

'আপনি কিছুই অনুমান করতে পারবেন না মিষ্টার হুবল। আমিই বলছি। ছেলেটার কোনও ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই।'

'অ্যাঁ !'

'হ্যাঁ।' কেতকী সামন্ত আরও ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন, 'ওইতেই মেরে রেখেছে আমায়।'

'আশ্চর্য ! অথচ এই ছেলেকে আপনি বাড়িতে যেতে আসতে দিচ্ছেন ? এই টাকা নেই পয়সা নেই, হতভাগা !'

'কি করবো—মিষ্টার বাহুবল, ও যে আমার জিঘুকে ভালবাসে ! আর, আর, আমাকেও।'

'লেখাপড়া করেছে কিছু ?'

'তা' করেছে। বি এ পাশ।'

'তবে লাগিয়েই দিন বিয়ে।'

'কি যে বলেন মিষ্টার বাহুবল? বললাম না আপনাকে, ওর কোন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই। সামান্য একটু কি চাকরী করে।'

'আ ছি ছি! সামান্য একটু চাকরী! তবে আপনি ওই জানলায় উঁকি দেওয়া ছেলেটার সঙ্গেই বিয়ে লাগিয়ে দিন।'

'তাই বা কি করে হয় মিষ্টার বাহুবল। আগেই তো বলেছি—'

'তা' একটা তো মনস্থির করতে হবে?' বিরূপাক্ষ ডান হাতের তর্জনীটা তুলে এদিক ওদিক নাড়তে নাড়তে বলেন, 'হয় এ, নয় ও। বলুন কাকে জামাই করতে চান? ঠিক করে ফেলুন, ঠিক করে ফেলুন।'

মিসেস সামন্ত হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলেন, কি করে ঠিক করে ফেলবো মিষ্টার বাহুবল! আমি যে ওদের দুজনকেই চাই, আর দুজনকেই চাই না।'

অপর একটা ঘরে ঠিক এই একই আলোচনা চলছিল।

এখানে বক্তা ঝিলমিল, শ্রোতা তার বান্ধবী পল্লবিনী।

পল্লবিনীও বিরূপাক্ষের প্রশ্নই তুলেছে।

'কাকে চাই?' ঝিলমিল উদাস উদাস মুখে বলে, 'সত্যি কথা বলবো পলু, আমি কাউকেই চাই না, আবার দুজনকেই চাই।'

'দুজনকেই চাস? বলিস কি?'

পল্লবিনী যেন সাপ দেখে আঁৎকেছে।

'হ্যাঁ, ওই তো বললাম! কখনো মনে হয় কাউকেই চাই না, মনে হয় পিকলুটা একটা সার্কাসের ক্লাউন আর রাহুলটা একটা বেনে। আবার কখনো দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়, মনে হয় রাহুল একটা পারফেক্ট ভদ্রলোক, আর পিকলু একটি সত্যিকার তাজা তরুণ। আসলে কথা কি জানিস পলু এর কোনটাই ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।'

পল্লবিনী ভয়ে ভয়ে বলে, 'এর কোনটাই ছাড়তে ইচ্ছে হয় না?'

'না।' ঝিলমিলও আঙুল নেড়ে নেড়ে বলে, 'ধর পিকলুর গ্ল্যামারটা যদি রাহুর মধ্যে থাকতো অথবা রাহুর সভ্যতাটা পিকলুর মধ্যে। রাহুর গদগদ ভাবটা পিকলুর মধ্যে অথবা পিকলুর রাগটা রাহুর মধ্যে—'

তা হলে ?

'ধরেছি, আসল কথাটা ধরতে পেরেছি—' পল্লবিনীও আঙুল নেড়ে নেড়ে বলে, 'ধর পিকলুর নাকটা যদি রাহুর মুখের মাঝখানে বসানো থাকতো অথবা রাহুর কান দুটো পিকলুর মুখের দু'পাশে—'

'তুই ঠাট্টা করছিস পল্ল ? আমার মরণ বাচন অবস্থা বুঝছিস না ? ওরা দু'জনে আমার জীবন মহানিশা করে তুলেছে, বুঝছিস সেটা ?'

কিন্তু ওদের সঙ্গে যখন কথা ক'স মোটেই তো সে কথা মনে হয় না।

'কি করবো।' সোফার গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে ঝিলমিল, 'ওদের সামনে সিরিয়স হলে কি আর ওরা বাচতে দেবে আমায় ?'

'তাহলে ওই দুটো হ্যাংলার জন্যে মরতেই থাকবি ? প্রতিকার করবি না ?'

সহসা ঝিলমিল একটু ঝিনমিনিয়ে হেসে ওঠে, 'অবিশ্যি ওর মধ্যেও একটু কথা আছে। মানে আর কি, ওদের ওই হ্যাংলা-পনাগুলোও যে ছাড়তে পারিনে, কেমন নেশার দাড়িয়ে গেছে।'

'নেশায় দাড়িয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। একদিন দু'জনের একজন কেউ কামাই করলেই কেমন খালি খালি ঠেকে।'

'ছাখ ঝিল।' পল্লবিনী শিরশিরিয়ে ওঠে, 'এ রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে বিয়ে। যাকে হোক একটাকে বিয়ে করে ফেল।'

'করে ফেলবো বলছিস ?' ঝিলমিল উদাস মুখে বলে, 'বিয়ের কথা ভাবলেই আমার বুকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। মনে হয় বিলকুল খরচ হয়ে গেলাম। কে ওখানে ? ও—তুমি ? কাল যে বললে। আজ আর আসবে না ?'

রাহুল রায় আলু ভাতের মত গোলালো মুখ আর গোল করে বলে, 'আসতাম না, বিশেষ কাজই ছিল। নেহাৎ শুধু জিষ্ণুর জন্যে গোটাকত টফি এনেছিলাম, মানে ওর কি কালকেরগুলো তেমন ভাল ছিল না তাই। আর মাসীমার হার্টটা কেমন আছে—'

'না জেনে গেলে বাড়ি ঘুমতে পারবে না তাই। এই তো ?'

'দেখছেন আপনার বান্ধবীর কি রকম কথাবার্তা ?' পল্লবিনীকে সালিশ মানে রাহুল রায়, 'মানুষের হৃদয়ের দিকে ত ফিরে দেখেন না। মাসীমাকে যে আমি বাস্তবিকই নিজের মাসীমার মতন ভালবাসি বলেই—'.

'আহা, তোমার নিজের বুঝি কোন মাসীমা নেই রাহু? বেচারা।'

'তুমি আমার নামের শেষাক্ষরটা বাদ না দিলেও পারো ঝিলমিল।'

'আহা তাতে কি? তুমিও তো মাঝে মাঝে আমার মানে কেউ যখন ঘরে থাকে না তখন নামের আদ্যাংশটা বাদ দিয়ে ডাকো। সে কথা হচ্ছে না, বলছি তোমার মাসীর কথা। তোমার কোন মাসী নেই, না?'

বলা বাহুল্য রাহুল আর অবহিত নেই, তাই অবলীলাক্রমে বলে, 'থাকবেন না কেন, তিনজন মাসী আমার।'

'ইস। তাই বুঝি। তাহলে তো আবার কী কষ্ট তোমার। রোজ তিন তিনটে বাড়িতে যেতে হয় তো—'

যেতে হয়।

রাহুল অবাক হয়ে বলে, 'কেন যেতে হবে, কেন?'

'হবে না?' আরও অবাক হয় ঝিলমিল, নিজের মাসীর মতন ভালবাসলেই যদি রোজ একবার করে না দেখলে—'

'আঃ ঝিল!' ঝিলমিলের বান্ধবী চাপা শাসন করে, 'তোর যদি একটু ইয়ে আছে। এভাবে বলে মানুষকে?'

'ওমা কী ভাবে আবার? আমি তো বেশ ভালভাবেই—জি—বু। জিঘু।'

—হঠাৎ গলার সুর বদলে যায় ঝিলমিলের। যন্ত্রের মত মিহি তীব্র একটা শব্দ বেরোয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয় জিঘাংসু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নয়, ধীরে সুস্থে উন্নাসিক ভঙ্গীতে।

রাহুল রায় সাবধানে দূরত্ব বাঁচিয়ে পকেট থেকে একটা চকোলেট বার করে ফেলে দেয় জিঘাংসুর সামনে, আর সে বার দুই জিনিসটার আঘ্রাণ নিয়ে অবহেলার ভঙ্গীতে সরে যায়।

'ইস, খেলো না। এত যত্ন করে আনলেন আপনি।' পল্লবিনী হতাশভঙ্গী করে। বেচারা রাহুল রায়ের প্রতি তার মমতা আসে। রাহুলও বোধ করি এ মমতা টের পায়, তাই সকরুণ কণ্ঠে বলে, 'ঠিক আপনার বান্ধবীর মত। হৃদয় বলে কিছু নেই।'

তা হলে ?

ঘর সংসারের কোনও খবর গজানন সামন্ত রাখেন না। রাখতেন, সেই অনেকদিন আগে যখন স্কুল মাষ্টার ছিলেন, তখন রাখতেন। তখন দৈনিক বাজার করতে বেরোবার সময় জিগ্যেস করে বেরোতেন, 'কি গো, তোমাদের কি কি চাই ?'

অবশ্য কেতকী সামন্ত কোনদিনই এর সহজ উত্তর দিতেন না। বরং উল্টে প্রশ্ন করতেন কোন্ কোন্ চাহিদা পূরণ করবার ক্ষমতা গজাননের আছে ? আর এও প্রশ্ন করতেন—'কি চাই' এ প্রশ্ন করতে গজাননের লজ্জা হয না কেন ?'

গজানন সে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে উঠতে পারতেন না, আকাশ পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে বোধ করি উত্তরটা খুঁজতেন।

তারপর কোথা দিযে কি হতে লাগলো, আকাশ কি পাতাল কে জানে কোথা থেকে উত্তর খুঁজে পেলেন গজানন, শুধু তদবধি সেই গজাননকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

না, এখনকার এই ঘাড মোটা, রগছাঁটা, স্যুটপরা আর টাকা নিয়ে খোলামকুচি খেলা গজাননের মধ্যে থেকে সেদিনের আধময়লা টুইল সার্ট আর চুযাল্লিশ ইঞ্চি ধুতি পরা গজুমাষ্টারকে কেউ খুঁজে পাবে না।

এ গজানন ঘর সংসারের কোনও খবর রাখেন না। শেয়ার মার্কেট ছাডা জগতে আর কোন কিছু আছে এ কথা ভুলেই গেছেন গজানন।

তাই মিসেস কেতকী সামন্ত যখন অনেক তলব দিযে ডাকিযে এনে মেয়ের বিয়ের কথা পাড়লেন, তখন যেন পাগলের পাগলামি দেখে হেসে উঠলেন গজানন।

'বিয়ে ! কার বিয়ের কথা বলছো ?'

কার বিয়ের কথা !

কেতকী সামন্তও বুঝি ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি দেখলেন, 'আমি আবার কার বিয়ের কথা বলতে যাব ? পাড়ার লোকের মেয়ের ? বেবির বিয়ের কথা যে তুমি ভাবছোই না।'

'বে—বি ! আই মীন আমাদের বেবির বিয়ের কথা বলছো ?'

হঠাৎ হো হো করে হাসতে থাকেন গজানন সামন্ত, বেঁটে ঘাডে থাক পড়িয়ে পড়িয়ে।

'হাসছো যে?' কেতকী সামন্তর মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

'হাসবো না? বল কি? এখন থেকেই তুমি বেবির বিয়ের কথা ভাবছো?'

এখন থেকেই!

কেতকী সামন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'বিয়ের বয়েস হয়নি বেবির?'

'পাগল না মাথা খারাপ! আরও দশটা বছর হেসে কাটাক, তারপর ভাবা যাবে।'

মিসেস সামন্ত কাঁদো-কাদো গলায় বলেন, 'তার মানে তুমি চাও না যে আমি মেয়ের বিয়েটা দেখি।'

'অ্যাই দেখ! না দেখার কথা কি হলো?'

'আরও দশ বছর আমি বাঁচবো?'

'বাঁচবে না মানে? আলবৎ বাঁচবে। বাঘা বাঘা স্পেশালিস্টরা আছে কি করতে? কড়া-কড়া ইন্‌জেকশন্? এই এই আরে, আরে উঠে বসছো যে? কী সাংঘাতিক! নার্স নার্স!'

কেতকী ফের শুয়ে পড়ে কাদো-কাদো গলায় বলেন, 'যাও তুমি, যাও এঘর থেকে। আমার জিঘুকে একটু পাঠিয়ে দাওগে।'

'তা দিচ্ছি' গজানন বলেন, 'কিন্তু তুমি ওই বেবির বিয়ে বিয়ে করে হেলথ নষ্ট করতে বোসো না। আশ্চর্য, ওই একটা বাচ্চা—'

'বাচ্চা?'

'তবে না তো কি? ও বিয়ের কি বোঝে?'

'সংসারের খবর কিছু রাখো?'

'কোনও দরকার নেই কেতু, কোন দরকার নেই। সংসারের খাবারটা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জুগিয়ে যাওয়া যায়, তবে তার খবর না রাখলেও চলে।'

শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে যান গজানন সামন্ত।

একটু পরেই রাহুল এসে ঢোকে।

'মাসীমা কেমন আছেন?'

কেতকী সামন্ত আলতো লিপস্টিক মাখানো ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন 'ও কথা আর জিগ্যেস করো না রাহুল, জিগ্যেস করলেই আমার হার্টের প্যালপিটেশন

তা হলে ?

শুরু হয়।'

'অ্যা! সে কী! উঃ আমি কি নিষ্ঠুর! মাসীমা, আর কখনো একথা জিগ্যেস করবো না।'

'জিগ্যেস করবো না? রাহুল তুমি কী নিষ্ঠুর, আমি কেমন আছি সেটুকু তুমি জিগ্যেস করবে না?'

কাতরকণ্ঠে উত্তর দেয় রাহুল, 'করবো বৈ কি মাসীমা, নিশ্চয় করবো। কখনো করবো না, কখনো করবো।'

'রাহুল!' হতাশ নিশ্বাস ফেলেন কেতকী সামন্ত, 'তোমার যদি ব্যাঙ্কে অন্ততঃ লাখখানেক টাকাও থাকতো!'

সেই টাকা আর টাকা!

যখন তখনই এই লাখখানেক টাকার আক্ষেপ করেন কেতকী সামন্ত। মাত্র এটুকুও যদি থাকতো রাহুলের!

কিন্তু কেন

ধার চান?

প্রশ্ন করতে সাহস হয় না রাহুল রায়ের তাই গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যার অর্থ হতে পারে -'হায় যদি থাকতো!'

'রাহুল, 'পিকলু বিশ্বাসকে তুমি চেনো?'

পিকলু বিশ্বাসকে!

থতমত খায় রাহুল। টাকা থেকে আবার পিকলু প্রসঙ্গে কেন? তবে কি মূল কারণ ওই টাকাই? পিকলুর তো অনেক টাকা!

'কই বললে না রাহুল?'

রাহুল কি উত্তর দেবে? বলবে চেনে না? যদি সেই অজ্ঞতাটা অপরাধ বলে গণ্য হয় মিসেস সামন্তর কাছে! চেনে বলবে? বললে কি ফ্যাসাদে পড়তে হয়? যদি ধার নেওয়ার মাধ্যম হতে হয়! তাই সন্তর্পণে বলে, 'চিনি কিনা বলা বড় শক্ত মাসীমা, মানুষ চেনা তো সহজ নয়।'

'আঃ রাহুল, এত সুন্দর করে কথা বল তুমি উঃ পিকলুটা যদি তোমার মতন হতো!'

নাঃ সামন্ত মাসীমার আক্ষেপের অর্থ বোঝা রাহুল রায়ের কর্ম নয়, তাই রাহুল কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'জিঘাংসুকে ডেকে দেব মাসীমা ?'

'জিঘুকে ? তাই দাও রাহুল ! এ পৃথিবীতে জিঘুই আমার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল।'

যমের যেমন মোষ, শীতলার যেমন গাধা, গণেশের ইঁদুর আর ইন্দ্রের হাতী, পিকলুর তেমনি মোটরবাইক।

মোটরের চেয়ে মোটরবাইক পিকলুর বহুগুণে প্রিয়। মোটর গাড়ি আর কি ? কিছুই না। মোটরবাইক যেন জীবন্ত উল্লাসের প্রতীক ! বন্য বর্বর জীবন্ত উল্লাস। পিকলুর মনের সঙ্গে এই বাহনটার বেজায় খাপ খায়, তাই যখন তখন এই বাহনটি নিয়ে বেদম বেরিয়ে পড়ে পিকলু। প্রায়শঃই অবশ্য সঙ্গে একটা করে বন্ধু থাকে। রকের আড্ডার সঙ্গী। তাকে ঝাঁকিয়ে নাচিয়ে তচনচ করে তবে ছুটি দেয় পিকলু।

হাড়মাস আলাদা হতে বসে, তবু পিকলুর আমন্ত্রণ কেউ ছাড়তে চায় না।

চাইবে কোন প্রাণে ?

পরের পয়সায় গাড়ি চড়ার সুযোগ পেলে কে কবে ছাড়ে ?

রাহুলও ছাড়ে না। তাছাড়া দু'জনে বাল্য বন্ধু।

পিকলু আঙুল নেড়ে ডাকতেই পথের ও ধার থেকে গুটি গুটি এসে দাঁড়ায়।

'উঠে পড়, উঠে পড়।' আদেশের সুর ধ্বনিত হয় পিকলুর কণ্ঠ থেকে।

রাহুল গম্ভীরভাবে বলে, 'কিন্তু পিকলু, ভুলে যেও না তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'ভুলে ? শয়নে স্বপনে ওই তো চিন্তা।'

'কার চান্স আসবে মনে হয় ?'

'ওহে আলুভাতে মুখো রাহুল রায় ! যদি ওই নেকড়েটা ওদের বাড়ি না থাকতো তো উচিত জবাব দিতে পারতাম তোমার এই ধৃষ্টের মত কথার।'

'কিন্তু ওটা আছে, আর থাকবেও।'

আলুভাতের মাঝখানে হাসির ঝিলিক খেলে।

তা হলে ?

'তা থাকবে বৈকি, যে রেটে টফি খাচ্ছে পরমায়ু বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওহে তিন পয়সার কেরানী, তোমার মাইনের অর্ধেক যে কুকুর ভোজেই বেবিয়ে যাচ্ছে ?'

'দেখ পিকলু, তোমার কথায় আমি অপমানিত বোধ করছি।'

'করছো নাকি ? তবে চল, বৎস, তোমার মাথায় একটু বেশী পরিমাণে শীতল বাতাস লাগাই।'

সহসা উদ্দাম হয়ে ওঠে মোটরবাইকের গতি আর গর্জন, হাঁ হাঁ করে ওঠে রাহুল, 'এই এই কি হচ্ছে ? পিকলু বেশী শয়তানী করিসনে বলছি। থামা থামা।'

তা' রাহুলের কথায় না হোক, থামাতে হয় পিকলুকে। থামাতে হয় যখন প্রায় লেকের কাছে এসে পড়েছে।

একটা কোনায় দাঁড়িয়ে ঝিলমিল।

হাতে ঝালমুড়ির ঠোঙা।

'ঝিল, এখানে এরকম-একা ?'

ঝপাস করে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে শশব্যস্তে প্রশ্ন করে পিকলু বিশ্বাস।

ততক্ষণে রাহুল রায়ও ত্রস্তে ব্যস্তে এগিয়ে এসেছে, 'মিল এখানে এ রকম একা ?'

'একা আর কই ? একা থাকতে পেলাম আর কবে ? চারজনে তো !'

'চারজনে ? কই কোথায় আর সব ?'

ঝিলমিল গম্ভীরভাবে বলে, 'এই তো তুমি, রাহু. আমি আর ওই—' শেষ নামটা আর করে না ঝিলমিল, শুধু ইশারায় দেখিয়ে দেয় অদূরবর্তী জিঘাংসুকে।

'উঃ এখানেও ওই নেকড়েটা ?'

ঝপাস করে বাইকে উঠে পড়ে স্টার্ট দেয় পিকলু। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দেয় ঝিলমিলও। হাসির স্টার্ট।

উঃ, ভাগ্যিস রাহুল সারমেয়ভীতিকে অসার করতে পেরেছিল !

গদগদ কণ্ঠে মিষ্টি ডাক দেয় রাহুল, 'মিল !'

ঝিলমিল হাতের ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'ঝালমুড়ি খাবে ?'

'একদিকে রাহু, একদিকে কেতু, আর একদিকে ওই নেকড়েটা !'

আড্ডায় এসে ধপাস করে বসে পড়ে পিকলু ।

আড্ডাধারী যে ক'জন পিকলুর চকচকে ঝকঝকে ড্রয়িং রুমে এলিয়ে ছড়িয়ে বসে পিকলুর পয়সার সিগারেট ধ্বংসাচ্ছিল, তারা উঠে বসে বলে, 'রাহু তো বুঝলাম । কেতু আবার কেরে ?'

'ওই যে মিসেস কেতকী সামন্ত । তাঁর আদরের কুকুরকে একবার বাঁধলে তিনি কুকুরের চাইতেও ক্ষেপে যান ।'

'এই পিকলু, শাশুড়ীর নাম ধরছিস ?'

'ধুত্তোর শাশুড়ী !' ঘামে ভেজা চিত্তির বিচিত্তির হাওয়াই সার্টটা গা থেকে খুলে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে শুধু গেঞ্জি গায়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে পিক্‌লু ।

'এই, কি হল ?'

'চিন্তা করছি ।'

'ওই রকম কলের লাট্টুর মতন ঘুরপাক খেয়ে চিন্তা করছিস ?'

'বনবন করে চিন্তা করছি । আচ্ছা বল দিকি নাড়ু, সেকালের লোকেরা দু' দশটা বিয়ে করতো কোথা থেকে ? একটা বিয়ের কনে জোগাড় করতেই তো—'

নাড়ু হঠাৎ নিজের দুখানা হাত নাড়ুপাকানোর ভঙ্গীতে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'বাতাস ঘুরে গেছে দাদা, বাংলা দেশের বাতাস ঘুরে গেছে । কনে আর সস্তা নেই, সব এক একখানি ডাঁটুস ! তোমার তো তবু ঘরে টাকার বাণ্ডিল । তাতেই নাকে নল ছেঁচে যাচ্ছে, আমাদের তো হুঃ !'

'তুই থাম নাড়ু—' বলাই খাবরি দেয়, 'তুই আমি কি আর মিস সামন্তর মতন কনে খুঁজবো ? কথায় বলে রাজার জন্যে রাণী, কানার জন্যে কানি ।'

'দেখ বলা,' ঘুরপাক থামিয়ে পিকলু বলে, 'আমার পার্সোনাল সমস্যা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করতে বসিসনে । একটা উপায় বাৎলা ।'

তা হলে ?

'আমি তো বাবা উপায় বাৎলেছিলাম। কুকুরটাকে কোনও প্রকারে ভবার্ণব পার করে দিলেই—'

'এই বলা! ছোটলোকের মতন কথা বলিসনে।' গেঞ্জির গলা তুলে তুলে হাওয়া খেতে থাকে পিকলু।

নাড়ু চোখ কুঁচকে বলে, 'মেয়েটাকে নিয়ে পালালেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'গুলি করবো তোকে নাড়ু।'

'গুলি করবি? আমাকে? একটা কুকুরকে গুলি করতে তোর বাধলো পিকলু, আর আস্ত একটা মানুষকে গুলি করবি?' ডুকরে কেঁদে ওঠে নাড়ু।

'এই ওটাকে ধরে বার করে একখানা ডবল ডেকারের তলায় ফেলে দিয়ে আয় তো।' বলে পিকলু পাখার রেগুলেটরটা সপাটে ঠেলে দিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা কাশ্মীরী কাজের টিপয় টেনে এনে ঠিক পাখার নীচেটায় বসিয়ে টপ করে তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে থাকে।

• বাগান না বাগানের দরুণ। এখন আর কিছু নেই। থাকার মধ্যে খানিকটা জমি আর দু'চারটে শুকনো ডাল। এটাকে আবার চাঙ্গা করা যায় কিনা তাই তদারকে এসেছিলেন গজানন, হঠাৎ মনে হল চোখের পাশ দিয়ে সট করে কে সরে গেল।

বেঁটে ঘাড় আর কামানো রগ নিয়ে হাঁসফাঁসিয়ে ওঠেন—'কে? কে গেল ওখানে?'

এ প্রশ্নের উত্তর আসে না।

গজানন আর একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, 'কি হল? কে ও ওখানে?'

অগত্যাই ওখান থেকে আসামীকে বেরিয়ে আসতে হয়। 'আ—আজ্ঞে আমি।'

'এটা কি হল?' তুমি এখানে মানে? বিশ্বাস বাড়ির ছেলে না তুমি?'

'আ—আজ্ঞে।' মাথা চুলকোতে থাকে পিকলু।

গজানন বারকতক তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন,' 'এখানে কি

হচ্ছিল ?'

অবাধ্য দৃষ্টি সেই জানলার দিকেই চলে যায় যে দিকে না তাকানোর প্রতিজ্ঞা। তবু লহমায় সামলে নেয় নিজেকে পিকলু, 'ওখানে আজ্ঞে একটু হাওয়া খাচ্ছিলাম। কলকাতা শহরে স্যর ফুল বাগানের হাওয়া তো দুর্লভ।'

'হুঁ। তা' এই দুর্লভ বস্তুটি সংগ্রহ করতে ঢুকলে কোথা দিয়ে? বাউণ্ডারী ওয়ালেব দরজা তো দেখছি চাবি লাগানো।'

'আজ্ঞে ওইটুকু উঁচু বাউণ্ডারী, ও আর কী এমন? হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পিকলুর মুখ, 'ওর চাইতে অনেক বেশী হাই জাম্প দিতে পারি স্যর।'

'হুঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা' কতদিন এ রকম হাওয়া খাওয়া চলছে ?'

'আজ্ঞে স্যর মাসীমা যতদিন থেকে কুকুরকে বাঁধলে ক্ষেপে উঠছেন।'

'মাসীমা? মাসীমা কে?'

'আজ্ঞে স্যর, ইয়ে মিসেস সামন্ত।'

'মিসেস সামন্ত। বল কিহে? তার মানে তুমি হচ্ছ গিয়ে তাঁর বোনেব ছেলে?'

'আজ্ঞে স্যর বোনেব মতনের ছেলে।'

বোনের মতনের!

'তুমি যে আমায় ধাঁধাঁয ফেলছ হে! আবও একটি যেন বোনের মতনের ছেলে দেখেছিলাম তোমাদের মিসেস সামন্তব ধারে কাছে। সে তো তুমি নয়?'

'আজ্ঞে না, সে রাহু! যে জিঘুকে টফি খাওয়ায়, মিস সামন্ত যাকে দু'চক্ষে—'

'দাঁড়াও, আস্তে, অত ছুটো না। আমাকে ভাল করে বুঝতে দাও। তুমি হাই জাম্প করে হাওয়া খেতে আসছো, শনি না রাহু কে যেন জিঘুকে টফি খাওয়াচ্ছে, ওরই মধ্যে আবার বেবি একজনকে দু চক্ষে দেখতে পারছে না। এসব বুঝতে হলে তো তোমাদের কিছু জেরা করতে হয়।'

'আজ্ঞে স্যর জেরা করবার আর কি আছে?' ফিক করে একটু হাসে পিকলু, 'আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, সবই তো বুঝছেন।'

'না সবটা ঠিক বুঝছি না। মেয়ে তো আমার মোটে একটা, অথচ—'

'আজ্ঞে স্যর; স্বয়ম্বর সভাতেও তো মেয়ে কুল্লে একটাই থাকে।'

তা হলে ?

'হাঁ, বোলচাল মন্দ নয় দেখছি। আচ্ছা এখন যাও।'

'বিরূপাক্ষ!'

গজানন হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ে—ডাক দেন, 'বিরূপাক্ষ!'

বিরূপাক্ষ পাইপে তামাক ঠুসতে ঠুসতে নিশ্চল দাঁতেই বলেন, 'বলুন।'

'বলছি। বলছি তোমাদের মিসেস সামন্তর কথাটাই এবার রাখতে হবে দেখছি। লাগিয়ে দাও, একটা বিয়েই লাগিয়ে দাও।'

'বিয়ে কার?'

'কার! কার মানে? আমি আবার কার বিয়ের কথা বলবো? বেবির বিয়েটার কথাই হচ্ছে। ও সামনের তারিখেই—'

'তা' পাত্র টাত্র দেখা হোক।'

'পাবে সে তো হয়েই আছে।'

'হয়েই আছে?'

'হ্যা! একটা নয় দুটো। শুধু যেটা বেশী ধড়িবাজ হবে।'

'কোথায়? কোন দেশে?'

'এই বাংলা দেশেই।'

'মানে কোন জেলায়? ইয়ে কোন পাড়ায়?'

'এই পাড়ায় হে, এই পাড়ায়। ওই যে যে ছেলেটা জিঘুকে টফি খাওয়ায়, আর যে ছেলেটা শুকনো মাঠের বাউণ্ডারী ওয়াল ডিঙিয়ে ফুল বাগানের হাওয়া খেতে আসে।'

'হুঁ বুঝলুম! কিন্তু মিসেস সামন্ত কি—'

'আহা মিসেস সামন্ত আর কবে মিষ্টার সামন্তর প্রস্তাবে রাজী হন? সেই রাজীর ভারটাই তো দেওয়া হচ্ছে তোমাকে।'

'উনি বলেছেন?' মিসেস সামন্ত অবজ্ঞা ভরে মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'তিনি না হলে আর এমন কথা কে বলবে? ওই একটা অকাল কুষ্মাণ্ড গবেট—'

'আহা হা উত্তেজিত হবেন না মিসেস, উত্তেজিত হবেন না, ওকে পছন্দ না হয় আরও একটা পাত্তরও তো হাতে রয়েছে? যে ছোকরার সব আছে

শুধু টাকা পয়সা নেই—'

'সাধে কি আর বলি মিষ্টার বাহুবল, আপনিও ক্রমশঃ মিষ্টার সামন্তর মতন বোকা হয়ে যাচ্ছেন। বলি যার পয়সা নেই, তার তো কিছুই নেই।'

'আহা ও ঘাটতিটা না হয় আপনারাই চাপিয়ে দিয়ে পূরণ করে দিন।'

'আমরা চাপিয়ে দিয়ে?' মিসেস কেতকী সামন্ত আবার ভুলে যান তিনি হার্টের রোগী, উঠে বসে বলেন, 'আপনার কথার মানে কি মিষ্টার বাহুবল?'

'মানে অতি প্রাঞ্জল মিসেস। ভবিষ্যতে আপনাদের সমস্ত টাকাকড়ির মালিক তো রেবিই? আগেই না হয় দিয়ে দিন সেটা। বাস মিলে গেল অঙ্ক।

'মিষ্টার বাহুবল। আর নির্বোধের মত কথা বলবেন না আপনি, সহ্য করতে পারছি না। এ একেবারে মিষ্টার সামন্তর মত কথা হচ্ছে। টাকা চাপিয়ে অঙ্ক মিলিয়ে দিলেই হল? উঃ মিষ্টার বাহুবল, আপনাদের বুদ্ধিহীনতা দেখে আমার হার্টফেল করতে ইচ্ছে করছে। আর এটা একবারও ভাবছেন না, যার নিজেরই অনেক টাকা আছে তাকে আরো চাপালে কি—তো হবে।'

তা হলে!

তাইতো। তা হলে।

বিরূপাক্ষ আকণ্ঠ জমানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আস্তে আস্তে ছাড়তে ছাড়তে বলেন 'তা হলে?'

গজানন বেঁটে ঘাড় হেঁট করে বুকে চিবুক ঠেকিয়ে বলেন, 'তা হলে?'

পল্লবিনী কাঁদো কাঁদো গলায় বলে 'তা হলে?'

রাহুল রায় আলুভাতের মত লেপাপোছা মুখ আরও লেপে পুছে বলে 'তা হলে?'

ঝিলমিল বিছানায় এলিয়ে বলে 'তা হলে?'

পিকলু বিশ্বাস সার্টের কলার নাচিয়ে বসে ওঠে 'তা হলে 'টস।'

'টস!'

'হ্যাঁ, কেন নয়? জীবনটাই তো খেলার বাজী।'

'যদি হেরে যাও?'

'যদি হেরে যাই, কাহুকে আর রাহুগ্রস্ত তোমাকে খুব দামী গোছের একটা

তা হলে ?

উপহার দিয়ে বাইকটা নিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে পড়বো।'

'আর যদি জেতো ?'

'বাইকের সঙ্গে তোমাকে বেঁধে নিয়ে লোককে দেখাতে দেখাতে যাবো, দেখ রাহু কেতু, দু'জনের কবল থেকে মুক্ত করে বিজয়মাল্য লাভ করেছি।'

তবে তাই !

টাকা আনো একটা। হেড টেল হোক !

কিন্তু কোথায় ?

কোথায় আর, মিসেস কেতকী সামন্তের সামনে। তার চোখের আড়ালে তো হতেই পারে না। কে বলতে পারে তার পতি সেই অবহেলার শক লেগে হঠাৎ কোন একদিন তিনি হার্টফেল করে ফেলেন কিনা।

বেশ চলো তবে সবাই দোতলায়, বাগানের উপরের সেই ঘরে।

'দিও বিল।' নিকলু বিশ্বাসের হাওয়াই সার্টের কলার লটপট করে, কাতর করুণ কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ স্বর উত্থিত হয়, 'আমি কি করে যাব ?'

হাঁ—হাঁ—করে ওঠেন গজানন, 'কেন, কি হল ? পায়ে ব্যথা ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে হার্টের অসুখ ?'

'আজ্ঞে না-না।'

'তা'হলে বাধাটা কি ?'

'বাধা—স্বর জিঘাংসু ! ওকে বাঁধুন।'

'আচ্ছা বাঁধো।'

খবর পেয়ে ছুটে আসেন মিসেস শশীমুখী বাহুবলীন্দ্র।

গজাননের বোন।

'দাদা এটা কি রকম বিয়ে ? 'টস' করে মেয়ের বিয়ে তো এতখানি বয়সে কখনো দেখিনি।'

গজানন বুকে চিবুক ঠেকিয়ে বলেন, 'আরও বেঁচে থাকলে আরও কত দেখবি শশী।'

অতএব শশীমুখীও দেখতে বসে যান।

ভালমনেই বসেন। কারণ ইতিমধ্যেই শুনে নিয়েছেন, পাত্র নির্বাচন পদ্ধতিটা যেভাবেই হোক, বাকী পদ্ধতিটা যথারীতিই হবে।

সেই মার্কেটিঙ্, সেই সমারোহ, সেই খাটবিছানা আলনা-দোলনা, সেই বাসনপত্র, ঘড়ি আংটি, সেই লুচি পোলাও দই মিষ্টি।

বিরূপাক্ষ বলেছেন, 'ওটা ছাড়তে দেরী লাগবে শশী, ও প্রথাটা এখনও বহাল তবিয়তে থাকবে, বরং বাড়বে। বাড়ছেও।'

কিন্তু টাকাটা উল্টোবে কে?

কে বলতে পারে সে উল্টোবার কালে কারচুপি খেলবে কি না। কে বলতে পারে কার কোথায় স্বার্থ জড়িত আছে।

ঝিলমিল পিসেমশাইয়ের পিছনে বসে বলে, 'একমাত্র জিঘুই নিঃস্বার্থ পিসেমশাই, জিঘুই খাঁটি। জিঘুই ফেলুক।'

'কিন্তু ও যে বাঁধা।'

'চেন্ সুদ্ধুই ধরে আনা হোক বেচারাকে। আহা বেচারা জিঘু দুষ্টু আর মিষ্টি।'

অতঃপর?

দুলে উঠলো জিঘুর লম্বা নাক, ঝলসে উঠল টাকা, আর সঙ্গে সঙ্গে 'হুরবে' গোছের একটি শব্দের সঙ্গে নেচে উঠল চিত্তির-বিচিত্তির নাইলন সার্টের কলারের একটা কোণ। আর-তার পর? উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী বিস্ফারিত নেত্রে আর রোমাঞ্চ কলেবরে দেখল পিকলু বিশ্বাসের গালে জিঘাংসুর গাল।

ঝিলমিল আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'ওকে খুলি তা হ'লে?'

পিকলু বলে, 'ওর নামটা বদলে দেওয়া হোক তাহ'লে?'

'তা হলে?'

গেটের বাইরে এসে বাহুল রায় পল্লবিনীর দিকে করুণ সকাতর দৃষ্টি মেলে বললো, 'তা হলে?'

পল্লবিনী দীর্ঘ আঁখি পল্লব আনত করে বললো, 'তা হলে তাই।'

॥ পার্থক্য

নদীর একটা নিয়ম আছে, সে যদি কোনো ভৌগোলিক কারণে আপন সীমা রেখা সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয় তো, অদূরে আর কোথাও নতুন সীমা বিস্তার করে।

সমাজের নিয়মটা অনেকটা নদীর মত। দৃশ্যতঃ তার অনেক ভাঙাগড়া চলে, অনেক পরিবর্তন সাধন হয়, মনে হয় তার তীক্ষ্ণধার সমস্যাগুলো বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু অভিজ্ঞ চক্ষুর সামনে ধরা পড়তে দেরী হয় না— নিশ্চিহ্ন হয় নি। সে সমস্যার তীক্ষ্ণতা শুধু অন্য এক চেহারা নিয়ে আর এক ধারে নিজের অধিকার বিস্তার করছে।

বালবিধবার সমস্যা ছিল বাঙালীর সংসারে এক মর্মান্তিক সমস্যা, প্রায় সকল সংসারেই এরকম একটি সমস্যার ঘায়ে কালিল হয়ে থাকতো। এ যুগে 'বালবিধবা' শব্দটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যাটা কি নিশ্চিহ্ন হয়েছে? আজকের বাঙালীর ঘরে ঘরে সে সমস্যা বয়স্থা কুমারীর, হয় তা বা চিরকুমারীর মূর্ত্তি ধরে বিরাজ করছে।

অবস্থার খুব বেশী পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য যা, সে বাইরে।

আহারে আচরণে প্রসাধনে।

কিন্তু তার পরে? তার ভিতরে? অবস্থা প্রায় একই দাঁড়াতে বসেছে। পিতৃগৃহের বা ভ্রাতৃগৃহের সমস্ত দায় দায়িত্বের বোঝা ছিল বিধবা মেয়ের, বিধবা বোনের, আজ সে দায় দায়িত্ব এসে পড়ছে অবিবাহিতাদের উপর। আর পড়ছে নিতান্ত দ্রুত বেগে।

কেমন করে যেন মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর, মা বাপ ছেলের থেকে মেয়েদের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়তে চাইছে। আর এই চাওয়া থেকেই আসছে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে শিথিলতা।

মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে 'অবশ্য কর্তব্য' বলে আর ধরেনা কেউ। ঔদাসীন্য আর ফাঁকা চেষ্টার ফাঁকির ফাঁক দিয়ে দিনগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, মেয়েদের বয়েস গুলো গড়িয়ে যায়, জমাট হয়ে যায়।

আর সেই এলিয়ে দেওয়া মা বাবার মনকে চোখ ঠেরে বলতে থাকেন 'যতদিন না বিয়ে হচ্ছে করুক গে কিছু, বসে কেন থাকবে।' শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই 'কিছু'টাই তাদের গলায় চেপে বসছে চিরশৃঙ্খল হয়ে।

শৃঙ্খল বৈ কি। অর্থনৈতিক মুক্তিই সমাজনৈতিক শৃঙ্খল। টাকা মানেই কর্তব্যের দায়।

পার্কের বেঞ্চে একা একাই বসেছিল কৃষ্ণা, আর এই কথাগুলো ভাবছিল। সে কালে তবু বিধবা মেয়েদের দাপট ছিল, তেজ ছিল। তা'রা ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছে বলে সংসারের আর পাঁচজনে তার হাতের মারটা সয়ে যেত।

কুমারী কন্যার সে দাপটটাও করবার জো নেই। সে তো সহসা নিজের দুর্ভাগ্যের পসরা নিয়ে এসে নতুন করে ভর্তি হলনা সংসারে, নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। সে যে বরাবরের। সে যে নিত্যকালের। তা'র দুর্ভাগ্য যে তিলে তিলে সৃষ্টি হচ্ছে সকলের অলক্ষ্যে, তার নিজেরও অগোচরে, সেই ভয়ঙ্কর সত্যটা চট করে ধরা পড়ে না।

গোড়ার দিকে নিজে সে বীর দর্পে বলে, 'আমি বেশ আছি, খাসা আছি খুব ভাল আছি।'

অভিভাবকবর্গ ততদিনে তার 'ভাল থাকা'র ভাল ফলটা পেতে সুরু করেছেন, তাই তাঁরাও সমস্বরে বলতে থাকেন, 'সত্যি ই তো বেশ আছে, দিব্যি আছে, কী দরকার?'

যেন 'দরকার' শুধু ভাত কাপড়ের।

·এই আধা অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটায় বসে নিজের জীবনটা সহসা ভারী অর্থহীন মনে হল কৃষ্ণার। মনে হল বোদা বিস্বাদ।

পার্থক্য

প্রথম যখন সে এই আড়াই শো টাকা মাইনের চাকরীটা পেয়েছিল চারিদিক থেকে সকলে এত বাহবা দিয়েছিল যে, দিশেহারা হয়ে পড়েছিল কৃষ্ণা। পরম পুলকে ভেবেছিল 'আর কা'কে দরকার!'

দরকার যদি কিছু থাকে তো এই চাকরীটার ক্রমোন্নতির জন্যে তদ্বিরের। তা' উন্নতি তো কম হয় নি। আশাতীতই হয়েছে।

কিন্তু এতদিন পরে আজ নিজের জীবনের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসেছে কৃষ্ণা, 'কী হ'ল! কী লাভ হ'ল!'

টাকা যা আসে কোথা দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, নিজের এই খুঁটিহীন আশ্রয়হীন জীবনের ভবিষ্যতের জন্যে কিছুই সঞ্চয় হয় না, অথচ সব দিয়েও সত্যকার মন পাওয়া যায় না কারুর। খুসি করতে পারে না কাউকে।

কৃষ্ণার মা যে মন নিয়ে কৃষ্ণার প্রথম উপার্জনের টাকায় কিনে দেওয়া শাড়াখানি পরে আহ্লাদে আর আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন, সে মন আর নেই তাঁর। এখন প্রতিপদে ত্রুটির ফিরিস্তি গাইতে থাকেন তিনি কৃষ্ণার কান লক্ষ্য করে।

কিন্তু তাদেরই বা দোষ কি! তাদের যে আজ পাওনার দরজা মাত্র ওই একটাই।

কৃষ্ণার ওপরই সমগ্র সংসারের ভার দিতে হয়েছে তাকে। কারণ উপার্জনশীল বড়ছেলে তার বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

গেছে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে একেবারে মুক্ত পুরুষের মন নিয়ে। মায়ের হাতখরচ বলে দশটা টাকা দেওয়াও তার কুলিয়ে ওঠেনা। অথচ বহির্দৃষ্টে কোন রকম ঝগড়া ঝাঁটি সে করেনি। শুধু বলেছিল 'এখানে আমার আর পোষাচ্ছে না।'

যেন পৃথিবীতে 'পোষানো', আর 'না পোষানো' এই দুটি মাত্রই শব্দ আছে।

ঝগড়া হয় নি, তাই মাঝে মাঝে নিজের নতুনকেনা গাড়ীতে চড়ে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেড়াতে আসে দীপক। খানিকক্ষণ বসে, গল্প করে, হৈ হৈ করে, আবার চলে যায় 'দমাস' শব্দে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দণ্ডায়মানা জননী

ভগ্নীদের নাকের সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে।

গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করার সময় বলদৃপ্ত এই শব্দটি করার ভারী সখ কৃষ্ণার দাদা দীপকের।

প্রথম যেদিন দীপক বাড়ীতে 'বেড়াতে' এসেছিল, সেদিন বাপ বিজয়লাল ছেলের সঙ্গে দেখা করেন নি, আর মা ইরাবতী ভাল করে কথা বলেন নি। কিন্তু চালাক ছেলে দীপক তা'তে দমলনা। অভিমানাহতও হ'ল না।

নিয়মিতই রবিবারে রবিবারে আসতে লাগল।

বলা বাহুল্য তার এই চালটা ব্যর্থ হ'ল না। সে এখন এ বাড়ীতে নিত্য রবিবারের সন্ধ্যার পরম আদরণীয় অতিথি। মা প্রতীক্ষার প্রহর গোনেন সকাল থেকে, আর বাবা তাদের যথোপযুক্ত সমাদর হচ্ছে কিনা দেখতে তৎপর হয়ে ওঠেন। হয়তো নিজেই ছোটেন তাদের জন্যে মিষ্টি আনতে।

দীপক গাড়ী কেনার পর থেকে, সমীহটা বোধকরি অজ্ঞাতসারেই আরো বেড়ে গেছে। আগে মা যদি বা বাড়ীর তৈরি কোন খাবার ছেলে বৌ আর নাতির জন্য রাখতেন, আজ কাল সে কথা ভাবতেই পারেন না। সেরা দোকানের সেরা খাবার আনিয়ে রাখেন।

চা-টা করতে একটু দেরী হলে ছোট মেয়ে মীরা খিঁচুনি খায় অকর্মা বলে। নিত্য ব্যবহারের মোটা মোটা কাপ প্লেটে ওদের চা দিলে আড়ালে এসে আপ্‌সাতে থাকেন ইরাবতী।

ওরা চলে গেলে রাগের জের মেটান।

রবিবারের সন্ধ্যাটা দীপকের পূজায় উৎসর্গীকৃত।

অথচ আবার সেটাতেই বেশী আশ্চয হয় কৃষ্ণা, সন্ধ্যার পরবর্তী অংশটা ইরাবতীর কাটে ওদের নিন্দেয়! এ এক অদ্ভুত রহস্য।

ছেলে যে কত বেহিসেবী আর রাজেখরুচে, বৌ যে কত ফ্যাসানি আর কত বাবু এবং নাতিটি কত বেয়াড়া আর বদ আবদেরে, সে কথা বলতে বলতে ফুরোয় না ইরাবতীর।

এই ভাবেই কাটছে দিন।

আর কে জানে কোন হৃদয় রহস্যে ইরাবতী বড় মেয়ের উপর বিরূপ হয়ে

উঠছেন ক্রমশঃ। হয়তো মেয়ের ওপর যে তাঁকে নিরুপায় হ'য়ে নির্ভর করতে হ'চ্ছে সেটাই সূক্ষ্ম অপমান বোধে পীড়িত করছে তাঁকে।

আজ রবিবার।

পার্কে বসে বসে ভাবছে কৃষ্ণা এতক্ষণে বোধকরি 'দীপকপর্ব' মিটে গেছে। এবার যাওযাই যাক। কেন কে জানে, আজ আর সেই পুনরাবৃত্তি দেখতে ইচ্ছে কবছিল না।

কিসের জন্যে যেন বেবিয়েছিল একবার, তারপর এসে বসে পড়েছে পার্কে। কিসের যে জন্যে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

বাড়ী ফিরতে গিয়ে চোখে পড়ল গায়েব কাছ দিয়ে হুস্ করে দীপকেব গাডীটা বেবিযে গেল। ছেলেটা বোধকরি একবার 'পিসি' বলে চেঁচিযেও উঠল, কিন্তু গাড়ীব গতি মন্দীভূত হ'ল না।

বাড়ী ঢুকতেই দবজাব কাছ থেকে ছোট ভাই দীপ্তেন্দু চেঁচিয়ে উঠল 'দিদি এতক্ষণে এলে তুমি! দাদা চলে গেল—'

'চলে গেলতো কি বাজ্য রসাতলে গেল।' বলে কৃষ্ণা ভিতরে এল। মীরা চুপি চুপি বলল. 'কত দেবী করলি দিদি, মা রাগ করছিলেন।'

'কেন বাগের কি আছে?'

ভুরু কুঁচকে বলল কৃষ্ণা।

'ওই যে দাদা বারবার তোর নাম করছিল।'

'তা' দীপকবাবুব হঠাৎ এমন অসীম অনুগ্রহের হেতু?'

'কিছু না এমনি। তুই থাকলে তবু দুটো গল্প করে। বাবা মা শুধু তোয়াজ করতেই পারেন, গল্প করতে পারেন কই?'

'না পারুন!' কৃষ্ণা তাচ্ছিল্যভরে বলে 'বাড়ীসুদ্ধু সবাই গিয়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতে হবে, তার কি মানে আছে?'

কখন যে ইরাবতী পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন. টের পায় নি, দু'জনেব একজনও। টের পেল ইরাবতীর কণ্ঠস্বরে।

না! ওদের আলোচ্য প্রসঙ্গের দিক দিয়েও যান না ইবাবতী, শুধু গম্ভীব কণ্ঠে বলেন. 'ওঁর ওষুধটা কোথায় রাখলে?'

ওষুধ!

চমকে ওঠে কৃষ্ণা।

ওষুধ আনতেই গিয়েছিল না কৃষ্ণা ? ওঃ ! একটুখানি বসে যাই ভেবে পার্কের বেঞ্চে বসে, কি যে সাত পাঁচ চিন্তায় সব গোলমাল হয়ে গেল !

'পাওয়া যায় নি বুঝি !'

খুব শান্ত কণ্ঠে বললেন ইরাবতী।

'যায় নি' বলতে পারলেই আপদ চুকে যেত কিন্তু মিথ্যা কথাটা মুখে বাধল। বলল 'না, ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেছ ! তা বেশ !' বলে চলে যেতে গিয়ে ইরাবতী ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অবশ্য আমার জিগ্যেস করবার অধিকার কিছু নেই, বয়েস হয়েছে তোমার, কৃতী হয়েছ, ভাত দিচ্ছ কাপড় দিচ্ছ তবু না বলেও পারছি না, মেয়েমানুষ এত রাত অবধি বাইরে বাইরে না ঘুরলেই ভাল হয়।'

হঠাৎ কৃষ্ণার মুখে একটা কঠিন কথা এসে পড়ে, বলে, 'ভাল তো সংসারে অনেক কিছুতেই হয় মা, কিন্তু হয় কই ?'

'তা জানি !' ইরাবতী সুগভীর একটি নিশ্বাস ফেলেন, 'কথা কইলেই যে ছোবল খেতে হবে, তা' আর জানতে বাকী নেই আমার। সেই ভয়েই কিছু বলি না। নইলে রাত দশটা অবধি বাইরে—'

কৃষ্ণা আর কিছু বলে না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। ঢুকে যায় নিজের ঘরে, যে ঘরটা আগে দীপকের ছিল।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখে তার ঘরে বাবা। টেবিলের কাগজ পত্র ওল্টাচ্ছেন।

'কি বাবা।'

বিজয়লাল চমকে উঠে থতমত খান। তারপর সামলে নিতে গিয়েও সামলাতে না পেরে বলে ফেলেন, 'কি ফেরা হ'ল ? তবু ভাল।'

কৃষ্ণা এ আক্রমণে বিস্ময়ে কঠিন কণ্ঠে বলে 'কেন, আপনারা কি ধরে নিয়েছিলেন আমি আর ফিরব না ?'

বিজয়লাল ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলেন, 'ধরে নিতেই বা আশ্চয্যি কি ! ছাড়লেই হ'ল বাড়ী। আজকালকার মেয়েদের তো এ সব গুণে ঘাট নেই। কিছুদিন থেকে তোমার মন মেজাজ যা দেখছি। ভাবলাম হয় তো টেবিলে চিঠি লিখে রেখে পথ দেখেছ !'

কৃষ্ণা এক মিনিট চুপ করে থেকে বলে, 'এদিক থেকে কোন দিন ভেবে দেখিনি বাবা। আপনি যে মনে পড়িয়ে দিলেন, সেটা আমার পক্ষে

ভালই হ'ল।'

'হুঁ।' বলে বিজয়লাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সকলে খেতে বসেছে, হঠাৎ আবার কথাটা তুললেন ইরাবতী। হঠাৎ কিন্তু পেঁচিয়ে। স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'বুঝে সুঝে খেও, তোমার হজমের ওষুধটা তো আবার নেই।'

'নেই না কি!' বিজয়লাল ক্ষীরের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলেন, 'আসে নি?'

'না, এল আর কই।' ইরাবতী ভারীমুখে বলেন, 'কৃষ্ণার সময় হয় নি।'

'সময় হয় নি! বাঃ চমৎকার!'

ওষুধ খেতে বিজয়লালের বরাবরের আপত্তি। আজ নেই বলে হাড়ে বাতাস লাগল তার, কিন্তু গৃহিণীর কথার সুর বুঝে মন্তব্য করলেন আক্ষেপের।

ক্লান্তিকর বোদা বন্দ জীবনের ভার বহে ক্লান্ত কৃষ্ণা আজ বুঝি মেজাজ ঠিক রাখতে পাচ্ছে না। হয়তো সারা সন্ধ্যার এলোমেলো চিন্তার কুফল। তাই আজ প্রত্যেক কথায় চটে উঠছে। তাই বিজয়লালের ধিক্কারের উত্তরে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'ডাক্তারবাড়ী যাওয়া, ওষুধ আনা, এগুলো দাদাকে বললেই পারো, ঠিক সময়ে হয়ে ওঠে তা' হলে।'

দাদাকে।

ইরাবতী ভুরু কুঁচকে বলেন 'দীপককে! দীপককে আমি বলব তুই অন্য আর একটা বাড়ী থেকে এসে এসে আমার কাজ করে দিয়ে যা!'

কৃষ্ণা বলে 'ক্ষতি কি? দাদার তো অসুবিধে কিছু নেই, গাড়ী রয়েছে।'

'গাড়ী রয়েছে!' ইরাবতী কোন যুক্তি খুঁজে পান না বলেই ক্রুদ্ধ গলায় বলে ওঠেন, 'গাড়ী রয়েছে বলে চোর দায়ে ধরা পড়েছে। তাই তাকে আমি শাসন করবো 'তোর বাপের ওষুধ কিনে দিয়ে যা, একশিশি ওষুধ এনে দেবার লোক এখানে নেই।'

কত ওষুধ পার করলেন বিজয়লাল, কত ওষুধ খেলেন, কত ওষুধ ফেললেন, সে কথা এখন আর এই রাগের সময় মনে পড়ল না ইরাবতীর।

না, কৃষ্ণাও মনে পড়িয়ে দেয় না।

অত ছোট হতে পারবে না সে।

তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে লঘু করে দিযে কৃষ্ণা বলে, 'তা তাতে আর দোষ কি? তোমাব নিজেব ছেলেই তো, করলোই বা একটু কাজ। ক্ষযে যে‌ে আর যাবে না!'

বিজয়লাল গম্ভীরভাবে বলেন, 'নিজের দায অন্যের মাথায চাপিয়ে দিতে পারলে কেউ ছাড়ে না। দাদা কি কবে, কি না কবে, তা' দেখবার দরকাব তো নেই। তোমার যে একতিল সময হয না বুড়ো বাপের ওষুধটুকু আনবাব এইটাই আশ্চর্য্যের কথা! থাক্ আমার দবকাব নেই।'

কৃষ্ণা কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে সহসা হেসে উঠে বলে, 'তা' এ সংসাবে সব কিছুই আমার করবার কথা এটাই বা হঠাৎ স্থিবীকৃত হল কি কবে, সেটাই তো বুঝতে পারি না বাবা। দাদা সমস্ত দায় এড়িযে দিব্যি সবে রইল, একটা পয়সা দেওয়া দূরে থাকুক একটা কাজ পযন্ত কববে না, এটা তো আপনাবা দিব্যি মেনে নিয়েছেন।'

ইরাবতী গম্ভীর ভাবে বলেন, 'মেনে আমাদের সবই নিতে হবে। এই তুমি এখন করছ, যদি না করো, তাও মেনে নিতে হবে। কৃতী ছেলেমেয়ে থাকতে যদি পরের কাছে হাত পাতা ভাগ্য হয তাই হবে। তাও মেনে নিতে হবে।'

কৃষ্ণা সহসা উঠে চলে যায।

বড খারাপ লাগে তার মাব এই রকম ঘুরিয়ে কথা।

'দেখলে! দেখলে অহঙ্কার!' ইরাবতী কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, 'সাধে কি আর বলে হাতী হাবরে পড়লে ব্যাঙে লাথি মাবে।'

'হুঁ।' বিজয়লাল বলেন, 'পাখা গজিযেছে আর কি! কিছুদিন থেকে দেখছি যে মেজাজ। কি জানি তলে তলে অন্য কিছু মতলব ভাঁজছেন কিনা।

'সেই ভয়েই তো মরছি।'

'ইরাবতী বলেন, সেই জন্যেই তো এত উঠে পড়ে লেগে মীরার—'

কৃষ্ণা ঘবে এসে বসে অন্ধকাবে। দীপ্তেন্দুটা তাব কাছে শোয। আগেই এসে ঘুমোচ্ছে।

অন্যদিন একটু বই টই পড়ে কৃষ্ণা, আজ আব ইচ্ছে হল না! ভাবতে লাগল মানুষ কেন এমন হয? কেন তাব ভিতবটা এত উল্টোপাল্টা জিনিস দিযে তৈবী।

দীপক যখন বৌকে নিয়ে অন্যত্র সংসাব কবতে গেল, ইবাবতীব ভাব দেখে মনে হযেছিল জীবনে বুঝি আব ওদেব মুখ দেখবেন না। অথচ—

দীপ্তেন্দু একটু নডল চডল।

কৃষ্ণা বলল 'ঘুমোসনি?'

'এই যে ঘুম ভেঙে গেল।'

কৃষ্ণা বিছানায বসে পড়ে বলে, 'জল খাবি?'

'না।'

'তবে ঘুমো শাও হ য।'

কিন্তু দীপ্তেন্দু এ উপদেশে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। গম্ভীর ভাবে বলে, 'আচ্ছা দিদি, আগে তো আমবা বেশ শুতাম ওই ছোট ঘরটায়।'

কৃষ্ণা চমকে বলে 'শুতাম তা কি?'

'তবে কেন এই বড ঘবে চলে এলে?'

কৃষ্ণা নিথব গলায বলে, 'এলাম, দাদা চলে গেল বলেই। বে .ঝ এ প্রসঙ্গ দীপ্তেন্দুব অর্থহীন কৌতূহল নয কোন ইতিহাসপ্রসূত।

প্রমাণও মেলে সে কথাব। দীপ্তেন্দু ফস কবে বলে উঠে, 'মা বলছিল মেয়ে ঘর আগলে পড়ে থাকল, আব বাড়ীব আসল লোকেবই জায়গার অভাবে বাড়ীছাড়া হতে হল। বলছিল 'উকিল' না কি যেন করতে হবে, নইলে তুমি দাদাকে কোন দিন বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। বাড়ীটাতো দাদার আর আমাব পাবাব কথা। হ্যাঁ দিদি সত্যি?'

না, কৃষ্ণাব কাছ থেকে কোন উত্তর আসে না। বাক্‌বোধ হয়ে গেলে উত্তব দেবে কেমন করে লোকে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ে কৃষ্ণা আর ভাবে দোষ দেওয়া বৃথা। দোষ ইরাবতীর নয়, বিজয়লালের নয়, দোষ যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কারের।

আধুনিক শিক্ষার প্রলেপে মুখে যে যতই বড়াই করুক 'মেয়ে আর ছেলেয় তফাৎ কি? দুই সমান।' তবু যোজন তফাৎ।

তফাৎ মা বাপের হৃদয়ের মূল্যবোধে।

নতুন যুগ আর নতুন সমাজ হয়তো মেয়েদের কাছে আশ্রয়ের হাত পাততে বাধ্য করবে, কিন্তু সহজ প্রসন্নতায় স্বাভাবিক ভাবে তাকে মেনে নেবার ক্ষমতা দেবে না। অপমান বোধের সূক্ষ্ম কাঁটা প্রতিনিয়ত তাদের পীড়িত করবে আর তাদেরকে তীক্ষ্ণ করে তুলবে। বাপ মা মেয়েকে আশ্রয়স্থল ভাবতে পারবে, নির্ভরতার জায়গা ভাবতে পারবে, পারবে না আপন ভাবতে। তার কাছে নিতে যদি বা পারা যায়, দিতে পারা কঠিন। তাই পৈত্রিক এই ভাঙা ভিটেটুকুর ওপর পাছে মেয়ে কোন মৌরুসী পাট্টা করে বসে নিজের কর্ত্তব্য পালনের দাম উশুল করতে, তাই ভয়ে ভয়ে উইল করতে বসেছেন বিজয়লাল।

॥ চুলোয় যাক

জটলা হচ্ছিল অন্দরের অন্তরে। অর্থাৎ যেখানটা একেবারে সংসারের জটিল গহ্বর। রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘরের সংযোগ স্থল 'বাসনের ঘরে'। বার মাস এঘরে জল থাকে, বাসন থাকে, কুটনো কোটা হয়। তবে আপাতত খালি করে আত্মীয়দের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অবিশ্যি শুধু এই একটা ঘরেই যে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে তা নয়, তার পাশে আরো যেসব অকেজো ঘর পড়েছিল, সেগুলোকেও এই উপলক্ষ্যে কাজে লাগানো হয়েছে।

কর্তার বাবার আমলের বাড়ি, কাজেই বাড়ির বনেদে কিছু সাবেকী ছাপ আছে, মানে থেকেই গেছে। তবে সামনের অংশ, দোতলা তিনতলা, ভেঙেচুরে গড়ে নেওয়া হয়েছে আধুনিক ছাঁদে। নীচের তলার এই ফালতু ঘরগুলো আর কিছু করা হয়নি। ওগুলো সেকেলে প্ল্যানের নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন-স্বরূপ বিরাজ করছে এখনো।

নির্বুদ্ধিতা নয়তো কি। জায়গা নষ্ট করে কেনই যে আগের লোকেরা বাড়িতে ঘুপচি ঘুপচি খুবরি খুবরি কতকগুলো ঘর বানাতো! যাক আপাতত কাটবার বিয়েতে ওগুলো কাজে লেগে গেল।

কর্তা নবনাথ রায় ধনী লোক। একমাত্র মেয়ের বিয়ের ঘটা যা করছেন, তা দেখবার মত। একেই তো প্রাসাদতুল্য বাড়ি, তার উপর আবার আধুনিক ডেকরেটারদের অভিনব পরিকল্পনার রূপসজ্জায় ইন্দ্রপুরীতুল্য হয়ে উঠেছে।

আত্মীয়বর্গ কেউ পরশু কেউ কাল এসেছেন। আজ বিয়ের সকাল। বাইরে আলোকসজ্জার ব্যাপার নিয়ে এক ঝাঁক ইলেকট্রিসিয়ান হিমসিম

খাচ্ছে। 'ময়ূরপঙ্খী নাও'য়ের গঠনভঙ্গিতে যে ন'বৎখানা রচিত হয়েছে, তার মধ্যে সানাইওলার দল বসে বাজাতে শুরু করলেও ময়ূরের পেখমগুলির কারুকার্য এখনো চলছে।

ওদিকে 'অভ্যর্থনা সমিতি' বা বিশুদ্ধ বাংলায় 'রিসেপশন কমিটির' সভাপতি কনেব মেসোমশাই যে অস্থায়ী ঘরটিতে মূল অফিস খুলে বসেছেন, সেখানে বসে কমিটির সেক্রেটাবী পাড়াবিখ্যাত 'নেলি-বৌদি' কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। তা ছাড়া স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের ব্যাজও অফিস-রুম থেকে সরববাহ করা হচ্ছে। লাল সাটিনে তৈরি এই ব্যাজটির লোভে অনেক ছেলেমেয়েই উঁকি ঝুঁকি মারছে, তবে নেলি-বৌদি বাছাই বাছাই সুন্দর ছেলেমেয়ে ছাড়া ব্যাজ দেবেন না। কারণ আসল সৌষ্ঠব তো ওবাই।

ছেলেরা ববের গাড়িতে গার্ড-অব-অনার দেবাব জন্যে মার্চের ভঙ্গিতে মোড়ের মাথায গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আব মেয়েবা কববীতে পুষ্পমাল্য জড়িয়ে প্রসাধনে মনোহর হয়ে প্রবেশ-তোরণের দু' পাশে শাঁখ, ফুলের মালা আর লাজের থালা হাতে নিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। সসৈন্য বর যখন প্রবেশ করবে এরা শঙ্খধ্বনি, মাল্য বিতরণ ও লাজ বর্ষণ করবে। অনুষ্ঠানলিপিতে এগুলি ঘণ্টা মিনিট হিসাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ করা আছে।

ওদিকে বিভাগীয় একটি অফিস ঘবে মাইক এবং লাউড স্পীকারের টেস্ট চলছে। আর অপর একটি অফিস ঘরে নিমন্ত্রিতবর্গের গাড়িগুলির জন্য ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে টিকিট মজুত রাখা হচ্ছে। এই সংখ্যাগুলি উচ্চরবে ঘোষণা করবার জন্যে একটি সহকাবী অধিকর্তাও নির্বাচন করা হয়েছে, যাঁর গলা সুরেলা ও বাচনভঙ্গি মধুর। হলেও মাত্র নম্বর ঘোষণা, তবু তার মধ্যেও মাধুর্যের প্রকাশ ঘটানো উচিত বৈকি।

এক কথায় ব্যবস্থাপনা অনবদ্য।

কিন্তু আত্মীয়কুল চিরকালই হিংসুক ও নিন্দেকুটে। তাই বাইরের বাতাস যখন একটা অভূতপূর্ব সম্ভাবনায় গমগম করছে, ঠিক সেই সময় এঁরা অন্দরে বসে জটলা করছেন।

জটলার মূল সুর অসন্তোষ। প্রস্তাবিত প্রস্তাব, এই দংগু বিবাহবাড়ি

ত্যাগ। আজ সন্ধ্যায় বিয়ে আর আজ সকালে বিবাহবাটি ত্যাগ।

এর চাইতে কটু-কষায় লবণাক্ত কদর্য মনোভাব আর কি হতে পারে। পিতৃ-পিতামহের কাল থেকে কখনও যা না দেখেছিস তাই দেখ, তা নয় সাপের মত ফোঁস ফোঁস! ছিছি! এটা ... কতখানি 'বৃহৎ কর্ম', সেটা অনুধাবন কর' আর 'বৃহৎ কর্মে' যে ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী সেটাও বিবেচনা কর। না কি আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয়েছে বলে চলে গিয়ে কর্তার মুখ হাসাবি?

কিন্তু সাধে বলেছে 'আত্মীয়'?

ওই 'কথা'টির মধ্যেই অনেক 'কথা'!

কেউ যদি ভেবে থাকেন, এঁরা সকলেই কর্তার আত্মীয় আত্মীয়া, তাহলে ভুল করবেন, গিন্নীর পক্ষেরও আছেন। আবার কেউ যদি ভেবে থাকেন নিতান্ত দীনহীন এঁরা, তাহলেও ভুল করবেন। কেউ কেউ যদিও লৌকিকতা বাবদ জেলেডুবে এনেছেন, তেমনি অনেকেই আবার সিফন নাইলনও এনেছেন। বহু পূর্ব থেকে ঘোষিত, এমনকি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত এই বিবাহটি সম্পর্কে সকলেরই 'সমীহ' মনোভাব ছিল।

তবে অবিশ্যি 'সোনার গহনা'র দল এখানে নেই, তাঁদের মিহি চালুনিতে ছেকে নেওয়ার মত সুকৌশলে ছেকে নিয়ে দোতলা তিনতলায় চালান করা হয়েছে।

গিন্নীর খোদ ভাই-ভাজেরা তো স্থান পেয়েছেন ও ধারে প্রেস ফটোগ্রাফার ও রিপোর্টারদের ঘরের পাশেই। হ্যাঁ, রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার —এঁরা তো দু তিন দিন থেকে এসেছেন। এবং জামাই আদরে বাস করছেন। এঁরা না হলে তো সমস্ত অনুষ্ঠানই অর্থহীন যার নাম শিবহীন দক্ষযজ্ঞ।

এঁরা আছেন। এঁদের ঘরের মেঝে কার্পেট মোড়া, বিছানায় ডানলোপিলোর গদি। প্রত্যেকের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার জন্য জনাপিছু এক একটি ভলান্টিয়ার। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা? বলা বাহুল্য—রাজকীয়।

গলদ বেঁধেছে এই নিয়েই।

তিনতলার খবর কেমন করে কে জানে একতলায় এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠেছে।

গত কাল পরশু ধরে আত্মীয়েরা বড়লোকের বাড়ির বিয়ের যজ্ঞির বহর দেখে হতভম্ব হচ্ছিলেন আর পরস্পরে ফিসফিস করছিলেন, কিন্তু তিনতলার খবর কানে আসার পর থেকে চলে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

আগুন জ্বলছে, বারুদের সঞ্চয়ও বিপুল, তবু শান্তিজল ঢালতে চেষ্টা করছেন কর্তার জ্ঞাতি দাদা বিশ্বনাথ রায়। বয়েস হয়েছে, বিচার বিবেচন আছে। তিনি প্রায় হাতজোড় করে সকলকে 'গলা খাটো' করবার অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং নিজে খাটো গলায় বার বার [illegible]রোধ করছেন, "একটা দিন বে তো না? একটা দিন যা হোক করে কাটিয়ে দাও তোমরা। আজ বিয়ে, আজ চলে যাওয়াটা বড় দৃষ্টিকটু দেখাবে।"

দৃষ্টিকটু! ফোঁস করে উঠল তাঁরই ভাইয়ের নাতনী, "দৃষ্টিকটু না দেখানোর দায়িত্ব বুঝি শুধু আমাদের? এরা কি করছেন?"

"আহা বুঝছি তো সব। কিন্তু এইটা সার বুঝিস, নিন্দে হলে আমাদেরই হবে, ওদের হবে না।"

"হবে না?"

"উহু। ওদের হাতেই যে নিন্দে সুখ্যাতির চাবিকাঠি।"

অপর একজন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "হোক, আমাদেরই নিন্দে হোক, তা বলে এত অসহ্য সহ্য করা যায় না। কাল রাত্রে কী হয়েছিল জানেন? জানালা দিয়ে ধেড়ে ইঁদুর ঢুকেছিল। জানলার এই এত খানি খানি ফাঁক।"

"আর স্যাঁৎসেতে ভিজে মেজেয় শুধু শতরঞ্চিতে শুয়ে বুকে পিঠে ব্যথা ধরে যায়নি?" ফোঁস করে ওঠে একজন, "বড়লোকের বাড়িতে একখানা চৌকি তক্তাপোসও জুটবে না, এ কেমন করে জানব বলুন? তা হলে নয় গদিই আনতুম একখানা। বিয়ে বাড়িতে যে আবার নিজেদের সব আনতে হয়, এ কক্ষনো শুনিনি।"

বিশ্বনাথ বলেন, "আহা, এতবড় যজ্ঞি, কত লোকজন, অত পারবে কেন?"

"না পারবে তো এত বড় কাণ্ড করাই বা কেন?" ছিটকে ওঠেন একটি মহিলা, "নেমন্তন্ন করে যাদের এনেছ, তাদের দিকে দিষ্টিপাত করবার সময় নেই, এমনই ঘটা! কী দরকার ছিল আমাদের ডাকবার? ঘরে খেতে

পাচ্ছিলাম না আমরা ?”

মহিলাদের বাকপটুত্বে শ্রেণী-বিভাগ থাকে না। বয়সের তারতম্য, বিদ্যার তারতম্য, অবস্থার তারতম্য, কোন কিছুতেই সে পটুত্বের এদিক ওদিক হয় না। একজন তো ফস করে বসল, “আপনি ও পক্ষ থেকে কিছু ঘুসটুস খাননি তো দাদু ?”

একজন বললেন, “আত্মীয়দের নেমন্তন্ন না করে কাঙালীভোজন করালেই তো চুকে যেত! তাতেও নাম কম হত না! সারি দিয়ে বসিয়ে ফটাফট ফটো তুলে নিয়ে কাগজে ছাপাতে পারলেই ধন্যি ধন্যি পড়ে যেত!”

জ্ঞাতিজ্যাঠা বিশ্বনাথবাবু সমবেত স্বরস্রোতে প্রায় ভেসে যেতে বসেন। অবাক হয়ে যান ফটোরহস্য ভেদ হওয়ায়, তথাপি সৌষ্ঠব বজায় রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন তিনি।

বলেন “যতই হোক, কন্যাদায়, আপনার লোক হয়ে শত্রুতাচরণ করবো ?”

কিন্তু এদের নরম করাতে পারলেন না।

এরা বললো, “কেন আপনার মেয়ের বিয়ের সময়ও গিয়েছি আমরা, সে-ও কন্যাদায়। কী যত্ন আদর করেছিলেন আপনি, মনে নেই? তিনখানা আটচালায় প্রত্যেকের জন্যে আলাদা-আলাদা চৌকী, বিছানা-বালিশ, মায় হাতপাখা! আর মাছ মিষ্টি দইয়ের কী বিরাট আয়োজন!”

বিশ্বনাথবাবু শশব্যস্তে বলেন, “ছেড়ে দে বাপু, ওসব পাড়াগেঁয়ে কথা ছেড়ে দে। না জানি শোভা সৌষ্ঠব, না জানি কায়দা ব্যবস্থা। কতকগুলো জিনিস এনে ঢেলে দিয়েছি, নে বাবা কর পর্দা, খা। সে আবার একটা কাজ! দূর!”

“আপনি তার দাদা, সমস্তক্ষণ সকলের কাছে কাছে ঘুরেছেন, কার কি অসুবিধে হচ্ছে দেখতে। আর এঁরা? কর্তা-গিন্নীর টিকিটুকু যে কেমন তা' একবার চক্ষে দেখলাম না।”

একজন ফোড়ন কাটে, “দেখবি, কোথা থেকে, চুলের গোড়া পর্যন্ত যে বাঁধা দেওয়া? দেখগে যা, গরুড় অবতার মত জোড় হস্তে কোথায় দণ্ডায়মান আছেন দুজনে।”

কথায় কথায় বাতাস আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং তল্পী-তল্পা বাঁধা

বোধ হয় না। উনষাট জনের মধ্যে আটান্নজন গেলেন একা বিশ্বনাথ রইলেন বাকী। নিজের স্ত্রী-কন্যাকে পর্যন্ত ম্যানেজ করতে পারলেন না তিনি।

অভিযোগ অনন্ত।

প্রথমত, এত হাড়ির হালে থাকতে পারবে না কেউ, আর থাকবেই বা কেন? কেন খাবে ন্যাতা-কাচা জলের মত চা? কেন বা খাবে দালদায় ভাজা ন্যাটার লুচি জলখাবার, আর কেনই বা ছেড়া কলাপাতা আর ছেঁড়া চটের আসনকে মেনে নেবে?

তা' ছাড়া প্রধান কথা—তারা কে? তাদের আনা হয়েছে কি জন্যে? গায়ে হলুদের সময় কেউ ডেকেছে তাদের? ডেকেছে এযোকামানোর সময়? তত্ত্বতাবাসের জিনিসপত্র দেখিয়েছে তাদের কেউ? কনের গহনা কাপড়? কেউ না। কেউ তাদের উদ্দিশও করেনি। তারা খালি কুটনো কুটেছে।

অতএব?

অতএব যে যার মান নিয়ে সরে পড়ো।

এঁরা চলে যেতে লাগলেন।

প্রথম কয়েক ব্যাচের যাওয়া কারো চোখেই পড়েনি, শেষের দিকে কর্তার ভাইঝি-জামাই দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বললেন, "এ কী, আপনারা চলে যাচ্ছেন?"

এঁরা অভিমানী, তবে অভদ্র নয়, কাজেই সত্য ঘটনা বিবৃত না করে কল্পিত কৈফিয়ত খাড়া করলেন। অর্থাৎ দেখা গেল প্রত্যেকের বাড়িতেই ঠিক আজই সন্ধ্যায় মরণ-বাঁচন সমস্যা।

জামাই গিয়ে চুপি চুপি খবর দিলেন।

কর্তা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, "চুলোয় যাক।"

গিন্নী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "থাকবেন কি করে? হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাচ্ছেন যে।"

কর্তা বললেন, "আর ক'ঘণ্টা থাকলে গ্যাদারিঙের ফটোটা ভাল উঠতো—"

গিন্নী বললেন, "কাল সকালের কুটনোর বঁটি কোটবার জন্যে আবার লোক দেখতে হবে। যাকগে, পয়সা ফেললে কী না হয়।"

অতএব মরুক গে! চুলোয় যাক গে।

এদের জন্যে কিছুই আটকাল না। যথানির্দিষ্ট কার্যক্রমে সব কিছুই নির্ভুল-ভাবে হতে থাকল।

রুচিবার কলেজের বন্ধুরা এসে এমন সাজানো সাজালো যে, পরী বলে ভ্রম হতে থাকলো তাকে। নামকরা একটি গানের দল বিবাহমঞ্চের নীচে বসে গান শুরু করল, কনেকে এনে মঞ্চের ওপর বসানো হল।

হ্যাঁ মঞ্চ বৈ কি।

মঞ্চ না হলে বিবাহের মহামুহূর্তগুলিতে আলোকসম্পাত ঠিকমত হয়ে উঠবে কী করে? আর ফটো নেওয়ারই বা সুবিধে হবে কেমন করে? বিখ্যাত একজন আলোকশিল্পীকে আলোকসম্পাতের ভার দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এত ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সহসা একটা গোল উঠল। কী ব্যাপার! না, পুরোহিত বলছেন, লগ্ন পার হয়ে যাচ্ছে।

লগ্ন পার হয়ে যাচ্ছে।

তা যাচ্ছে বটে।

কারণ গোধূলি লগ্নে বিয়ের কথা, কিন্তু এখন সন্ধ্যা হয় হয়। কিন্তু দেরীর কারণ কি?

কারণ সভাপতি, প্রধান অতিথি, আর উদ্বোধক এসে পৌঁছননি।

বর বসে আছে সভা উজ্জ্বল করে? তা থাক, তবু এঁদের চাই। একজন মন্ত্রী, একজন উপমন্ত্রী ও একজন প্রসিদ্ধ শিল্পপতি। এঁরা না এলে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় কী করে? ফোনের পর ফোন করে খবর নেওয়া হচ্ছে তাদের, তাঁরা এই 'এলেন' বলে।

ভাইঝি-জামাই এসে বলল, "পুরুত বলছে, আজ আর লগ্ন নেই।"

কর্তা বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "চুলোয় যাক।"

"পুরুত রাগ করে চলে যাচ্ছেন।"

"চুলোয় যাক।"

লক্ষভ্রষ্ট হল—

মুখের কথা মুখেই থাকলো, রব উঠল, "এসেছেন, এসে গেছেন।"

কর্তা ভাইঝি-জামাইকে ঠেলে সরাতে গিয়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

স্মিতহাস্যে সভাপতি, প্রধান অতিথি আর উদ্বোধক মঞ্চে এসে উঠলেন। তাঁদের জন্যে আর একবার লাজবর্ষণ হলো। রিপোর্টাররা কাগজ কলম বাগিয়ে বসলেন, ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরা।

শিল্পপতি লৌহ-শিল্পের সঙ্গে বিবাহের একটি চমৎকার সাদৃশ্য এনে সুন্দর বক্তৃতা দিয়ে উদ্বোধন করলেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি দীর্ঘ বক্তৃতা "পাঠ" করে ঋণ শোধ করলেন।

এই অবকাশে পাশাপাশি বসিয়ে রাখা বর ও কন্যা পরস্পর দিব্যি ভাব-জমিয়ে তুলে গালগল্প করে নিল।

এ হেন সময় আবার একটা চাপা ঝড় উঠল। বরকর্তা আর বরযাত্রীরা এতক্ষণ বসে থেকে থেকে না কি বিরক্ত হয়ে উঠে না খেয়ে চলে যাচ্ছে।

কর্তার সামনে সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক। এঁদের আদর অভ্যর্থনা বাকী। খাওয়ানো, মাখানো গাড়িতে তুলে দেওয়া বাকী। কর্তা একেবারে টানটান হয়ে দাড়িয়ে রয়েছেন, এমন সময় কিনা হতভাগা বরকর্তা আর বরযাত্রীর দল!

কর্তা সংবাদবাহার দিকেই রোষকষায়িত দৃষ্টিপাত করে বললেন, "চুলোয় যাক!"

"বরের মামা কাকা সবাই খাপ্পা হয়ে উঠেছেন!"

কর্তা মঞ্চোপরি উপবিষ্ট আলাপনিরত যুগল ছবির দিকে তাকিয়ে একটি পরিতৃপ্তির হাসি গোপন করে বললেন, "চুলোয় যাক!"

ওদের চুলোয় পাঠিয়ে দিয়ে কর্তা অতিথিদের সৎকারে মনোনিবেশ করলেন। প্রধান অতিথি মিষ্টি খান না, সভাপতি স্টাচ খান না, উদ্বোধক ভদ্রলোক আবার কিছুই নাকি খান না। এসব ভার কি যাকে তাকে দেওয়া যায়? কর্তা-গিন্নী নিজেরা না দেখলে?

ওঁদের বিদায় দানের পর আবার এক রব উঠল, প্রেস ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টাররা আর থাকতে চাইছেন না। বিদায় চাইছেন।

"সর্বনাশ! না খেয়ে!"

সম্প্রদানে বসবেন বলে গরদ ধুতি পরা ছিল, ছুটে যেতে ফস্ করে কাছা খুলে গেল। কাছা লুটোতে লুটোতে ছুটলেন কর্তা! ওদের হাতেই যে মানসম্মান সব! সেই মানসম্মান রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠলেন কর্তা।

সম্প্রদান আর হল না।

কারণ দেরী দেখে উৎসাহী তরুণ-তরুণীদল ইত্যবসরে বর-কনেকে মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীআচার সারিয়ে বাসরে বসিয়েছে।

তরুণীদের গানের স্বর ভেসে আসছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বায়ুদের নিজের মোটরে করে যার যার জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে কর্তা ভিতর দালানে এসে বসে পড়লেন, "ওরে কে আছিস, এক গ্লাস জল দে তো।"

স্বয়ং গৃহিণীই এলেন জল নিয়ে।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "সম্প্রদান হলো না।"

কর্তা বললেন, "চুলোয় যাক। আসল কাজটা তো সুশৃঙ্খলে মিটে গেছে, ব্যস!"

গিন্নী ভ্যাঁক-করে গুবো কেঁদে ফেলে বললেন, "বরকর্তা আর বরযাত্রীরা না খেয়ে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেছে।"

"চুলোয় যাক, যেতে দাও।"

"মেয়ে-জামাইকে জোড়ে একবার দেখ।"

"কাল দেখলেই হবে। ভয়ানক টায়ার্ড লাগছে, শুতে যাচ্ছি। কাল সকালে খবরের কাগজগুলো এলে তিনতলায় পাঠিয়ে দিও। তার আগে ডাকাডাকি কোরো না।"

পরদিন!

পরদিন সকাল।

শহরের সমস্ত কাগজগুলির বিশিষ্ট পৃষ্ঠায় শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি নবনাথ রায়ের সুবিখ্যাতা কন্যা রুচিরা রায়ের বিবাহ-সংবাদ ফটোসহ প্রকাশিত হল, এবং নবনাথ রায় প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখলেন, প্রায় প্রত্যেকখানি ছবিরই একেবারে

সামনে বরাবর তিনি আছেন। মনে মনে হিসাব করলেন, দৈনিক কাগজগুলো ছাড়াও মাসিক ও সিনেমা পত্রিকাগুলি আছে, যারা আষ্টেপৃষ্ঠে ছবি ছেপে বিবাহ-বাড়ির বর্ণনা দেবে।

নবনাথ সব ছবিগুলিতেই আছেন।

পরিতৃপ্ত নবনাথ বিবাহ সভায় উপস্থিত মান্যগণ্য ব্যক্তিদের দেড় কলমব্যাপী তালিকা পড়তে থাকেন। আর চোখ হৃদয়কে মধু বর্ষণ করতে থাকে।

আহা, নবনাথের নাম আরও একবার আছে বৈ কি। এই যে—"পরিশেষে শ্রীনবনাথ রায় মধুর আলাপনে ও আন্তরিক অভ্যর্থনায় নিমন্ত্রিতদের সন্তুষ্ট ও ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করেন।"

লাইনটা বারবার পড়তে থাকেন নবনাথ, এতদিনের এত চেষ্টা, সাধনা ও তপস্যার ফল হাতে পাওয়ার পরম সুখ মুখে মেখে।

ভাইঝি এসে বলে, "কাকা বর-কনে কখন বেরোবে? বারবেলা পড়ে যাচ্ছে।"

নবনাথ বলেন "চুলোয় যাক। আমায় এক কাপ চা পাঠিয়ে দে দিকি।"

॥ বায়স মাহাত্ম্য

সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিয়ে গেল একটা দাঁড়কাক।

কাকটা বায়সরূপী নারায়ণ কিনা, সে কথা স্বয়ং নারায়ণই জানেন, এবং নারায়ণের স্বধর্ম যুধ্যমান দুটি পক্ষকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করা না আরো প্রবৃত্ত করা সে কথা নারায়ণ চরিত্রাভিজ্ঞ নরকুলেরা জানেন। তবে দাঁড়কাকটা ঠিক সেই সময় এসে না পড়লে, শেষ পর্যন্ত কী হ'ত বলা যায় না।

কতদিন তো প্রতিবেশীরা আশা এবং আশঙ্কা করছিল ঝটিতির মধ্যেই না ঘোষবাড়ীর দুটি মহিলার একটিকে পাড়া ছেড়ে যান এবং মাছ চচ্চড়ি ছেড়ে পোস্ত চচ্চড়ি ধরতে হয়।

যুগল স্ববল দুজনেই যেমন ক্ষেপে বসে আছে, কে বলতে পারে কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে একে অপরের ওপর গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে কিনা। প্রতিবেশীরা রুদ্ধশ্বাসে সেই ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় দিন গুণছিল। ওদিকে মামলার আর ফয়সালা হচ্ছে না। উকিল মুহুরী রোজ একটা করে নতুন ডেট ফেলছে।

'তোর ঘরে যম ঢুকুক', এ অভিসম্পাতের চাইতে যে অনেক বেশী ভয়াবহ শাপ 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক', এই প্রবচনের সত্যটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যুগল ঘোষ আর স্ববল ঘোষের স্ত্রী ললিতা আর নবনলিনী। খুড়শাশুড়ী আর ভাসুরপো বৌ।

আগে প্রথম যখন নালিশ ঠুকে এসেছিল স্ববল, তখন ললিতা আর নবনলিনী একসঙ্গে দালানে পা ছড়িয়ে বসে কচি শশা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঘরে ভাজা গরম মুড়ি খেতে খেতে পুরুষদের মতিচ্ছন্নের নিন্দাবাদ করত!

ললিতা বলত, 'লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ভাইপোর সঙ্গে বিবাদ করছে! বলি, ভাসুরঠাকুর না হয়, ছোট ভাই বলে মায়া করে তোমাকে ছেলের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করে বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেলেন 'কিন্তু তুমি নিলে

কি বলে ? নিয়েছ, আবার তাই নিয়ে লড়ালড়ি করছ ! ছি ছি ছি !'

'তুমি'টির সামনে অবশ্য কথা হ'ত না। হতো তার অনুপস্থিতেই। তবে কিনা ললিতার কথার ধরনই ওই।

নবনলিনী আধখানা লঙ্কায় একসঙ্গে কামড় দিয়ে উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলত, 'আদর করে ছেলের দোষ ঢাকছ কেন খুড়ি, দোষ তো এরই। শ্বশুরমশাই তো হাবা পাগল ছিলেন না যে, না বুঝে-সুঝে একটা লেখাপড়া করে গেছেন ? তুই কেন বাপের মুখ পুড়িয়ে, গেলি খুড়োর নামে নালিশ ঠুকতে ?'

'তুই'টাও অবশ্য অনুপস্থিত থাকে।

ব্যাপারটা এই সুবলের বাপ নকুল ঘোষ মারা যাবার আগে এক কিম্ভূত-কিমাকার উইল করে গেছল। জলজ্যান্ত আস্ত সাবালক একটা ছেলে থাকতে ভাইকে আধাআধি বিষয়ের মালিক করে দিয়ে গেছল ! এমন কথা কে করে শুনেছে ? তাও বিষয়ের কানাকড়িও যুগল নকুলের বাপের আমলের নয়। বাপতো কোন জন্মে মরে ভূত হয়েছিল, সব কিছুই নকুলের স্বোপার্জিত।

জমিজমা বাগানপুকুর, আর ঘানির তেলের অতবড় কারবার, সব করেছে নকুল নিজের গতরে, আর নিজের বুদ্ধিতে। বাপ নেই মা নেই, মামার বাড়ীতে মানুষ, একটু বয়েস হতেই টের পেল ভিক্ষার অন্ন কত কদন্ন ! বছর আষ্টেকের ভাইটার হাত ধরে বেরিয়ে এল একদিন মামার বাড়ী থেকে।

মামারা বলল, 'আচ্ছা-দেখব, তেজ ক'দিন থাকে ? পেটে কোদাল পড়লেই তেজ বেরিয়ে যাবে।'

তা' মামাদের ভবিষ্যৎবাণী ফলপ্রসূ হল না। নকুল হতে দিল না। 'তেজ' কাকে বলে দেখিয়ে দিল। সেই মামারাই পরে নকুলের সাহায্যে খেয়েছে, মেয়ের বিয়ের সময় হাত পেতেছে।

সে যাক্, নকুল স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ কৃতী পুরুষ, বিষয়ের ভাগ তার ভাইকে দেবার, অন্ততঃ চুল চিরে আধাআধি ভাগ দেবার দরকার ছিল না নিজের ছেলেকে বঞ্চিত করে।

তা'ও আবার ছেলেকেই বেশী জব্দ করে গেছে নকুল কড়া একটি শর্ত দিয়ে। বিষয়ের ভাগ পাবে সুবল এই শর্তে, যদি কাকার সঙ্গে এক অন্নে আর এক ভদ্রাসনে থাকতে পারে।

বাপ মরবার পর উইল শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বটে সুবলের ; কিন্তু সে নিতান্ত সামান্যই। তখন কাকার প্রতি ভালবাসার নদী ভাদ্রের ভরা গঙ্গা !

জন্মাবধি কাকাই সুবলের প্রাণপুরুষ। কাকাই পরম বন্ধু।

বয়সে অনেকখানি তফাত থাকলেও সে বন্ধুত্বে ফাঁক ছিল না এক চিলতে। কাজেই সামান্য মন খারাপ সমুদ্রে জলবুদ্বুদের মত তখুনি মিলিয়ে গেল। কাকার সঙ্গে এক অন্নে এক ভদ্রাসনে থাকার প্রশ্নটা তখন প্রশ্নের অতীত।

মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেল। কাকারূপী পরমাশ্রয়ে আরও বেশী করে আশ্রয় নিল সুবল।

নিল।

বেশ কিছুদিন চলল।

উইলখানাকে ছেঁড়া কাগজ মাত্র মনে করে সন্তোষ লাভ করে রইল সুবল।

কিন্তু—

ওই কিন্তুটা কোথায় যেন খচ্ খচ্ করতে লাগল। বাবা ভাইকে শর্তাধীন না করে, করে গেলেন কিনা ছেলেকে! বাপের ওপর অভিমানটাই একটু ধোঁয়ার সৃষ্টি করে রেখে দিল।

তারপর দিন গেল, মাস গেল, বছর যেতে বসল, দেখা গেল ধোঁয়াটা আয়তনে অনেকখানি বেড়ে গেছে। কালো কালো জমাট জমাট সেই ধোঁয়াটায় যেন কিছুটা উত্তাপেরও সৃষ্টি হয়েছে।

কারণটা এই—

কারবারের কি একটা ব্যাপার নিয়ে হিসেব-নিকেশ করতে বসে একদিন যুগল ভাইপোকে তিরস্কার করল। বলল, 'তুই যেমন নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, তাই দেশসুদ্ধ লোককে বিশ্বাস করিস। অত বিশ্বাস ভাল নয়। পরে পস্তাবি।'

সুবল নিজের দোষ স্বীকার না করে হঠাৎ বলে বসল, 'আমি নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, এতো চোখের উপরই পড়ে আছে।'

যুগল একটু ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ কথা কেন বললি সুবল ?'

'বললাম এমনি।'

বলে খাতা উল্টোতে লাগল সুবল। যুগলও গুম হয়ে বসে থাকল। সুবলের মনের ধোঁয়াটা গরম হল।

ওদিকে একসঙ্গে দালানে পা ছড়িয়ে বসে শশা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তেলে জবজবে গরম মুড়ি খাওয়াটা যেন ইদানীং কমে এসেছে।

যদি নবনলিনী বলে, 'হাতটা অবসর করে একবার এসো খুড়ি, মুড়ি মাখছি—।'

ললিতা যেখানে আছে, সেখানে বসেই বলে, 'আমার এখন হাত অবসর হতে দেরী আছে বৌমা, আমার মুড়ি এখন মেখো না।'

আবার ললিতা যদি কোন সময় বলে, 'বৌমা চা জলখাবার খেয়ে নিয়ে তবে হেঁসেলে ঢুকলে ভাল হয়। এসো চা ছাঁকছি—'

নবনলিনী ভারী গলায় বলে, 'থাক, পরে গরম করে খাবো।'

ললিতা বলে ওঠে, 'এক গেলাস চা গলায় ঢালবার সময় নেই, এত কি রাজকার্য তা' জানিনে।'

নবনলিনী আরো ভারা গলায় বলে, 'না কাজ আর কি রাতদিন তো হাত পা কোলে করে বসে আছি।'

দু'জনের একজনও আর এখন পতি নিন্দার পাত্রকে লিপ্ত হয় না।

ধোঁয়া জিনিসটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মুশকিল। তা'তে বিপরীত বাতাস ঠেকলেই হঠাৎ ঘচ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

জমিজমা বাগান পুকুর নিয়ে সুবল কোনদিন মাথা ঘামাত না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তাই নিয়ে সুবল শুধু মাথাই ঘামাচ্ছে না, গলদঘর্ম হয়ে উঠছে। কোন বাগানে কত আম, কোন বাগানে কত বাঁশ, কার কাছে জমা ধরানো থাকে, কত করে উসুল হয়, ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নে, যুগলকে ব্যস্ত করছে, নিজে ব্যস্ত হচ্ছে।

যুগল বিরক্ত হয়ে বলে, 'কাজের সময় বাগড়া দিচ্ছিস কেন? তালুক-মুলুকের হিসেব নেবার বাসনা হয়, ঘরে গিয়ে হবে। রাতে বসিস মোটা খাতা নিয়ে, ষোল আনা হিসেব বোঝাবো তোকে।'

সুবল ভুরু কুঁচকে বলল, 'ষোলো আনায় দরকার কি আমার। আধুলির ব্যাপারী, আধুলির হিসেবটুকু পেলেই হবে।'

আধুলির ব্যাপারী !

যুগল আবার সেদিনের মত গুম হয়ে গেল।

তারপর বলল, 'তোর টাকা কেটে আধুলি আমি ধরে দিইনি রে সুবল, তোর বিজ্ঞ বিচক্ষণ বাপই করে গেছে।'

হঠাৎ সুবল ফোঁস করে উঠে বলে, 'রামচন্দ্রকে বনে কৈকেয়ী পাঠায়নি, পাঠিয়েছিল রাজা দশরথই। মন্ত্রণার ভগবান ভোলে, তা মানুষ তো কোন ছার!'

'কী বললি।' যুগল রুখে উঠে বলে, 'কী বললি রে সুবল ! আমি দাদাকে মন্ত্রণা দিয়ে বখর নিয়েছি ?'

'কি করেছ ত তুমিই জান।'

বলে সুবল রেজার মুখে আড়ত থেকে বেরিয়ে আসে। আর যুগল স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে তার পিঠের দিকে।

পিঠটা কতখানি চওড়া।

আগের থেকে অনেকটা মোটা হয়ে পড়েছে সুবল। সুবল একটা 'লোক' হয়ে গেছে।

রান্নাঘরের মূল চেহারা অবশ্য এখনো অপরিবর্তিত, যে হাঁড়িতে ভাত চড়ত, সে হাঁড়িতেই ভাত চড়ে। কিন্তু দুধ জলখাবার তো আর আইনের আওতায় পড়ে না ?

তাই এ দেয়ালের দিকে মুখ করে একটা উনুন জেলে নবনলিনী দুধ ঘন করে করে ক্ষীর বানায়। আর ও দেয়ালের দিকে মুখ করে ললিতা দুধ কাটিয়ে ছানা করে সন্দেশ বানায়।

দুধেলা গরুগুলো অবশ্য একই গামলায় জাব্‌না খায়, কিন্তু দুধগুলো ভাগ হয়ে গেছে।

খুব বেশীদিন অবশ্য নয়। এই সেদিনের কথা। নবনলিনী বাতাসকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল, 'ঘরে তিন তিনটে দুধেলা গরু তা একদিন ক্ষীর রাবড়ি চক্ষে দেখলাম না। খালি সন্দেশ পাক হচ্ছে। সন্দেশে অরুচি জন্মে গেল।'

ললিতা আকাশের গায়ে মন্তব্য ছুঁড়ল, 'সন্দেশটা করা গেরস্থর সুসার করতে। পুরুষেরা তেতে পুড়ে এলে জলখাওয়া আছে, সংসারে 'এসো জন বসো জন' আছে। ঘরে গাই বিয়োলে যে মেয়ে মানুষকে ক্ষীরের বাটিতে

চুমুক দিতে হয়, এতো কোনদিন শিখিনি।'

নবনলিনী দেয়ালকে দুঃখের গাথা শোনায়, 'ক্ষীরের বাটিতে চুমুক মেয়ে-মানুষে দেবে না কেন, একশোবার দেয়। অবস্থা থাকলেই দেয়। তবে কিনা আমার ভাগ্যে সব থেকেও আমি ভিখিরি। আপনার শ্বশুরের ধন, পাঁচ পরের হাত তোলায় পাচ্ছি।'

ললিতা যুগল নয় যে, স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে ধেই ধেই করে ওঠে, 'হাত তোলা! কে কাকে হাত তোলায় রেখেছে? পুকুরে জাল পড়ল, মাছ উঠল, চক্ষে দেখতে পেলাম না। কোটা হল, ভাজা হল, পাড়া-পড়শীকে দেওয়া হল। গিন্নীত্বের বাকী তো কিছু দেখলাম না।'

উপযুক্ত অভিযোগ খুঁজে না পেয়েই বোধ করি এ কথাটা তুলল ললিতা। কারণ একদা এককালে অনুরূপ কাজেই বাহবা পেয়েছে নবনলিনী। ললিতা সবাইকে ডেকে ডেকে বৌয়ের গুণপনা আর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা শুনিয়েছে।

কিন্তু বাতাসের মোড় ঘুরে গেলে গুণও দোষ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে ক্রমশঃ ধরা পড়ে, হুল ফোটানোর ব্যাপারে ললিতার চেয়ে নবনলিনীর দক্ষতা অনেক বেশী!

ঘরে নবনলিনী দক্ষতা দেখায়, বাইরে সুবল।

আর হুল ফোটানো জিনিসটার মজা এই ফোটাবার সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যক্তির যন্ত্রণার ছটফটানি হুলওয়ালাকে যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই তাই ইচ্ছে করে বসিয়ে রসিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ওই যন্ত্রণাটা দেখে।

মজা আরও আছে।

হঠাৎ একদিন দেখা যায় কাকা ভাইপো দু'জনের কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই, আজও যে ক্ষেত্রটা দৃশ্যতঃ অভিন্ন রয়েছে, সেখানে কেমন করে যেন দুটো দল হয়ে গেছে! একদল এ পক্ষকে তাতাচ্ছে, একদল ও পক্ষকে তাতাচ্ছে।

আবার সেই পক্ষরাই যথাক্রমে দু'জনের কানভারী করছে। ওদের কল্যাণেই যুগল জানতে পারছে সুবল তার নামে কি কি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছে, আর সুবল জানতে পারছে যুগল তার নামে কি কি অসঙ্গত মন্তব্য করছে।

কারবারের কাজ প্রায় শিকেয় উঠেছে, কথাই চলছে খালি। যে কথাকে 'কথা' বলে।

যুগল আগে বিস্ময় অনুভব করত, মর্মাহত হ'ত, এখন রাগে জ্বলতে থাকে।

সুবলের মত লেখাপড়া সে শেখেনি, হিসেব লিখতে কলম ভাঙে, কাজেই মনটা তার 'সোঁদা'। কানভাঙানিতে সে মন ভাঙে।

তবু একদিন বড় ধিক্কার এল।

আড়তে একজন এসে লাগিয়ে গেল যুগলকে, সুবল বলেছে উইল জাল। আর সেকথা সে আদালতে প্রমাণ করবে।

যুগল বাড়ী এসে ললিতাকে বলল, 'আর তো টেঁকা যাচ্ছে না, এভাবে থাকা অসম্ভব, চলো সর্ব্বস্ব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমরা কোথাও চলে যাই।'

ললিতা ভুরু কুঁচকে বলল, 'সর্ব্বস্ব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই। বাঃ চমৎকার। তা অমনি যাবো কেন, দু'খানা গেরুয়ার অভাব দাও, ভৈরব ভৈরবী হয়ে বেরিয়ে পড়ি। কথার ছিরি শুনলে গা জ্বলে যায়। গলায় একটা আইবুড়ো মেয়ে, তা বোধ হয় ভুলেই গেছ।'

যুগল বলে, 'আমাদেরও যা গতি হবে, ওরই তাই হবে।'

ললিতা রুক্ষ কণ্ঠে বলে, 'গাছের দেড়খানা নারকেল লাগবে তা'হলে।'

হঠাৎ নারকেল প্রসঙ্গে অবাক যুগল বলে, 'তার মানে?'

মানে ব্যাখ্যা করে ললিতা।

'মানে অতি সোজা। ভিক্ষেয় বেরোতে দু'জনের হাতে দু'খানা মালা লাগত, একটা নারকেল হলেই চলতো, নিমলির জন্যে আবার একখানা চাই তো।'

যুগল বোঝায় রোজ রোজ এত অশান্তি আর সয় না, এদের সংস্রব সহ্য করা কষ্ট। হাত পা আছে, মুটেগিরি করেও পেটটা চালাতে পারবো।'

ললিতা ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, 'এবে তো মস্ত বাহাদুরীর কথা 'ল। কেন, 'হকের ধন মদনমোহন' ছেড়েই বা যাবো কেন?'

যুগল ক্ষুব্ধস্বরে বলে 'হকের ধন হলে কি আর আজ ব্যাঙে লাথি মারে। ব্যাঙের আধুলি আমি ব্যাঙকেই দানপত্তর করে দিয়ে চলে যাব।'

ললিতা বলে, 'তা' হলে ভাসুরঠাকুরের কাছে জোচ্চুরি করা হয়। হকের ধন না ভাবলে তিনি কখনো দিতেন না। কেন, সেই এতটুকু বয়েস থেকে দাদার খিদমদগারী করনি তুমি? দাদার পা টেপনি, তামাক সাজনি? ছালাছালা মাল বয়ে আননি মুটের মতন? দাদা যা করে গেছেন ন্যায্যই করে গেছেন। আজ যদি তুমি সব ফেলে দিয়ে চলে যাও, তিনি ওই ওপরে বসে

নিশ্বাস ফেলবেন না ?'

সুবল অনেক কড়া কথা বলে, অনেক প্যাঁচালো কথা বলে, কিন্তু একটা আধটা সত্যি কথাও বলে বৈকি।

'মন্ত্রণায় ভগবান ভোলেন' একথা কি মিথ্যে ?

ললিতার মন্ত্রণাটা ভারসহ।

দাদা ওই ওপর থেকে বসে নিশ্বাস ফেলবেন, শুনেই যুগলের মনে হয় হয়তো সত্যিই তাই। সুবল অবোধ, সুবল ব্যবসার কি বা জানে, সুবলকে ভাসিয়ে দিয়ে যদি চলে যায় যুগল, সেটা স্বর্গস্থিত ব্যক্তিটির নিশ্বাস ফেলাবার উপযুক্তই কাজ হবে।

'থাক না চুপচাপ।' ললিতা বলে, 'দেখ শেষ অবধি কি করে।'

'নতুন আর কি করবে, নালিশ করবে। করবে কেন, করছে।'

'করুক না, তুমিই বা কম কিসে যে হারবে !'

যুক্তি, তুলনা, উদাহরণ ইত্যাদি অনেক কাঠ খড় পোড়াল ললিতা এবং তৎফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যুগল, 'আচ্ছা দেখে নেব, দাদার লেখা উইল কেমন করে জাল প্রতিপন্ন করতে পারে দাদার অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে।'

ওদিকে নবনলিনী রোজ রাত্রে খুড়শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার নিয়ে স্বামীর কাছে অশ্রুবিসর্জন করে, এবং দিনের বেলা যতক্ষণ স্বামী বাড়ী থাকে, এমন ভিজে বেড়াল হয়ে ঘোমটা দিয়ে বেড়ায় যে, রাত্রের সেই ভিজে বালিশের সঙ্গে মিলিয়ে সুবল খুড়িকে পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধিনী বলে স্থির করে।

অবশ্য এ সব বর্ণনা বাহুল্য মাত্র।

কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জ্ঞাতি শত্রুঘটিত যত কিছু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটেছে, ঘটছে, এবং ভবিষ্যতে ঘটবে, তার মূল ইতিহাস এক, মূল সুর অভিন্ন। পার্থক্য যা কিছু, পরিবেশ আর পরিস্থিতির।

যুগল সুবলের পরিস্থিতি এখন এই, এক ভদ্রাসনে বাস করেও কেউ কারুর সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা, মুখ পর্যন্ত দেখে না। যেদিন যেদিন কোর্টে কেস্ থাকে, সুবল শেষরাত্রে বেরিয়ে গিয়ে সদরে ওর নিজের উকিলের বাড়ী গিয়ে বসে থাকে, পাছে কোন সূত্রে পথে দেখা হয়।

যুগল বেলায় বেরিয়ে একেবারে কোর্টে পৌঁছয়। পরস্পরের উকিল পরস্পরের নামে যথেচ্ছ কটূক্তি আর ব্যঙ্গোক্তি করে, এবং অদূর ভবিষ্যতে

আর একটা 'দিন' ফেলে।

দু'জনে দু' ট্রেনে আসে জ্বলতে জ্বলতে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ধান পান পুকুর বাগান সব এখন সরকার বাহাদুরের হাতে, দু'পক্ষ মাসে মাসে মাসোহারা পায় উক্ত বিচক্ষণ বাহাদুরের হাত থেকে।

এক অন্নের শর্ত আর মানা হচ্ছে না।

স্বরেনের পেটের গোলমালের কাহিনী সৃষ্টি করে নবনলিনী তার জন্যে আলাদা পুরনো দাদখানি চালের ভাত আর জীওল মাছের ঝোল রাঁধে, এবং একটি চালের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যায় বলে নিজের ভাতটাও তার সঙ্গে রাঁধে। আর জীওল মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে তারও নাকি গায়ের রক্ত হচ্ছে কাজেই—

ললিতা প্রথম প্রথম নবনলিনীর ভাত বেড়ে মেয়েকে বলে যেত 'এই তোর বৌদিকে বলিস ভাত বাড়া আছে দালানে।'

কিন্তু উপর্যুপরি সেই বাড়া ভাত বাড়াই পড়ে থাকত।

মিমলি এসে বলত, 'বৌদি বলেছে খিদে নেই, বৌদি বলেছে দাদার ভাত থেকে ভাত বেড়ে নিয়ে খেয়েছে, বৌদি বলেছে অত মাছ তরকারি খেলে ওর অসুখ করে।'

এইভাবে আইন বাঁচিয়ে অনেক কিছুই চলতে থাকে। যেমন ভদ্রাসনের মাঝখানে পাঁচিল পড়ানো চলবে না যতক্ষণ না মামলা মেটে, কিন্তু দড়ি টাঙানো যাবে না এমন কোন আইন নেই।

দালানের মাঝখানে দড়ি টাঙিয়ে সেই দড়িতে নবনলিনী কাপড় শুকোতে দেয়, উদবাস্তু ঝুলেই থাকে সে কাপড়। 'এক রাজা যায় তো অন্য রাজা হয়।'

ওদিকে উঠোনের মাঝখানে টানা লম্বা দড়ি টাঙিয়েছে ললিতা। সে দড়িতে দিনভোর ওর ঘরের মাদুর শতরঞ্চ কম্বল ঝুলতে থাকে। জিনিসগুলো নষ্ট হয় রোদে জলে ঝুলে। তা থাক, মুখ দেখাদেখি হওয়ার সমস্যাটা তো মেটে।

যুগলের মেয়েটা মাঝে মাঝে কম্বলের পাশ কাটিয়ে ওঘরে গিয়ে উঁকি মারে, 'কি সব চালাচ্ছ তোমরা বৌদি, আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

নবনলিনী বলে, 'যাও ভাই ওঘবে যাও, তোমাব মা টেব পেলে এক্ষুণি গালমন্দ কববেন।'

'খুড়িমা' আব বলে না, 'তোমাব মা' বলে।

ওঘবে গিয়ে দাঁড়ালেই ললিতা বলে। 'আবা্ব ওঘবে গিযে সেঁধিয়েছিলি হারহাবাতে লক্ষীছাড়া বেহাযা মেযে ?'

এমন করতে কবতেই মামলাব বাযেব দিন ঘনিয়ে আসে।

এই সব মুহূর্তেই দেবদেবীদেব প্রাপ্তিযোগ ঘটে। 'মানতে'বও বেষাবেষি চলে।

বিবদমান ছু'পক্ষই যখন জযমাল্যেব আবেদন জানিযে একই দেবতাব কাছে মানত কবে, তিনি তখন কি ভাবে কর্ম নির্ধাবণ কবেন, তিনিই জানেন। তবে 'দেশেব কালী', 'বাবাব থান' ইত্যাদিতে এমন হামেসাই ঘটে।

যুগল সুবলেব ব্যাপাবেও তা ঘটল।

ছু'জনেই 'বাবাব থানে' পূজো দেবাব তোড়জোড় চালাতে লাগল বাষ বেবোবাব আগেব দিন।

দিনটাও মোক্ষম সোমবাব চতুর্দশী বাবাব শ্রেষ্ঠ দিন।

এখান থেকে যেতে হলে শেষ বাতে বেবোতে হয়, যানবাহন বলতে গরুব গাড়ীই ভবসা।

সুবল গাড়ী ঠিক করতে এসে শুনল 'বঘুব' গাড়ী এই খানিক আগেই বায়না কবে গেছে।

বঘুব গাড়ীব বলদ জোড়াই এ অঞ্চলে বিখ্যাত পালোযান, কাজেই যুগলেব পূজো আগে পৌঁছে যাবে বাবাব চবণে। তাব মানে সবই ব্যর্থ।

সুবল ডবল মজুবি কবলে বঘুকে ভাঙাতে চেষ্টা কবল, কিন্তু বঘু অটুট। বলল, 'বলেন কি দাদাবাবু ? কথাব দাম বেশী না টাকাব দাম বেশী ?'

অতএব ওপথে হল না।

সুবলের শুভানুধ্যাযীবা বলল, 'অন্য পথ ধব, অন্য পথ আছে।'

কিচ্ছু না।

প্রাণ নিয়ে টানাটানিও না, কিছুই না। কোন প্রকাবে যুগলেব শবীব থেকে সামান্য একটু বক্তপাত ঘটাতে হবে। রক্তপাত ঘটলে 'বাবার' পূজো হয় না।

রক্তপাত!

সুবল একটু ভাবল, তারপর বলল, ঠিক আছে। বেশী কিছু অনিষ্ট না হয়।

কিছু না। পায়ের তলায় একটু কাঁচের কুচি ফোটাবার ব্যবস্থা করলেই হবে। আর সে ভার শুভানুধ্যায়ীই নিচ্ছে।

মহোৎসাহে পূজোর জোগাড়-যন্তর নিয়ে গাড়ীতে উঠল সুবল।

শুনল যুগল এই খানিক আগেই বেরিয়েছে। 'শুভানুধ্যায়ী'ও কিভাবে যেন 'বিশেষ দরকার' বলে রঘুকে বলে-কয়ে যুগলের গাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে। না নেবার কারণও নেই। কার সত্য মূর্তি কার কাছেই বা প্রকাশিত হয়? পাড়ার লোক ভদ্রলোক!

সে বরং সারা রাস্তা যুগলের কাছে সুবলের নিন্দাবাদ করতে করতেই যাবে।

ঈশ্বরের লীলা!

জিনিসপত্র নিয়ে যে পাণ্ডার বাড়ী উঠল সুবল, দেখা গেল ইতিমধ্যেই সে যুগলকেও আশ্রয় দিয়েছে।

ছ্যাচা বেড়ার ঘর, তার মাঝখানের পার্টিশনের ফাঁক থেকে দেখা যাচ্ছে যুগল ওঘরে শুয়ে আছে, তার পায়ের চেটোয় এতখানি ন্যাকড়া জড়ানো।

পুলকিত সুবল হাত তুলে বলে, 'জয় বাবা! দয়ার ঠাকুর তুমি!'

তারপর মনে মনে আঁচ করতে থাকে কতটা পারিশ্রমিক চাইবে শুভানুধ্যায়ী।

যুগলের পূজো দেওয়া হয়নি। রক্তপাত হলে হয় না।

পাণ্ডার হাতে উপচারগুলি ধরে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে সে, এবং কাঁচটা যে কিভাবে ফুটলো তাই ভাবছে।

হঠাৎ শুনতে পেল পাণ্ডাঠাকুর কার কাছে আক্ষেপ জানাচ্ছেন, 'এই দেখুন না কপালের ফের! একজন এল পূজো নিয়ে, কোথা থেকে কাচ ফুটে রক্তপাত হয়ে সব পণ্ড! না হবার হলে এমনি হয়।'

কিন্তু এ কি! উত্তরটা দিচ্ছে কে।

বড় পরিচিত গলাটা যে!

সুবল শয়তানটাও তা'হলে এইখানেই উঠেছে!

উঃ কত শয়তানি! আবার দুঃখু জানানো হচ্ছে। 'আহা তাই বুঝি! বড় দুঃখের কথা তো!'

আবার ভাবে, দুঃখু জানাবে না। কেন। অন্য লোক ভেবেই জানাচ্ছে। টের পেত যদি কাকা হতভাগা, আহ্লাদে দু'বাহু তুলে নাচত!

যাক আমি দেখাটি দিচ্ছি না।

শুয়ে শুয়েই টের পায় যুগল, সুবল পাণ্ডার সঙ্গে চলে গেল। পাণ্ডা গিন্নীর কাছে চাল ডাল তেল মশলা দিয়ে গেল খিচুড়ি পাক করে রাখতে। পুজো দিয়ে এসে খেয়ে তবে ফিরবে।

যুগলের পুজো দেওয়া হয়নি।

মনের আক্ষেপে ও আজ উপোসী থাকবে। গাড়োয়ান রঘুর জন্যেই তার ফেরার দেরী। রঘু স্নান পুজো সারবে, ভাত রেঁধে খাবে, তবে যাবে।

বেশ খানিক পরে হৈ-হৈ করে ফিরল সুবল। শুনল পাণ্ডাগিন্নী জানাচ্ছেন আহার্য্য প্রস্তুত।

যুগলের কৌতূহল অদম্য হল।

কি রেঁধেছে পাণ্ডাগিন্নী। চিরকেলে খুঁতখুঁতে সুবলের মনের মত হয়েছে তো? খুড়িকে তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেত বরাবর 'ওই ধুলো পড়েছে। ওই কালো হয়েছে। ওই হাত ধুলে না'—এই সব বলে।

পা ঘস্টে ঘস্টে এসে দরজার একটা কপাট বন্ধ করে আড় হয়ে বসল যুগল।

দেখল মেটে দাওয়ায় দিব্যি আঙট পাতা ভর্তি করে সোনার বর্ণ খিচুড়ি ঢেলে দিয়েছে পাণ্ডাগিন্নী, বড় বড় দুখানা বেগুন ভাজা, আলুর দম, চাটনি।

যাক্, ছোড়া এতখানি বেলা অবধি উপোসী থেকে তবু ভাল খাওয়াটা পাচ্ছে।

অন্যমনস্কে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যুগল।

সুবল বসল পাতের সামনে।

তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলে উঠল—'কাঁচা লঙ্কা নেই?'

যুগল মনে মনে হাসল, ওঃ বাবুর অভ্যেসটির এদিক ওদিক হবার তো নেই! ছোট থেকে-তো এক মুঠো কাচা লঙ্কা না হলে খাওয়া হয় না।

'কাঁচা লঙ্কা!'

পাণ্ডাঠাকুরও এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর বললেন, 'দেখছি।'

ঠাকুর মশাই ভিতরে চলে যেতেই সুবল হঠাৎ আপন মনেই বলে উঠল, 'আরে আমি কি গাধা! ওই তো ওখানে গাছ ভর্তি লঙ্কা!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠোনে নেমে বেড়ার ওধারে এগিয়ে গেল সুবল। লাল টুকটুকে স্বর্ণমণি লঙ্কা ফলে আছে গাছ আলো করে।

পটপট ছিঁড়তে লাগল সুবল, আর ঠিক—ঠিক সেই সময় ঘটে গেল ঘটনাটা। একেবারে যুগলের চোখের সামনে। যুগল অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল।

অথচ পিছন ফেরা সুবল টেরও পেল না।

চোখে সর্ষে ফুল দেখল যুগল।

এক্ষুণি সুবল এসে পরমানন্দে ওই পাতে বসবে!

হায় বাবা তারকনাথ! হতভাগা কি তাহলে আর বাঁচবে?

ওটা কাক নয়, দাঁড়কাক!

এই চতুর্দশীর ভর দুপুরে দাঁড়কাকের এঁটো খেয়ে কি বাঁচে মানুষ?

সুবল লঙ্কা নিয়ে হৃষ্ট মুখে এসে পিঁড়িটা একটু টেনে নিয়ে বসল।

পারল •।।

আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না যুগল। দরজার বাইরে বেরিয়ে এল সে। ঠোঁট কেঁপে গেল। গলা দিয়ে শব্দ বার করতে হল কষ্ট করে। তবু ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'সুবল! আমি তোর কাকা, আমি তোকে পায়ে ধরে নিষেধ করছি ও খিচুড়ি খাসনি।'

সুবল চমকে হাত গুটিয়ে এদিকে তাকাল!

যুগল আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে তেমনি ভাঙা গলায় বলল, 'দাঁড়কাক!'

না, সন্দেহের কিছু নেই।

পরম শত্রু কাকা মিছিমিছি তার খাওয়ায় হস্তারক হচ্ছে না। পাঁচিলে বসে দাঁড়কাকটা তখনও সেই মস্ত বেগুন ভাজার একখানা কায়দা করে বাগাচ্ছে।

পাতের চারপাশে ইতস্ততঃ খিচুড়ির কণা।

'দাঁড়কাকের উচ্ছিষ্ট খেলে সাতজন্মের পরমাই ক্ষয় হয় সুবল, মিনতি করছি তোকে- -'

কিন্তু এ কথাটা আর শেষ করতে পারে না যুগল, ততক্ষণে সুবল এসে আছড়ে পড়েছে যুগলের কাছে।

শুধু আছড়েই পড়েনি, জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে, আর চেঁচাচ্ছে—'কাকা—কাকা গো, আমি এই মান্তর বাবার থানে তোমার মৃত্যু কামনা করে এলাম!'

পাণ্ডাঠাকুর এক মুঠো লঙ্কা হাতে করে এসে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখেন তাঁর দুই খদ্দেরের একজন আর একজনকে সাপ্টে-পাপ্টে জড়িয়ে ধরে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদছে, আর সেই জন সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলছে, 'যেতে দে ওসব কথা; যেতে দে!'

তারপরের কথা সংক্ষিপ্ত।

রঘুর গাড়ীতেই দুজনে বাড়ী ফেরে।

যেতে যেতে যুগল মনে মনে মানত করে, এরপর একদিন বাবার থানে এসে খিচুড়ি রাঁধিয়ে দাঁড়কাক ভোজন করাবে।

অসুবিধে নেই।

ওখানে সব কাকই দাঁড়কাক।

॥ ওরা ভুল করেছিল

টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ঝনঝনিয়ে বাজল।

যেন একটা আর্তনাদ বাতাসের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ল। অনুতোষ শুনতে পেল। একবার—দুবার। উঠলনা

উঠবেনা। কি দরকার উঠে। আরো কত লোক বাড়ীতে। তাদের ডেকে কথা কইবার জন্যে আরো কত লোক জগতে। ওরা উঠুক। ওরা দেখুক। অনুতোষ উঠলনা। শুনতে পেল, মীরা ধরল। বলল 'কাকে চান?'

মীরা আবার বলল, 'আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি।'

কাকে ডেকে দিতে চাইল মীরা, তা' নিয়ে মাথা ঘামালনা অনুতোষ। কি দরকার ঘামিয়ে? আরো কত লোক বাড়ীতে।

অনুতোষ ভাবল আমি এখন দেওয়ালের ওই টিকটিকিটাকে দেখব। চুপ করে শুয়ে শুয়ে। মীরা কাকে ডেকে দিতে চাইল কি দরকার তা' জেনে।

মীরা অনুতোষকেই ডেকে দিল।

মীরার হাতে একটা পেন। হয়তো চিঠি লিখছিল মীরা। কিন্তু চিঠি কাকে লিখবে? মীরা ক্লাশের নোট্ টুকছিল হয়তো।

ঘরে এসে দাঁড়াল মীরা। বলল, 'দাদা, তোমাকে ফোনে ডাকছে।'

অনুতোষ উঠল। টিকটিকিটা দেয়ালের কোন দিকে সরে গেল, দেখলনা। উঠল। খাটের নীচে থেকে চটিটা পায়ে গলাল।

মীরা আবার বলল। 'নাম বলল না। বলল পার্ক নার্সিংহোম থেকে কথা বলছি।'

মীরা চলে গেল। অনুতোষকে কোন প্রশ্ন করল না। বলল না 'হঠাৎ

হসপিটাল থেকে আবার কে ডাকল দাদা?' বললনা। আর বলেও না। অন্তোষের সঙ্গে আগের মত করে আর কেউ কথা বলেনা। বলতে পারেনা। ওরা কুণ্ঠিত হয়।

মনে হয় ওরাই অপরাধী। ওদের ভাব দেখে ঠিক তাই মনে হয়। কিন্তু কেন মনে হয়? ওদের তাতে ভূমিকা কি? কিইবা ভূমিকা ছিল!

অন্তোষের স্ত্রী অন্তোষকে ছেড়ে চলে গেছে। তার জন্যে অন্তোষের বোন অপরাধী হবে কেন? অপরাধী হবে কেন অন্তোষের মা বাপ আর বৌদি? বিধবা বৌদি।

অন্তোষের দাদা মারা গেছেন কতদিন যেন। মনে পড়ছে না কতদিন। নোটবুকে লেখা ছিল অন্তোষের। নোটবুকটা হারিয়ে গেছে।

অন্তোষের বৌ অন্তোষকে ছেড়ে চলে যাবার পর, কেন কে জানে হয়তো শুধু শুধুই বৌদির কথা মনে হয়েছিল অন্তোষের।

বৌদি যদি ছেড়ে চলে যেতে চাইত? বৌদির শুধু রান্নাঘরটা আর ভাঁড়ার ঘরটা ছাড়লেই হত! কিন্তু অন্তোষের বৌদি ছেড়ে চলে গেল না। রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরে পাক খেতে লাগল। অন্তোষের বৌ অন্তোষের ঘুমের অবসরে ট্রেন থেকে নেমে চলে গেল।

'ট্রেনে এত ঘুম হয় তোমার?' বৌদি বলেছিল। উপহাস করে নয়, বিস্ময় প্রকাশ করে নয়, এমনি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ভাসা-ভাসা একটা প্রশ্ন করেছিল—'ট্রেনে এত ঘুম হয় তোমার?'

বৌদি ওই রকমই। ভাসা-ভাসা কথা বলে, ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। আর সারা সকাল সারা বিকেল সারা সন্ধ্যা নিঃশব্দে তাঁতির মাকুর ভঙ্গীতে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরে আনাগোনা করে।

ঝরণা ওরকম ছিল না।

অন্তোষের স্ত্রী ঝরণা। অতিরিক্ত রকমের জীবন্ত ছিল সে। অন্তোষের বড় ভাগ্নী কেয়া, বলতো, 'শুধু ঝরণা নয়, পাহাড়ী ঝরণা!'

পাহাড়ী ঝরণা! যা পাহাড় ভাসায়। কিন্তু উল্টো হ'ল।

'ভাল না লাগা', আর 'ভাল না বাসার' শিলা পাথর গুলো ভেঙে ক্ষইয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারলনা ঝরণা। নিজে ভেসে গেল।

কিন্তু কোথায় গেল?

এরা জানেনা। অনুতোষের মা বাবা, অনুতোষের বৌদি ভাগ্নী আর বোনেরা। কাঁটা হয়ে আছে ওরা। জিগ্যেস করেনা কোথায় গেল। উচ্চারণ করেনা কেন গেল। অনুমান ও জিগ্যেস করতে বসেনা। কি দরকার ছিল ওর যাবার! অনুতোষ ভাবতে বসেনা। কিন্তু অনুতোষ জানে। জানে ঝরণা কোথায় গেছে।

ঘুমুচ্ছিল অনুতোষ। ওর সেই ঘুমের অবসরে ট্রেন থেকে নেমে গেছে ঝরণা। কে জানে কোন ষ্টেশন সেটা। কে জানে কতটা রাত্তির ছিল তখন। তবু অনুতোষ নির্ভুল জানে ঝরণা কোথায় গেছে।

এরা জানেনা, অনুতোষ জানে। জানলে হয়তো বলতো 'পুলিশ লেলিয়ে দাও ওকে।' বলত 'ধরে এনে তালাচাবি দিয়ে রেখে দাও ওকে।' বলত 'নিয়ে এসে কেটে কুচি-কুচি কর ওকে।' কিন্তু ওরা জানেনা যে অনুতোষ জানে।

এরা শুধু আড়ষ্ট হয়ে থাকে অনুতোষের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলতে পারেনা। অনুতোষের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনা।

কিন্তু অনুতোষ জানে কেউ অপরাধী নয়। এটা শুধু একটা ঘটনা।

অথবা এটাকে একটা চেষ্টা বলা যেতে পারে। কে জানে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রান্তে একদা একটা উল্টো পাল্টা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল, ঝরণা চেয়েছিল সেটা সোজা করতে।

ঝরণার সেই চাওয়াটা কোন দোষ নয়। একটা ঘটনা মাত্র।

কিন্তু অনুতোষ কেন সহজ হতে পারছে না? তা হলে তো এরা বাঁচে। এরা তাহলে কাঁটা হয়ে থাকে না আর। মীরা টেলিফোনে ডাকটা জানিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করতে পাবে, 'হস্পিটাল থেকে আবার কে ডাকল দাদা?'

মীরা তা' পারে না।

অনুতোষ সহজ হতে পারেনা বলেই পারেনা।

আশ্চর্য্য। সহজ হওয়া কত শক্ত।

অনুতোষ উঠল।

চটিটা ঘসটাল। একটু শব্দ হল।

খারাপ লাগল শব্দটা। চটিটা ঠিক করে পরে নিল।

টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তুলে নিয়ে কানে লাগাল। বলল, 'কে কথা বলছেন, বলুন।' একটু থামল। শুনল।

হঠাৎ কি যেন হল। ভয়ঙ্কর একটা তোলপাড় উঠল। ভয়ঙ্কর একটা কলরোল। অনেক শব্দ, অনেক আর্ত্তনাদ। যন্ত্রটা কি খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু না, শব্দটা তো বাইরে থেকে আসছে না। কোথা থেকে তবে? ভিতর থেকে কি?

অনুতোষের হার্টের মধ্যে, লাংসের মধ্যে, ব্রেণের মধ্যে, অনুতোষের সমস্ত স্নায়ু শিরার মধ্যে ভীষণ কিছু একটা হয়ে গেল!

কিন্তু সে নড়ে উঠল না তো। এক ইঞ্চি নড়ল না। হাত থেকে রিসিভারটাও খসে পড়লনা অনুতোষের। হঠাৎ আশ্চর্য্য রকমের ঠাণ্ডা হয়ে গেল যেন। হ্যাঁ, আশ্চর্য্য রকমের ঠাণ্ডা।

ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া অনুতোষ ভাবল, সহজ হলে কেমন হয়। ভাবল আমি সহজ হবো। অদ্ভুত রকমের সহজ হয়ে গেল ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া অনুতোষ।

বলল, 'হ্যাঁ', আমিই অনুতোষ রায়। যা বলতে চান বলতে পারেন। উত্তরটা তার বেয়ে চলে আসছে। একটা হিম প্রবাহের মত কানের পর্দা ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

'চারিদিকে অনেক লোক। বুঝতে পারছেন, চারিদিকে অনেক লোক। বেশী কথা বলা যাবে না। আমি শুধু বলছি ঝরণা চলে যাচ্ছে। ঝরণা মারা যাচ্ছে। আপনি একবার চলে আসতে পারেন না? পারা অসম্ভব? জগতে 'অসম্ভব' বলে কি সত্যিই কিছু আছে? আমি তো ডাকতে পারলাম আপনাকে।'

অনুতোষ ভাবল তাই তো। ডাকতে পারল তো। সহজ হওয়া এমন কি শক্ত তাহলে। সুব্রত সেন তো পারল। পারল অনুতোষ রায়কে ডাকতে।

অনুতোষ সহজ হল। বলল, 'এক্ষুনি যাচ্ছি। রুম নাম্বার'—

'কেবিন। কেবিন নাম্বার টুয়েলভ্। দোতলায় ডানদিকে।'

অনুতোষ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

সমস্ত পরিবেশটার ওপর চোখ বুলোল। যেখানে যেমন ছিল অবিকৃত

রয়েছে। দেয়ালে ছবিগুলো ঠিক সোজা হয়ে ঝুলছে, বাইরের সেলফের ওপর মীরা যে ফুলগুলো সাজিয়ে রেখেছিল ছোট তামার ঘটিতে করে, সে ফুলগুলো তেমনি তাজা, ঘটিটা তেমনি ঝক্ ঝকে মাজা।

ওখানে টেবিলের ওপর আজকের টাটকা খবরের কাগজটা পড়ে আছে। অন্তোষের বাবার শাদা রবারের চটিটা টেবিলের তলায় পাশাপাশি বসে আছে। ওইটা পরে স্নান করতে যাবেন অন্তোষের বাবা। যাবেন, আবার ওইখানেই রাখবেন। কোন কিছুতেই নড়চড় হবেনা ওর। কোন কিছুতেই নড়চড় হয়না কারুর। এই মাত্র যে এখানে একটা প্রলয়ের ঝড় বয়ে গেল, কোথাও কোন চিহ্ন নেই তার। অন্তোষও এদের মত হবে। কোথাও কোন চিহ্ন ধরা পড়তে দেবে না।

ঘরে এল অন্তোষ। জামা গায়ে দিল। কি ভাবল। ড্রয়ারটা টানল। টাকাপয়সা নিল একমুঠো। বেরিয়ে এল।

মীরা সিঁড়ির সামনের ঘরে টেবিলের ধারে কাগজ কলম নিয়ে বসে আছে। হয় চিঠি লিখছে, হয়তো কলেজের নোট লিখছে। মীরা কাকে লিখছে? অন্তোষ নামছে।

মীরা উঠে এল। বললনা 'কি হল দাদা। কে এসেছে পার্ক নার্সিংহোমে?' বললনা, 'ও কি দাদা, এখন আবার কোথায় বেরোচ্ছ? ঠিক খাবার সময়?' মীরা শুধু বলল, 'ফিরতে দেরী হবে?'

অন্তোষ থমকাল। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'বলতে পারিনা। হওয়াই সম্ভব।'

মীরা বলতে পারতো, 'এত ব্যস্ত হয়ে চলেছ—কার অসুখ দাদা, অসুখ কি বেশী?' আগে হলে এই সব বলত মীরা। আরো অনেক বেশী বলত। মীরা কিছু বললনা। শুধু দাড়িয়ে থাকল অন্তোষ নেমে গেল।

অন্তোষ আশ্চর্য্য রকমের সহজ হয়ে গেছে।

ঝরণা শুয়ে রয়েছে।

ঝরণার চোখ বোজা, চুল খোলা।

ঝরণার বুক পর্য্যন্ত চাদর ঢাকা। ঝরণা চলে যাচ্ছে। ঝরণা মারা যাচ্ছে।

সুব্রত সেন বসে আছে বিছানার ধারে—টুলের ওপর। ডাক্তার জানালার ধারে বসে আছেন। পুরু গদীআঁটা আরাম চেয়ারে। নার্স অক্সিজেনের নলটা ধরে আছে। দাঁড়িয়ে আছে।

ওই নলটা ধরে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অন্তোষ পারেনা। সুব্রত সেন পারেনা, মীরা পারেনা। নার্স পারে।

ঘরের বাতাসে গ্যাসের গন্ধ। ঝরণা চলে যাচ্ছে। এক্ষুনি মারা যাচ্ছে। তবু ওরা গ্যাসের নলটা ধরে আছে।

তাই থাকা নিয়ম। তাই থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঝরণা তার সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তির শেষ বিন্দুটি অবধি নিঃশেষ করবে।

খালি টুল ছিল আর একটা।

অন্তোষ বসল।

সুব্রত সেন চোখের ইসারায় বসতে বলল। অন্তোষ ঝরণার মুখের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে বসে রইল।

মুখটা ঝরণার বলে মনেই হচ্ছেনা। কে জানে। এ হয় তো ঝরণা নয়। এ হয় তো আর কেউ। এ একটা সিনেমার ছবি। অন্তোষ দেখতে এসেছে। ছবিতে এখন নায়িকার মৃত্যুর দৃশ্য চলছে। এ দৃশ্যে সংলাপ নেই। এ দৃশ্য শেষ হয়ে গেলেই দর্শকেরা উঠে পড়বে। ডাক্তার, নার্স, অন্তোষ রায়, সুব্রত সেন। যারা দর্শক, যারা অপলকে দেখছে বসে বসে।

ঝরণার জ্ঞান নেই। আর কোনদিন জ্ঞান আসবেনা। ঝরণা মারা যাচ্ছে।

অন্তোষের ঘুমের অবকাশে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল ঝরণা, বাঁচবে বলে। খুব ভাল করে খুব বেশী করে বাঁচবে বলে। বাঁচল না।

ঝরণা কোন অপরাধ করেনি।

ঝরণা শুধু বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু ঝরণা মারা গেল। সুব্রত সেন তাকিয়ে বসে রইল। প্লাটফর্ম থেকে সুব্রত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ঝরণাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিতে, মৃত্যুর ঘর থেকে জীবনের ঘরে নিয়ে যেতে। পারল না।

সুব্রত পারল না। সুব্রত কিছু করতে পারছে না, ঝরণাকে তলিয়ে যেতে দিচ্ছে মৃত্যুর অতল তলায়।

অন্তুতোষ? অন্তুতোষ কি করবে।

নলটা নামিয়ে রাখল নার্স।

চোখের ইসারা করল ডাক্তারকে।

ডাক্তার কাছে উঠে এলেন। বললেন 'এবার বাইরে যেতে হবে।'

সুব্রত সেনকে বললেন। অন্তুতোষ রায় শুধু শুনল। দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল।

অন্তুতোষ সুব্রতকে কিছু বলল না। সুব্রতও অন্তুতোষকে কিছু না।

সুব্রত জানে এখন তাড়াতাড়ি আর কিছু করবার নেই। জানে অপেক্ষা করতে হবে। হয় তো এক বেলা। হয় তো পুরো একটা দিন।

এখন লাশ মর্গে যাবে। আত্মহত্যার লাশের তাই নিয়ম।

অন্তুতোষ কিছুই জানেনা। জানেনা ঝরণা কেন মারা গেল। জানেনা বাঁচতে চেয়ে কেন বাঁচতে পারল না। কিন্তু অন্তুতোষ সে কথা কাউকে জিগ্যেস করতে পারবে না। ও শুধু সুব্রত সেনের সঙ্গে ঘুরবে। ছায়ার মত। নিঃশব্দ পদক্ষেপে।

সুব্রত যদি বলে, অন্তুতোষ বাবু আপনি এবার যান।' অন্তুতোষ আস্তে আস্তে চলে যাবে। জিগ্যেস করবেনা, কি হয়েছিল ঝরণার।

যদি দেখতো ঝরণার চুলগুলো বাঁধা, চোখ দুটো খোলা তাহলে ঝরণাকেই জিগ্যেস করতো। বলত। 'আবার কি হল ঝরণা? আবার সব উল্টোপাল্টা করে ফেললে কেন? তুমি তো বিধাতার উল্টোটাকে সোজা করে নিয়েছিলে।'

বলত, 'ঝরণা, যদি জানতে পারতাম তুমি বেঁচে আছ, বেঁচে গেছ, আমি সুখী হতাম। সুখী হবার চেষ্টা করতাম। এই তো সহজ হয়ে গেলাম আমি। পারলাম, শক্ত লাগল না। তবে তুমি একি করলে?'

কিন্তু বলবার অবকাশ পেলনা অন্তুতোষ। সে এসে দেখল ঝরণার চোখ বোজা, চুল খোলা। দেখল ডাক্তার গদিআঁটা আরামচেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছেন।

এখন ডাক্তার উঠে এলেন। ওদের বললেন, 'এবার বাইরে যেতে হবে।'

বাইরে চলে এল সুব্রত। নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। অন্তুতোষও তাই করল। ওরা চলে এল অপেক্ষা করবার ঘরে। লাশকাটা ঘরে যে লাশকে চালান করে, তাদের আত্মীয়দের অপেক্ষা করবার জন্যে আলাদা জায়গা আছে। আছে, কারণ কর্তৃপক্ষ জানেন অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে ওদের। যারা মরবার

আগে চিঠি লিখে যায় জানিয়ে যায় 'আমি স্বেচ্ছায় মরছি' তা'দের আত্মীয়দের তবু কপাল ভাল। পুলিশ এসে জেরবার করেনা। তাদের কাছে পুলিশ শুধু বিবৃতি নেয়।

লম্বা কাঠের বেঞ্চ। এদিকে ওদিকে।

ওদিকের বেঞ্চে আরও দু'জন বসে আছে। খোঁচা দাড়ি—আধাবয়সী ভদ্রলোক একজন, আর একটি কমবয়সী ছেলে।

ওই ভদ্রলোকের ও ছোট ছেলে। বড় ছেলে মারা গেছে।

আত্মহত্যা করেছে। বি. এ এগজামিনে ফেল করেছে বলে। পুলিস ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছে। বলেছে, ফেল করার জন্য বাড়ী থেকে তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে কি না? তিরস্কার করা হয়েছে কি না?

কিছু না। কিছু না। কেউ কিছু বলেনি।

ভদ্রলোক ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

এরা কাঁদবেনা।

এরা সভ্য, শিক্ষিত সংযমী। শোক কাদাবে এমন গ্রাম্য নয়।

এদিকের বেঞ্চে বসল সুব্রত। অনুতোষও বসল। পাশাপাশিই বসল। ইচ্ছে করলেই অনুতোষ এখন পিছ থেকে হাত বাড়িয়ে সুব্রতর গলাটা জোরে টিপে ধরতে পারে। জোরে, আরো জোরে। টিপে ধরেই থাকবে, যতক্ষণ না আর কেউ এসে ছাড়িয়ে নেবে।

কিন্তু অনুতোষ তা'করলনা। শুধু বসে থাকল।

সুব্রত পকেট থেকে একটা চিঠি বার করল। অনুতোষের হাতে তুলে দিল। বলল, 'আপনার জন্যে রেখেছিল।'

অনুতোষ হাতে নিল। বন্ধ খামটা খুলল না পকেটে রেখে দিল।

সুব্রতর গলা কাঁপছিল। বলল, 'ওটুকু পড়ায় দোষ কি? কিই বা ক্ষতি?'

অনুতোষ যেন হাসল। অন্ততঃ তাই মনে হল সুব্রতর। যেন হেসে বলল, 'পড়ে ফেললেই তো দোষ। এত লোকের ভীড়ে, পড়াই তো ক্ষতি।'

সুব্রত কি একটু চমকাল?

বোধ হয় চমকাল।

একটু চুপকরে থাকল। তারপর বলল, 'ঝরণা ভুল করেছিল। আমি ভুল করেছিলাম। আশ্চর্য্য, আপনিও ভুল করেছিলেন। কি করে করেছিলেন?'

অনুতোষ বলল, 'ভুল করবার সময় মানুষ ভুলটাকেই ঠিক ভাবে যে! তাই তো করে। তাই তো পারে ভুল করতে।'

সুব্রত নিশ্বাস ফেলল। বলল 'ঝরণা যদি প্লাটফর্মে নেমে আবার একবার গাড়ীর কামরায় না তাকাতো।'

অনুতোষ বলল, 'আমিও এই তিন মাস ধরে শুধু ওই কথাই ভেবেছি। যদি না তাকাতো।'

সুব্রত বলল 'তা'হলে হয়তো এমন করে মরতে হতনা ঝরণাকে।'

অনুতোষ চুপ করে থাকল।

সুব্রত আস্তে বলল, 'ট্রেন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ও বলল আমাকে।'

অনুতোষ কি যেন ভাবছিল। চমকে উঠল। 'কি বলল?'

সুব্রত নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল, বলল 'অনুতোষ ঘুমোচ্ছিল না। বলল—ও আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। আমাদের দেখছিল।'

অনুতোষ নিশ্বাস ফেলল, 'আপনি তো বলতে পারতেন ওটা চোখের ভ্রম।'

সুব্রত বলল। 'সহস্রবার বলেছি। এই তিনমাস ধরে শুধু ওই কথাই বলেছি। কারণ আমারও আগে নিশ্চিত ধারণা ছিল ওটা চোখের ভ্রম। কিন্তু হাজারবার বলেও সে কথা মানাতে পারলাম না তাকে।'

অনুতোষ বলল। 'মানুষ যখন ভুল করে মনে করে ঠিক করেছি। আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

সুব্রত বুঝি একটু উত্তেজিত হ'ল। শেষ পর্যন্ত ওর কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম আমি। ও অপ্রকৃতিস্থের মত হয়ে গেল। অনবরত বলতে লাগল '—আমাদের দিকে চেয়ে থাকা অনুতোষের নিশ্চল চোখ দুটো আমার মাংস ভেদ করে হাড়ের মধ্যে কেটে কেটে বসে গেছে। ওই চোখকে আমি ভুলে ফেলতে পারছিনা, উপড়ে ফেলতে পারছিনা। কি করে তবে বাঁচবো আমি।'

অনুতোষ আবার নিশ্বাস ফেলল। বিড বিড করে বলল, 'মানুষ যখন ভুল করে, মনে করে ভয়ঙ্কর ঠিক করছি। আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

সুব্রত দম নিল।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

তারপর বলল, 'ও আপনাকে সব বলতে বলছে তাই বলছি। আমাকে

বলতেই হবে। আপনি যদি রাগ করে উঠে যান, যাবেন। যদি বসে থাকেন আমি বলে যাব।'

অনুতোষ বলল। 'আমি তো উঠে যাচ্ছিনা।'

'না আপনি উঠে যাচ্ছেন না। আপনি আমাব ডাকে এসেছেন। আপনি মহৎ। কিন্তু ঝরণাকে সে কথা বলিনি আমি। হ্যাঁ, আপনার সামনেই বলছি, শেষেব দিকে রেগে যেতাম আমি। বলতাম যে স্বামী চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে পরপুরুষেব হাত ধবে স্ত্রীব কুলত্যাগ কবা দেখতে পারে, সে স্বামীব দৃষ্টি তোমাব হাডেব মধ্যে কেটে বসে? লজ্জা কবেনা তোমাব?' ও তখন পাথবেব মত স্তব্ধ হয়ে যেত। কথা বলত না, কাঁদত না।

অনুতোষ চমকাল। বলল 'ও কাঁদত?

'মাঝে মাঝে।' বলল সুব্রত।

'ও আগে কখনও কাঁদত না।' বলল অনুতোষ।

সুব্রত বলল 'আমি বুঝতে পেরেছিলাম। পরে সে কথা বুঝতে পেরেছিলাম আমি। আমাব কথা ভেবে ও কাঁদেনি কোনদিন। ও পুবনো ভালবাসা ভুলে গিয়েছিল। নতুন কবে ভালবাসতে সুরু কবেছিল। স্বামী, সংসাব পরিজন সবাইকে। প্রচণ্ডভাবে ভালবাসছিল। হঠাৎ কেমন কবে যেন ভুল কবে বসল। নিজেকে, নিজেব পবিবর্ত্তনকে বঝতে পাবল না।'

অনুতোষ মাথাব বড় বড় চুলগুলোব মধ্যে আঙ্গুল চালাল। মুঠো কবে চেপে ধরল।

সুব্রত আবাব রুমাল নিল। ঘাড়েব ঘাম মুছল। বলল, 'তবু শুনুন, ঝরণা মাবা গেল নিজেব ভুলে নয়। আমাব ভুলে নয়, ঝরণাব স্বামীর ভুলে। অনুতোষ বায়েব ভুলে। এই কথাটাই বলবাব ছিল আমাব।'

অনুতোষ চুলটাকে আবো চেপে ধবল। বলল, 'হ্যাঁ স্বীকার করছি। আমাব ভুলে মারা গেল ঝরণা। কিন্তু ঝবণা বেঁচে থাকতে ফোন্ করা কি অসম্ভব ছিল?'

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। আলস্য ভাঙল। মাথাটা ঝাঁকাল। বলল 'অসম্ভব বৈ কি। মানুষ যখন চলে যায়, মরে যায়, তখনই শুধু লজ্জা চলে যায়। তখনই শুধু সহজ হওয়া আর শক্ত থাকে না।'

অনুতোষ হঠাৎ চুল ছেড়ে দিল। সেই হাতে সুব্রতর হাতটা চেপে ধরল।

বলল, 'ঝরণা চলে গেছে, মরে গেছে। তাই আর লজ্জা করবনা। আপনার কাছে তাই ঝরণাকে চেয়ে নেব।'

'ঝরণাকে চেয়ে নেবেন?' অবাক হল সুব্রত। নির্বোধের মত তাকিয়ে রইল।

'ঝরণাকে নয়, ঝরণার মূর্ত্তিকে। অনুতোষ বলল, এই পৃথিবীতে তেইশ বছর ধরে যে মূর্ত্তিটাকে ঝরণা বলে ডাকা হয়েছে সেই মূর্ত্তিটাকে—আপনার কাছে চাইছি আমি।'

সুব্রতর চোখ দিয়ে জল পড়ল। গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল। রুমাল দিয়ে মুছল সুব্রত, বলল, 'মানুষ ঠিক ভেবেই ভুল করে! তবু এত ভুল করে?'

'ঝরণা এসেছে।' বাড়ী ঢুকে বলল অনুতোষ। 'ঝরণা এসেছে!'

অনুতোষের মা শুধু বোকার মত উচ্চারণ করলেন, 'ঝরণা এসেছে! ছোট বৌমা!'

'ওর বিয়ের শাড়ীটা চাই।' বলল অনুতোষ।

'বিয়ের শাড়ীটা চাই?' শান্ত মীরা চেচিয়ে উঠল। বলল 'বিয়ের শাড়ীটা চাইতে এসেছে ছোট বৌদি?'

'ও নয় আমি।'

'হ্যা, হ্যাঁ, তুমি! তোমার লজ্জা করল না দাদা?'

অনুতোষ হেসে উঠল। বলল 'আর লজ্জা কি? মানুষ চলে গেলে, সব লজ্জাই তো চলে যায়।'

'অনু! অনুতোষ।' চেঁচিয়ে উঠলেন মা!

'দাদা!' চেঁচিয়ে উঠল মীরা। সমস্ত বাড়ীটাই চেঁচিয়ে উঠল। ঝনঝনিয়ে উঠল। সকাল বেলা যেমন করে টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠেছিল।

তারপর সব কিছুই আশ্চর্য্য রকমের সহজ হয়ে গেল। মীরা ঝরণার বিয়ের জরিমোড়া লাল শাড়ীটা আনল। পরিয়ে দিল। খোলা চুলগুলো বেণী করল। চন্দন পরাল গালে কপালে। অনুতোষের মা কাঁপাকাঁপা হাতে সিন্দুর পরিয়ে

দিলেন সিঁথিতে।

অনুতোষের বাবা নিঃশব্দে দোতলা থেকে নেমে এসে মাথার কাছে দাঁড়ালেন। বললেন 'শান্তি, শান্তি, ওঁ শান্তি।' চলে গেলেন। দোতলায়, উঠে গেলেন।

অনেক ফুল আর ফুলেব মালা সুব্রত দিয়েছিল। খাট ভরে গিয়েছিল। তবু বড়বৌ নেমে এল রাস্তায়। ভাসা-ভাসা ছাযা-ছায়া মূর্ত্তিতে।

মুঠোটা খুলল।

একটা গন্ধরাজ ফুল, কে জানে কোথা থেকে এনেছে, নামিয়ে রাখল ঝরণার খাটে।

তারপর আস্তে আস্তে বলল 'আমায় কেউ ফুল দেবে না।'

বলল 'মরাটা বেঁচে যাওযা। মবাটাই জিতে যাওযা। আমি বাঁচতে পারিনি। আমি হেবে গেছি আমি ভুল কবেছি।'

॥ অবস্থা বুঝে

হাতের মালা বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাতে ঘোরাতে নিভাপিসি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠেন, 'সব সইতে পারি, বুঝলি শশী, সইতে পারিনে শুধু ওই ছোড়া-ছুঁড়িগুলোর দোহাত্তা 'লভে' পড়া! ছি ছি! সমাজ সংসার কী সব রসাতলে গেল গা! গার্জেনরা একটা প্রিতিবাদ করে না! বলি শশী, তুই তো শুনতে পাই এই ফেলাটগুলোর কেয়ার অব্—'

'কেয়ার অব নয় পিসি', শশীপদ বিনীতভাবে বলে, 'কেয়ার টেকার।'

'থাম শশী, তুই আর আমাকে নতুন কথা শেখাতে আসিসনে। বলে জন্মকাল জেনে এলাম কেয়ার অব্, এখন শেখাতে এল টেকার চেকার। বেশ, নয় তাই হলি, বলি সেটা একটা দাযিত্বর কাজ তো? ফেলাটের ভালমন্দ দেখবি তো? এই লভে পড়াপড়ির একটা প্রিতিকার করবি না?'

শশীপদ মৃদু হেসে বলে, 'আমার প্রতিকারের দায়িত্ব ছাত থেকে জল পড়লে, কি কল থেকে জল না পড়লে। ওসব লভে পড়াপড়ির আমি কি প্রতিকার করবো?'

'করবি না!' নিভাপিসি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, 'সমাজ রসাতলে যাক?'

'গেলে আর আমি কি করতে পারি?' শশীপদ বলে উদাস মুখে।

'দেখ শশী, সব সইতে পারি, তোদের ওই গা এলানে কথা সইতে পারিনে। তুই কড়া নোটিস দে যে, "এ হচ্ছে সরকারী কোয়াটারস্; এখানে ওসব ছ্যাবলামি ফাজলামি চলবে না।" দেখি গার্জেনগুলো কেমন না গা করে

শশীপদ বলে, 'অমন কোন নোটিস দেবার আইন নেই।'

'থাম শশী, তুই আমায় আইন বোঝাতে আসিসনে। বলে কত আইন

অমান্যি দেখলাম। ওই আইন অমান্যি করে করেই লোকে স্বরাজ পেল, আর এখন আসছে আমায় আইন দেখাতে! তুই না পারিস, ও তোর গিয়ে আইন আমাকেই হাতে নিতে হবে।'

'সর্বনাশ করেছে' শশীপদ সভয়ে বলে, 'তুমি আবার আইন হাতে নেবে কি? তোমার হাতে বাপু শুধু এই হরিনামের মালাই শোভা পায়।'

'দেখ শশী, সব সইতে পারি, তোর এই আদিখ্যেতা সইতে পারিনে। হরিনামের মালাই শোভা পায়। খুব তো বললি। বলি নিশ্চিন্দি হয়ে হরিনাম করতে দিচ্ছে ওরা? চব্বিশ ঘণ্টা সিঁড়ির জানলায় চোখ পেতে বসে থাকতে হয় না আমায়? দেখতে হয় না, কাদের মেয়ে কাদের ছেলের সঙ্গে লেকে যাচ্ছে, পার্কে যাচ্ছে, সিনেমায় যাচ্ছে!'

'বল কি পিসি, তোমায় দেখতে হয়?'

'হবে না?' নিভাপিসি মালার গতি আরও দ্রুত করে বলেন, 'সবাই চক্ষু মুদে অন্ধ হয়ে থাকছে বলে, আমাকেও তাই থাকতে হবে? প্রিতিকার চিন্তা করতে হবে না?'

শশীপদ সকাতরে বলে, 'ওর আর প্রতিকার হবে না পিসি, ছেড়ে দাও। বরং জানলা থেকে সরে এসে পুজোর ঘরে বসে মালা জপো।'

'পুজোর ঘরে বসে মালা জপবো? বাঃ, বেশ! ভ্যালা আমার বিধেনদাতা এলেন রে! বলি হরিনাম হবে? প্রাণের মধ্যে হাঁকপাঁক করবে না? আশে-পাশে ধারে কাছে মেয়ে-ছেলেগুলো দোহাত্তা লভ্ করবে, আর আমি পুজোর ঘরে বসে মালা ঘোরাবো? বলি শশী, রক্তমাংসের মানুষ বই তো পাথরের পুতুল নই? আমি বলছি তুই নোটিস দে। কড়া চাবুক মেরে নোটিস দে। দেখি রঙ্গিণীরা জব্দ হয় কিনা।'

শশীপদ হতাশ কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু পিসি, কই, আমাদের চোখে তো কখনো ওই সব লভ্‌টভ্ পড়ে না?'

'পড়ে না! তা জানি। পড়বে কোথা থেকে? চক্ষু থাকতেও অন্ধ যে! চোখকান খোলা রাখলেই টের পাবি ওই চার নম্বরের ফেলাটের সঙ্গে সাত নম্বর, পাঁচ নম্বরের সঙ্গে আট নম্বর, তিন নম্বরের সঙ্গে—'

'থাক থাক পিসি', শশীপদ ব্যস্ত হয়ে বলে, 'ধরে নিচ্ছি সব নম্বরের সঙ্গে সব নম্বর, কিন্তু করা যাবে কি? চোখকান বুজে সয়ে যেতেই হবে। যে

কালের যা।'

'থাম শশী, তুই আর আমায় কালের ধর্ম শেখাতে আসিসনে—' নিভাপিসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'বলে ওই তোদের কালের মুখ চেয়ে কত সওয়াই সইছি এই যে এখানকার বউ-ঝিগুলোর হায়া নেই, লজ্জা নেই, মাথায় কাপড়ের বালাই নেই, গোবর গঙ্গাজলে ছেদ্দা নেই, গুরুগোবিন্দয় মন নেই, কাজের মধ্যে শুধু ধিঙ্গীনাচ নেচে বেড়ানো, দেখছি না এসব চেয়ে চেয়ে? সইছি না মুখ বুজে? এই তো আমারই ঘরের বউ, পাঁচ ছেলের মা, গিন্নী, বড় মেয়েটার সময়ে বিয়ে হলে এতদিনে দুটো নাতি নাতনী 'দিদিমা দিদিমা' করে বেড়াতো, তিনিও চুলের গোড়ায় লাল রেবনের ফুল উড়িয়ে যাচ্ছেন কেলাবে, যাচ্ছেন সাঁতারে, যাচ্ছেন নাচের ইস্কুলে! প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে দেখছি আর হরিকে ডাকছি, হরি হে পার করো। তবু বলে 'আরও সও। সব সইতে পারি শশী, কিন্তু পারিনে ওই 'লভে' পড়াপড়ি সইতে! সকল নম্বরের কাণ্ডকারখানা দেখি আর ভয়ে মরি, বলি, হে হরি, আমার নাতনীটার যেন মতিবুদ্ধি ভাল থাকে।'

নিভাপিসির নাতনীর 'মতিবুদ্ধি' সম্পর্কে শশীপদ ওয়াকিবহাল, তাই সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা গোপন করে ফেলতে হয় তাকে।

নিভাপিসি আবার নামের মালায় মনঃসংযোগ করে বলেন, 'ভালমতন একটা পাত্তরের সন্ধান দে দিকি শশী, আমি থাকতে থাকতে মেয়েটাকে পার করি। নইলে যে গা হালকা ওর মা বাপ, বিয়ের কথা তুলবেই না। পাস করে বেরোলেই বলবে, "যা চাকরি কর গে যা।" সব সইতে পারি শশী, এই মেয়েগুলোর ধেইধেই করে চাকরি করতে যাওয়া সইতে পারিনে। তেমনি হয়েছে মা-বাপগুলো, মেয়ে ছেলে বড় হলে যে বিয়ে দিতে হয়, এ কথা যেন বিস্মরণ হয়ে গেছে।'

শশীপদ হেসে বলে, 'তা বড়ই যখন হচ্ছে, তখন নিজেদের বিয়ের কথা নিজেরাই ভাবুক না পিসি! ধরে ধরে যা হোক একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়াই কি ভাল? মনের মিল হবে কি না হবে—'

'তুই থাম শশী', নিভাপিসি হাতের মালা সবেগে আছড়ে থলির মধ্যে পুরে ফেলে বলেন, 'আর হাড়-জ্বালানো কথা বলিসনে। মনের মিল! মনের মিল না হয়ে বিদ্যেসাগরের চলল, ভূদেব মুখুয্যের চলল, রামমোহন রায়,

দ্বারকানাথ ঠাকুরের চলল, চলবে না শুধু তোদের এই রাজ্যপদ পাওয়া ছেলেমেয়েগুলোর? বলি মনের মিলের বিয়ে করে করে দেশের দশের কী উপকারটা করছে শুনি?'

শশীপদ অবাক হয়ে বলে, 'দেশের দশের আবার কি উপকার করবে? নিজেরাই সুখে শান্তিতে থাকবে—'

'তুই থাম শশী, সব সইতে পারি, তোর ওই পাকামি সইতে পারিনে। সুখে শান্তিতে! বলে শান্তি কথাটাই পৃথিবী থেকে উপে গেল, এখন আমায় এসেছে শান্তি দেখাতে! যে সুখ-শান্তির বড়াই করছিস শশী, সে বস্তু পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গেরও আছে। ঝ্যাটা মারো! মনের মিল! বলি মনের কোনও ঠিকঠাক আছে? সে আজ বলবে একে চাই—কাল বলবে ওকে চাই। সুবিধে পেলে পরশু বলবে তাকে চাই! তখন কিসের বড়াই করবি শুনি? সব সইতে পারি শশী, তোদের এই বড়াই সইতে পারিনে। তুই আমার নাতনীটার জন্যে একটা পাত্তর দেখে দে দেখি!'

শশী কষ্টে হাসি চেপে বলে, 'কেন, তোমাদের ওই বারো নম্বর ফ্ল্যাটের জজ-সাহেবের ছেলেই তো রয়েছে সামনে। বাজারের সেরা পাত্তর। যেমন রূপ, তেমনি বিদ্যে, তেমনি টাকা, তেমনি—'

'তুই থাম শশী', নিভাপিসি ব্যাজার মুখে বলেন, 'সব সইতে পারি, পারিনে শুধু তোর ওই খোকামি! আমার ছেলে করবে জজের ছেলেকে জামাই? তাও যদি মেয়ের রূপ থাকতো!'

শশী হেসে বলে, 'রূপেতে কী করে বাপু গুণ যদি থাকে?'

'গুণ!' নিভাপিসি দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, 'থাক শশী ও আলোচনা। কোন ফাঁকে আবার বউমার কানে যাবে। বউমা আবার নেয্য কথা একেবারে সইতে পারে না। ওই যে আসছেন।'

নিভাপিসির বউমা এসে দাঁড়ান।

দু' কাঁধে দুটি বেণী, কোমরে খুঁট গোঁজা—আঁটসাঁট করে শাড়ি পরা, পায়ে হাওয়াই চটি, গায়ে নাইলন ব্লাউস।

অদূরে ভাঙা-ভাঙা গলায় নিভাপিসির বউমা বলেন, 'মা, বেবির তো কাল জন্মদিন, পায়েসের দুধ কি পাঁচ সের বলে দেব, না আরও বেশী?'

নিভাপিসি ব্যাজার মুখে বলেন, 'যা ভাল বোঝ কর বাছা। পাঁচ সের

দুধের পায়েস যে কে খাবে তাও তো জানিনে।'

'ওমা সে কী, জানেন না? ইস্—' বউমা অপ্রতিভের ভান করে বলেন, 'বলতে একদম ভুলে গেছি, এই সব ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়েদের, মানে ওদের সমবয়সীমতনদের নেমন্তন্ন করেছি যে!'

'হরি বল মন, মদনমোহন!' নিভাপিসি গালে হাত দিয়ে বলেন, 'এত বড় একটা যজ্ঞি ফাঁদছ, তার কিছু জানি না আমি। কালে কালে কতই হবে। বলি বউমা, ওই জজের ছেলেটাকে নেমন্তন্ন করেছ?'

'ওমা করব না আবার! ও তো আগে!' বউমা বিগলিত হাস্যে বলেন, 'বড় খাসা ছেলে! আপনার সঙ্গে চেনা করিয়ে দেব।'

নিভাপিসি বলেন, 'থাক বাছা, আমার আব চেনা করায় দরকার নেই। কত যে গুণের ছেলে, তা আর ধরে করে বোঝাতে হবে না আমাকে। সব সইতে পারি বউমা, শুধু তোমাদের ওই বড়লোক ঘেঁষাপনা সইতে পারিনে। বলি আমার নাতনীর জন্মদিনে জজের ছেলে কেন? দামী একটা প্রেজেন্টো দিয়ে নাথ।কনবে বলে। মরুক গে, শশী, তুই তা হলে কাল আসিস। ভাল মন্দ দুটো রান্নাবান্না হবে!'

শশী ত্রস্তেব্যস্তে বলে, 'আমাকে আবার কেন? আমি ওই সব ছেলে-ছোকরার মধ্যে—'

নিভাপিসি দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, 'সেই জন্যেই তো আবও আসা দরকার! তুই হচ্ছিস কেয়ার অব্—'

'কেযার অব্ নয় পিসি, কেযার টে—'

'থাম তুই শশী—যা বলছি শোন। কাল আসবার সময় শ কড়া করে একটা নোটিস লিখে আনবি। পষ্ট পষ্ট করে লিখে দিবি, এই সরকারী কোয়ার্টারে ওসব লভ্ ফভ্ চলবে না। সেই নোটিস ঝুলিয়ে দিবি ওদের নাকের সামনে। বউমারও শখ কম নয়, যত রাজ্যের লভে-পড়া ছেলেমেয়েকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে জড় করছেন! আমার নাতনীটার মতিবুদ্ধি একটু ভাল আছে, সেটাকেও উচ্ছন্ন দেবে আর কি! শশী, তুই ওই নোটিসে ও-কথাটাও ঢুকিয়ে দিস!'

'কোন্ কথা পিসি?'

'ওই যে এ নম্বরে সে নম্বরে অত ঘটঘটি চলছে বাড়ি ছাড়বার নোটিস

দেওয়া হবে।'

'কী মুশকিল, ও-কথা লেখবার যে আইন নেই পিসি—'

'থাম শশী, ফের আমায় আইন দেখাতে আসছিস? সব সইতে পারি, ওই আইন দেখানো সইতে পারিনে। নোটিস তুই আনবি। কেয়ার অব্ হয়ে, কেয়ার করবি না ছেলেপিলেগুলো উচ্ছন্ন যাচ্ছে কি না?'

মালাগাছটা আবার থলি থেকে টেনে বার করে জোরে জোরে ঘোরাতে থাকেন নিভাপিসি।

শশী ও-ঘরে গিয়ে বলে, 'নিন বউদি, এখন বুঝুন ঠেলা? উচ্ছেদের নোটিস লিখে আনবার হুকুম হয়েছে।'

নিভাপিসির বউমা মুখ টিপে হেসে বলেন, 'এনো।'

'তা'পর? তাতে পিসির নিজের ঘরেই তো আগে লালবাতি জ্বলবে।'

'জ্বলুক না!'

'কাল যা ঘট লাগাচ্ছেন শুনছি, ব্যাপারটা প্রকাশ না পেয়ে কি আর ছাড়বে?'

বউদি মৃদুহাস্যে বলেন, 'প্রকাশের জন্যেই তো করা! কাল তো ওদের এনগেজমেন্টের মতই হবে একটা কিছু—'

'যা দেখছি, নিভাপিসি কাল কাশী চলে যাবেন।'

বউদি শুধু একটু মৃদু হাসি হাসেন।

'আমার কিন্তু আসতে একটু দেরি হবে।'

'তা হোক, কিন্তু এসো অবিশ্যি করে।'

তা শশীপদ আসে অবিশ্যি করে।

তবে ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে।

বাজে কাগজে বাজে স্ট্যাম্প মেরে একটা নোটিস লিখে এনেছে, নইলে কে জানে নিভাপিসি তাকে আস্ত রাখেন কি না রাখেন।

'পিসি!' মৃদু স্বর শশীপদর।

কিন্তু এ কী! নিভাপিসির নয়নে এমন বরাভয় কেন? মুখে এমন কচি কলাপাতা রঙের হাসি কেন? নিভাপিসির হাতে মালা নেই কেন?

কী এ? রাগের আর এক অভিনব প্রকাশ?

রাগ ভাঙাতে শশী তাড়াতাড়ি বলে, 'পিসি, নোটিস এনেছি।'

নিভাপিসি তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'নোটিস কিসের র‍্যা শশী?'

'সেই যে "চলবে না! সইব না"

নিভাপিসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'থাম শশী, সব সইতে পারি, তোর ওই মুখ্যুমি সইতে পারিনে। "চলবে না" "সইব না" —এসব বললেই হল? বলি যে কালের যে ধর্ম! তোর কথায় কালের ধর্ম উলটে যাবে নাকি?'

'বল কি?'

'বলবার আবার আছে কি। না বুঝে-সুঝে অমনি নোটিস লিখে আনা হল!'

'তা হলে ছিঁড়ে ফেলি?'

'এক শো টুকরো করে।'

'কিন্তু পিসি—'

'তা তুই যা-ই বলিস শশী—' নিভাপিসি সেই কচি কলাপাতা রঙের হাসিটুকু আর একটু হেসে বলেন, 'এ-কালের মেয়েগুলো চালাক আছে। আমার ওই নাতনীটা? দেখলে মনে হয় বোকা-হাবা, কেমন একখানা বর গেঁথে তুলেছে দেখেছিস!'

শশী আকাশ থেকে পড়ে বলে, 'অ্যাঁ!'

'তার আবার অত চমকাবার কী আছে!' নিভাপিসি সতেজে বলেন, 'সব সইতে পারি শশী, তোর ওই আকাশ-থেকে-পড়া সইতে পারিনে। সকল নম্বর ফেলাটে দোহাত্তা 'লভে' পড়াপড়ি চলছে, আর যত দোষ আমার নাতনীটির বেলায়? কেন? কেন শুনি?'

'কিন্তু পিসি—'

'অত "কিন্তু কিন্তু" করিস নে শশী, একটু মন খুলে আনন্দ কর। কতবড় সুখবরটা দিলাম তা বল? তা যাই বলিস শশী, এ-কালের ওই লভে পড়াপড়িটা নেহাত মন্দও নয়, ওর গুণেই মেয়েগুলোর কপালে বিনি পয়সায় ভাল ভাল বর জুটছে। নইলে ওই তো আমার নাতনী, রূপের ধুচুনি! আর আমার ছেলের মুরদ কত তা জানতেও তোর বাকী নেই! পারতো সে জজের বেটাকে জামাই করতে?'

'তা হলে পিসি, 'লভ' চলবে ?'

নিভাপিসি ধমক দিয়ে বলে ওঠেন, 'থাম শশী ! সব সইতে পারি, তোর ওই পিত্তি-জ্বালানে কথাগুলো সইতে পারিনে। চলবে মানে কি ? না বুঝে-সুঝে যেখানে সেখানে চলবে নাকি ? আমার বেবির মতন জাত-কুল বজায় রেখে আকাশের চাঁদটি পেড়ে মুঠোয় ধরতে পারে তো, অবিশ্যি চলবে। কথাতেই আছে, 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা !'

॥ একটুর অভাবে

ট্রাঙ্ক নয়, সুটকেস নয়, স্রেফ পুঁটলী।

এই পুঁটলী নিয়েই সেই পাঠানকোট থেকে কলকাতায় এসেছেন বিধুমাসী। এসেছেন ছেলের বাসা থেকে বোনপোর বাসায়। চ'লে এসেছেন একলাই। অনেক দিন কলকাতার আত্মীয়দের দেখেন নি, তাই একবার আসতে 'মন হয়েছে'। অন্ততঃ চিঠিতে সেই কথাই জানিয়েছিলেন বিধুমাসী।

সুকুমার ওঁর আপন বোনপো নয়, খুড়তুতো বোনপো, তা হোক জগতে কে আপন, কে পর? যে যাকে ভালবাসে সেই আপন, যে যাকে ভালবাসে না, গ্রাহ্য করে না, সেই পর। বিধুমাসী চিরটাকাল খুড়তুতো দাদাদের বাড়ী কাটালেন কী সুবাদে? ওই ভালবাসা। খুড়ো-খুড়ী অসহায় বিধবা মেয়েটাকে ভালবেসে বাড়ীতে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ব'লেই না?

ছেলেবেলায় সুকুমার বেশীর ভাগ সময় মামার বাড়ী থাকতে ভালবাসত, আর সেই থাকার সূত্রেই বিধুমাসীর ভারী ন্যাওটা ছিল সে। তাঁর কাছে নাইবে, তাঁর কাছে খাবে, তাঁর কাছে গল্প শুনে ঘুমোবে।

'নাও, এখন সেই ধার শোধ করো।'

চাপা চাপা ব্যঙ্গস্বরে বলল স্বপ্না, 'ওনাকে খাওয়াও, মাখাও, থাকতে দাও।'

'আহা উনি কি থাকতে এসেছেন?' সুকুমার বলে, 'দু'চারদিন বৈ ত না?'

'ওই আনন্দেই থাকো। আমি তোমায় ব'লে রাখছি, উনি এখন সহজে নড়বেন না। এখন ওঁর অবস্থা ফিরেছে, ছেলে কম্বলের ব্যবসা ক'রে 'লাল' হয়েছে, এসব গুজবে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমি করি নি।'

কথাটা সত্যি, স্বকুমারের মামাতো ভাইরা এসব গল্প তুললে স্বকুমার সহজেই বিশ্বাস করেছিল, স্বপ্না করে নি। বলেছিল, 'দেখে এসেছেন কেউ পাঠানকোটে গিয়ে ?'

তা' অবশ্য কেউই দেখে আসে নি।

'যত রটে তত বটে নয়। ও কথা বিশ্বাস করতে নেই।' বলেছিল স্বপ্না।

আজও সেই কথাই বলে। 'শোনা কথা বিশ্বাস করতে নেই। দেখ তার প্রমাণ। অবস্থা ফিরলে কেউ ছেঁড়া কাপড়ের পুঁট্‌লী সম্বল ক'রে হাজার মাইল পথ পাড়ি দেয় ? আর কোথাও এসে দুদিন থাকতে চাইলে এত নরম হয়ে চিঠি লেখে ? চিঠি দেখেই আমি বলেছিলাম—'

স্বপ্নার এ কথাও ঠিক। স্বকুমারের তখনই ভেবে দেখা উচিত ছিল, অবস্থা ফিরলে কে কবে নরম থাকে ? কি দায় নরম থাকবার ?

নাঃ, সত্যিই বোকামী হয়ে গেছে।

শুনলেই হ'ত তখন স্বপ্নার পরামর্শ। চিঠির মুসাবিদা পর্যন্ত ক'রে দিয়েছিল স্বপ্না, 'ঝিয়ের অস্থখ, চাকর ছেড়ে গেছে, ঠাকুর দেশে যাব যাব করছে, তা ছাড়া স্বপ্নার শরীর খুব খারাপ, এমন অবস্থায় বিধুমাসীকে যথোপযুক্ত আদরযত্ন করা সম্ভব হবে না। আর না পারলে আক্ষেপের শেষ থাকবে না স্বকুমারের পক্ষে। অতএব বিধুমাসী আসাটা আপাততঃ স্থগিত রাখুন, এ দিক্‌টা সামলে নিজেই নেমন্তন্ন ক'রে চিঠি লিখবে স্বকুমার।

কিন্তু চিঠিটা নিজের হাতে লিখতে কেমন বাধল স্বকুমারের। কথাগুলো বড্ড ডাহা মিথ্যে যে! এখন ভেবে দেখা যাচ্ছে, সংসার করতে গেলে অত বিবেকের মুখ চাওয়া চলে না।

ওই ময়লা-পুঁট্‌লীর অধিকারিণী এখন কতদিন চেপে ব'সে থাকবেন কে জানে ? এই ফিটফাট ছিম্‌ছাম্ সাজানো গোছানো বাড়ী স্বকুমারের, এখানে বিধুমাসীদের মত মানুষের উপস্থিতি যেন ছন্দপতন। হয়তো চোখের সামনে কোথায় না কোথায় একখানা ময়লা গামছা শুকোতে দিয়ে বসবেন, হয়তো বা আরও কিছু কিম্ভূত করবেন। তা ছাড়া—স্বকুমার নয়, স্বপ্না ভাবে সেটা —'সেকেলে মানুষ, খাওয়া-দাওয়া অবশ্যই বেশ ইয়ে, আর বিধবা মানুষকে রাত্রে লুচি না হোক পরোটাও দিতে হবে এক গোছা! তা ছাড়া দশমী দ্বাদশী আছে, বার ব্রত আছে।'

যত রকম অসুবিধে হবে বিধুমাসীব অবস্থানকালে, তার সমস্তই ভেবে নেয—স্বপ্না, বিধুমাসী এসে দাঁড়ানব সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নেয়। সর্বোপরি হচ্ছে শোভনতাব প্রশ্ন। স্বপ্নাব কত বান্ধবী আসে, তাদের সামনে তো একবস্ত্রে ঘুবে বেড়াবেন বিধুমাসী—ওই মোটাসোটা কালোকালো দেহখানি নিয়ে? বাবণ কবতে তো পাবা যাবে না। কে জানে, হয়তো পাঁচজনেব সামনেই নিতান্ত অন্তবঙ্গতায স্বপ্নাকে 'বৌমা' 'বৌমা' ক'বে আপ্যাযিত করবেন, গ্রাম্য গ্রাম্য ভাষায ওদেব সঙ্গেই গায়ে প'ড়ে আলাপ কবতে আসবেন। বুড়ীদের তো কোন হুঁশপর্ব থাকে না।

অথচ এ সবেব কিছুই হ'ত না, যদি সুকুমাব একটু চক্ষুলজ্জার মায়া ত্যাগ কবত।

'কি আব করা!' সুকুমাব বলে, 'এসে পড়েছেন যখন! এখন ওঁর খাওয়া-দাওযার ব্যবস্থাটা কর।'

স্বপ্না মুচকে হাসে

বিধুমাসী পোঁটলা-পুঁটলী নামিয়ে চান কবতে গেছেন, এই সময় কথাবার্তা কয়ে নেওযাই ভাল।

'চান ক'রে এসে একটু শববৎ-টববৎ ত খাবেন?'

অপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন কবে সুকুমার, 'নয তো জিগ্যেস ক'রে দেখ ছেলের বাসায় পাঠান-মুলুকে গিযে চা-টা খাওয়া অভ্যাস হযেছে কি না।'

স্বপ্না আবার মুচকে হেসে বলে, 'ভাবছ কেন, সবই জিগ্যেস করব। ছেলেব বাসায় থেকে রাবড়ী আব রাজভোগ দিয়ে জল খাওয়া অভ্যাস হয়েছে কিনা, শববৎটা শুধু মিশ্রীরই চলবে না বাদাম পেস্তার চাই?'

'তাই কি বলছি আমি! হাল যা দেখছি, তাতে বিশ্বাস হচ্ছে না, অমলটা বিশেষ কিছু আয় উন্নতি করেছে।'

'সেই কথাই বলছি। থেকে ত যাবেন বেশ কিছু দিন বোঝাই যাচ্ছে, গোড়া থেকেই সাদামাঠা চাল দেখান ভাল, এখন আদর দেখাতে গেলে সমানে খরচ টানতে পারবে না।'

'যা বোঝ।' ব'লে চলে যায় সুকুমার।

মামাব বাড়ীতে বিধুমাসীর পোস্ট্টা মেয়েদের থেকে খুব বেশী উঁচু ছিল না। একা তিনজনের খাটুনী খাটতেন তিনি। খুড়ো-খুড়ী জায়গা

দিয়েছিলেন, সম্মান দিয়েছিলেন, খুড়তুতো ভাইরা জায়গাটা কেড়ে নেয় নি, তবে সম্মানটা আর দিয়ে উঠতে পারে নি। যাক গে, ও তো চিরাচরিত ঘটনা। চন্দ্র-সূর্যের মত স্বাভাবিক। আশ্রিতা আশ্রিতাই।

এখন সুকুমারের আশ্রয়টাকে বিধুমাসীর বেশী ভাল লেগে না গেলেই হ'ল।

সাংসারিক জ্ঞান স্বপ্নারই বেশী, ঠিকই বলেছে সে, বেশী আদরযত্ন দেখানটা সঙ্গত নয়, পেয়ে বসবেন।

স্নান ক'রে এসে এক পাথরবাটি চা আর দুটো দানাদার সহযোগে জল খেয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে কথাটা পাড়লেন বিধুমাসী, 'তোমার না একটি বিয়ের যুগ্যি বোন আছে বৌমা?'

স্বপ্না এ প্রশ্নের কারণ না বুঝতে পেরে ভুরু কুঁচকে বলে, 'ছিল ত। কেন কি হয়েছে?'

'হয় নি কিছু',—বিধুমাসী সহাস্যে বলেন, 'বিয়ে হয়ে যায় নি ত?'

'না।'

'তা বেশ!' হৃষ্ট স্বরে বলেন বিধুমাসী, 'দেখতে কেমন?'

'আমার থেকে ফর্সা। কিন্তু জানতে চাইছেন কেন?'

'আর কেন!' বিধুমাসী আবার হেসে ওঠেন, 'চোরের মন ভাঙা বেড়ায়। ছেলের ত মেয়ে মেয়ে বেলা গেল মন্দ নয়, এবার তাকে ঘরবাসী করবার জন্যে মন অস্থির হয়ে উঠেছে। এইবার তবে খুলে বলি বৌমা, ঐ জন্যেই আমার আসা। সেই পাণ্ডববর্জিত দেশে ত আর কনে জুটবে না। তা একটি সম্বন্ধ আমি ওখানে থেকেই পেয়ে এসেছি, মেয়ের বোন ভগ্নীপতি থাকে ওখানে, তারাই ঠিকানা দিয়েছে, চিঠিতে কথাবার্ত্তা কয়েছে, সে মেয়ে দেখব; তবে তোমার বোনটিকেও একবার দেখবার ইচ্ছে—'

স্বপ্না স্তম্ভিত হয়ে তাকায়। কি সীমাহীন বোকামী!

ধৃষ্টতা আর দুঃসাহসের বহর বটে একখানা! তবু 'বার্স্ট' করে না সে ভেবে নেয় দুঃসাহসের জন্মদাতাই ত বোধহীনতা। এঁর কাছে আর কি আশা করা যায়? তাই মুচকে হেসে বলে, 'আপনা-আপনির মধ্যে বিয়ে হওয়া কি ভাল?'

'আহা, এক ঘরে দুই কুটুম ত হচ্ছে না, আমার সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক তোমাদের যাই হোক, 'দেখ্‌তা' ত লতায় পাতায় সম্বন্ধ, ওতে দোষ নেই।'

স্বপ্না পূর্ব্বস্বরেই বলে, 'না, দোষ আর কি? তা কি যেন পাশ অমল ঠাকুরপো?'

'পাশ! পাশ আর বাছা করতে পেল কই বৌমা? সেই যা একটা পাশ। তার পর ঘরে ব'সে কত পড়া পড়ল, কিন্তু একজামিনের জমা দেবার টাকা ত জোগাড় হ'ল না। সেই আক্ষেপে দেশ-ভুঁই ছেড়ে—'

আর সহ্য করা শক্ত।

স্বপ্না বলে 'যে মেয়ের সন্ধান পেয়ে এসেছেন সেখানেই দেখুন মাসীমা। আমার বোনের এক সৃষ্টিছাড়া গোঁ, সে বলে 'লোকের কাছে বড় মুখ ক'রে বলতে পারা যাবে এমন বর না হলে আবার বিয়ে!' নিজে এম. এ. পাশ ত?'

বিধুমাসীর বুঝি নির্ব্বুদ্ধিতার পার নেই, তাই নিতান্ত সহজে বলেন, 'তা ও মেয়ে ও শুনেছি অনেক সব পাশটাশ করা।'

'বোধ করি এপাশ ওপাশ' অস্ফুটে এই মন্তব্যটুকু ক'রে সুকুমারকে স্বপ্না জানাতে যায় তার বিধুমাসীর চাঁদ চাওয়া সাধের পরিমাণ।

স্বপ্নার বোনের সঙ্গে ওঁর ম্যাট্রিক পাশ ছেলের বিয়ের স্বপ্ন দেখছেন উনি! আশ্চর্য্য, মানুষ কেনই এত বোকা হয়!

'রাত্রে আপনি কি খান মাসীমা?'

অমায়িক প্রশ্ন করে স্বপ্না, 'মুড়ি না শুধু দুধ মিষ্টি?'

'খাওয়ার আবার ঠিকঠাক! তুমিও যেমন বৌমা! জন্ম ভার তো পরের সংসারে কেটেছে, এখনই না হয় নিজের সংসার। যা তোমার সুবিধে হবে দিও।'

'সুবিধে-অসুবিধে কিছু নয়, তবে কি না আমাদের ত মাছ-মাংসর হেঁসেল, দু'বেলা যদি ঠাকুরের ঘাড়ে আবার ওই আলাদার হাঙ্গামা চাপানো হয়, ঠিক পালাবে।'

'সর্ব্বনাশ!' বিধুমাসী—হাঁ হাঁ ক'রে ওঠেন, 'কিছু দরকার নেই। ওই মুড়ি-টুড়িই—'

মুড়ির বরাদ্দই বহাল হয়। সুকুমারকে গিয়ে জানায় স্বপ্না, 'বলছেন, 'মুড়ি খাবেন।' সংসারী মানুষ স্বপ্না, এটুকুতে তার বিবেকে বাধে না।

বোধ-বুদ্ধিহীন মানুষটা পরদিন আর এক কথা পাড়েন, 'তুমিও চল না বৌমা।'

'আমি কোথায় ?'

'ওই মেয়েটাকে দেখতে। যতই হোক আমরা হলাম বুড়োহাবড়া, তোমাদের হ'ল গিয়ে আধুনিক চোখ।'

না, অসহ্য। সত্যিই অসহ্য। নির্ব্বুদ্ধিতার সীমা থাকবে না মানুষের? কতই আর ক্ষমা করা যায় অবোধ ব'লে, নির্ব্বোধ ব'লে? তাই ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে ওঠে স্বপ্না, 'যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়া আমার অভ্যাস নেই মাসীমা।'

বিধুমাসীমা থতমত খেয়ে বলেন, 'তবে থাক্, তবে থাক্। জায়গা কেমন তা' ত জানি না, তবে সুকু বলেছিল, যা ঠিকানা সে নাকি রাজ-অট্টালিকা। নামকরা লোকের বাড়ী।'

সুকুমারের কাছে গিয়ে ছুরির ধারে-ধারালো হাসিতে ফেটে পড়ে স্বপ্না। 'কি গো, শুনলাম নাকি রাজ-অট্টালিকায় ভাইয়ের কনে দেখতে যাচ্ছ?'

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিকানাটা' তাই বটে। বিরাট বাড়ী, কর্ত্তা অ্যাডভোকেট, তবে মেয়ে কার তা' জানি না। উনিও বলতে পারলেন না। চিরদিনের অবোধ তো?'

'তবু তারও একটা লিমিট থাকে। আমাকে বলছিলেন, মেয়ে দেখতে যেতে।'

'তা গেলে আর কি হয়েছে?'

'কি বললে? স্বপ্না ঠিকরে ওঠে, 'তুমি নইলে আর এমন কথা বলবে কে? ওই মাসীরই বোনপো তো! মেয়ে খুব সম্ভব উকিল সাহেবের রাঁধুনীর, অথবা গলায় পড়া উদ্বাস্তু আত্মীয়ের।'

'তা জানি না।'

'ওটুকু জানবার জন্যে খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হয় না। যাক, দয়া ক'রে আর আমায় অনুরোধ করতে এসো না।'

না, এর পর আর অনুরোধ করবার সাহস হয় না সুকুমারের, মাসীকে

নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু মাসী বোনপো যখন ফেরেন তখন দু'জনের মুখে কেন দু'রঙের খেলা?

মাসীর কালো রঙ। মুখ খুশীর আভায় উজ্জ্বল, বোনপোর গৌর মুখ. যেন কি এক আঘাতে কালো।

সুকুমার কিছু বলার আগেই বিধুমাসী উচ্ছ্বসিত আনন্দে ফেটে পড়েন, 'দেখে এলাম বৌমা, খাসা মেয়ে। গানও গাইল খাসা। বাপ-মা-ও বেশ, কোনও দেমাক্-অহঙ্কার নেই।'

স্বপ্না অমায়িক অমায়িক মুখে বলে, 'দেমাক্-অহঙ্কার করবার মতন খুব বুঝি বড়লোক?'

বিধুমাসী সহাস্যে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সে-সব কথা সুকুই বলতে পারবে। বাড়ী তো ঝক্‌মকাচ্ছে। দোরে দারোয়ান, দু'খানা গাড়ী।'

স্বপ্না চোখে ভুরুতে বিশেষ একটা ভঙ্গি ক'রে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মেয়ে কার?'

'কর্ত্তারই।' গম্ভীর ভাবে বলে সুকুমার।

কর্ত্তারই!

ভুরু দুটো আর কত কোঁচকাবে স্বপ্না।

'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

'বোধ করি কোন রকম ডিফেক্‌টিভ?'

'না। মোটেই না। বি-এ অনার্স, এম-এর জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা কি?'

'দেখতেই পাবে। টাকায় সবই হয়।'

বিধুমাসী এই মৃদু কথোপকথন বোঝেন না, আপন আনন্দে ব'লে চলেন

'অমলের সঙ্গে আমি কথা কয়ে এসেছি, মেয়ে পছন্দ হ'লে একেবারে পাকা-দেখা সেরে যাব। আশীর্ব্বাদী গহনা তোরা দেখে শুনে কিনে দে তবে বাবা। এতে আর বৌমা 'না' করা চলবে না তোমার, তা বলে দিচ্ছি। বুড়ীর পছন্দে কাজ হবে না। জড়োয়া সেট নাকি ভাই, তা না হয়—'

স্বপ্না ওই আনন্দোদ্ভাসিত নারেট মুখটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'গহনার টাকা কি আপান সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নাকি?'

বিধুমাসী পা দু'টো ছড়িয়ে ব সে পরম সন্তোষে সেই পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'তা না ত কি? এনেছি তিন-চার হাজার টাকা। নইলে আর ছেড়া কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে পুটলিবুড়ী হয়ে আসি? দেখে চোর-ডাকাতে সন্দ করতে পারবে না সঙ্গে কিছু আছে। স্যুটকেস তোরঙ্গ দেখলে বুড়ীকে ফাঁসীয়ে নিয়ে ভাগতে কতক্ষণ? অমন ক'রে একলা কি আসতে দেয় অমল? বলে, 'সঙ্গে লোক দিই, ফাসটো কেলাশে যাও।' আমি এক ধমকে চুপ ক'রে দিইছি, 'থাম তুই। বসে জন্ম গেল ছেলে ধ'রে, আজ বলছে ডান। তুই লাখোপতি হয়েছিস, তুই ফ্যাশান করগে যা, আমি যা ছিলাম তাই আছি। কি বলিস রে সুকু, ঠিক বলি নি?' হা হা ক'রে হেসে উঠে বক্তব্যের উপসংহার করেন বিধুমাসী 'শুনিয়ে দিলাম ছোঁড়াকে, সুকু আমার তার সেই গরীব বিধুমাসীকেই চেনে, তাকেই প্রাণতুল্য দেখেছে চিরটা কাল। তা ছোঁড়া শাসিয়ে রেখেছে, তিনটি দিনের ছুটি, তার বেশী থাকতে পারবে না কলকাতায়। একলা থাকতে পারে না, বুঝলে বৌমা, তাতেই ত নিয়ে বিপদ ক'রে ক্ষেপেছি।'

তার পর?

তার পরের ঘটনা একেবারে অভাবিত।

বিধুমাসীকে থতমত আর সুকুমারকে সচকিত ক'রে দিয়ে স্বপ্না আবদারে জড়ানো স্বরে ব'লে ওঠে, 'তিনদিনের ছুটি বললে ত চলবে না মাসীমা। আমার বোনটিকে না দেখিয়ে ছাড়ব নাকি?'

বিধুমাসী হতভম্ব ভাবে বলেন, 'তোমার বোন। তোমার বোন যে সেই কি সব—'

'রেখে দিন ওসব কথা—' সমস্ত বাধা নস্যাৎ ক'রে দিবে বলে স্বপ্না, 'ছেলে-মেয়েরা ত বলে অমন কত কি, সেই কথা আর মানলে চলে না।'

কিন্তু স্বপ্নার ওই হাস্যোজ্জ্বল কথাটিকেও নস্যাৎ করবার লোক আছে। সে তার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর ক'রে বলে, 'আর দেখাদেখির প্রশ্ন নেই। এখানে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। কাল পাকা দেখা!'

'কাল পাকা দেখা!'

'হ্যাঁ, কাল রাত্তিরের গাড়ীতেই ফিরতে হবে যে বিধুমাসীকে।'

হ্যাঁ, পরদিন রাত্তিরের গাড়ীতেই ফিরলেন বিধুমাসী। স্টেশনে তুলে দিতে এল স্বপ্না সুকুমার। যাত্রাকালে স্বপ্নার হাত ধ'রে চোখের জল মুছলেন বিধুমাসী। 'দু'টো দিন বড আনন্দে কাটল মা। ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না। যাই হোক এই পই পই ক'রে বলে যাচ্ছি, অমলের বিয়েতে যেতে হবে। তোমরা গিয়ে না দাঁড়ালে বিয়েবাড়ীই মিথ্যে। বিয়ের দিন স্থির হলেই ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দেব। উঁহু, নেব না বললে শুনব না, এ ত হ'ল গে বিয়ের খ...। আর দেখ বৌমা', বিধুমাসী আঁচলের তলা থেকে একটা জিনিস বার ক'রে বলেন, 'সাহস ক'রে বলতে পারি নি কাল থেকে, আজ গাড়ীতে ওঠবার সময় বলি, কথা এড়াতে পারবে না। অমলের বৌয়ের পাকা-দেখার গহনা কিনতে গিয়ে বড্ড পছন্দ হ'ল, এইটি আমি তোমার জন্যে কিনে ফেলেছি, পরতে হবে।'

এক ছড়া ভারী-সারী সোনার হার নিয়ে স্বপ্নার গলায় পরিয়ে দেন বিধুমাসী।

'এ কি মাসীমা, এ আমি—না, না।'

'না' করতে পারবে না বৌমা, আগেই বলেছি', বিধুমাসী সজল চোখে বলেন, 'বিয়ের সময় সুকুর বৌয়ের মুখ দেখেছি আমি একটা টিনের সিঁদুর কৌটো দিয়ে, এ দুঃখু কি ম'লেও যাবে? তা সিঁদুর তোমার অক্ষয় হোক মা, এটুকুও নিতে হবে।'

ট্রেন ছেড়ে দিতেই স্বপ্না রোষকশায়িত লোচনে ব'লে ওঠে, 'খুকুর সঙ্গে অমল ঠাকুরপোর বিয়েটায় তুমিই বাগড়া দিলে! বেশী ধরাধরি করলে 'না

করতে পারতেন না উনি।'

সুকুমার শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল।

প্লাটফর্মটা পার হতে হতে স্বপ্না আবার ব'লে ওঠে 'অমল ঠাকুরপোর বিয়েতে ভালমত একটা কিছু দিতে হবে।'

সুকুমার আর একবার তাকাল।

'কি। খালি খালি অমন তাকাচ্ছ মানে?' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে স্বপ্না, 'এমন ভাব করছ যেন আমি কি এক চুরির আসামী। এটি করলেন ত উনিই। সঙ্গে ওই একটা পুটলি-ফুটলী না এনে সুটকেস বাক্স আনলে ত এমনটা হ'ত না।'

সুকুমারের আগে আগেই পা চালিয়ে এগিয়ে যায় স্বপ্না, রাগে গম্‌গম করতে করতে।

শুধুই কি সুকুমারের ওপর রাগ?

রাগ নিজের ওপর নয়? নয় ভাগ্যের ওপর?

অনবরতই যে চোখের সামনে ছায়া ফেলছে পাথর বাটিতে চারটি মুড়ির ওপর শুকনো একখানি চম্‌চম্। ছায়া ফেলছে একখানা আলো ঝল্‌সানো জড়োয়া নেকলেস!

॥ ভঙ্গুর

ইচ্ছেটা একেবারে আকস্মিক। বিদ্যুতের মত হঠাৎ।

নইলে এই তো একটু আগেই—আচ্ছা—আগের কথাটাই হোক।

ঊর্মিলাকে দেখেই দীপ্তেন অনুযোগের বিরক্তি প্রকাশ করলো, 'আবার তুমি তোমার চা এঘরে আনলে? কেন এরকম ছেলেমানুষি করো?'

ঊর্মিলা কুণ্ঠিত ছলছল চোখে একবার দীপ্তেনের অভিযোগভরা চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাকিয়ে দেখলো তার চোখের নীচে গভীর কালিপড়া দুই চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি, দেখলো তার ভেঙে-যাওয়া গালের ওপর উঁচু হয়ে ওঠা হাড় দুটো, দেখলো তার বুকের ওপর জড়ো করে রাখা শিরা ওঠা ওঠা কঠিন হাতের চেটো দু'খানা, আর বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাওয়া অস্থিচর্মসার দেহটা। দেখে চোখ ফেটে জল এসে গেল ওর। তবু জোর করে গলায় সপ্রতিভতা এনে বলে উঠলো, 'আহা আমি তো আমার চা টেবিলের এধারে রেখেছি। তাতেই একেবারে এত 'ইয়ে' হয়ে গেল?'

দীপ্তেন তার কালিপড়া চোখের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে একবার তাকিয়ে দেখলো। দেখলো ঊর্মিলার দিকে, দেখলো তার সকালের ফুলের মত সদ্যস্নাত টাটকা মুখ, দেখলো তার গাঢ় হলুদরঙা ব্লাউস আর ফিকে হলুদ-রঙা হালকা শাড়িখানি জড়ানো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তনুর নিটোল ভঙ্গিমা, দেখলো তার করুণায় কোমল বেদনায় গাঢ় ভালোবাসায় ছলছল আনত দুটি চোখ। দেখে সমস্ত মনটা যেন কেমন একরকম হাহাকার করে উঠলো তার। তবু কণ্ঠে জোর এনে বললো, 'ইয়ে হয়ে গেছে কিনা, এসব তুমি নিজেই খুব ভালো জানো ঊর্মি। কারণ, একদা তুমি মেডিকেলের ছাত্রী ছিলে। অবিশ্যি—'

দীপ্তেন যেন কি এক নিষ্ঠুরতা নিয়ে কথা শেষ করলো, 'টি-বি রোগীর সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়াটা যে নিরাপদ নয় এটুকু বুঝতে মেডিকেল স্টুডেন্ট না

হলেও চলে।'

উর্মিলা আহত দৃষ্টিটাকে সরিয়ে জানলা দিযে বাইরে ফেললো যেখানে অনেকখানিটা সবুজের সমারোহ। গাছপালাহীন ফাঁকা মাঠটার চেহারাতেও কী আশ্চয পরিপূর্ণতা!

মানুষ কেন প্রকৃতির মত স্বযংসম্পূর্ণ হতে পারে না? কেন আপন প্রাণের প্রাচুযে অপরকে ভরে তুলতে পারে না?

ফেরানো মুখেই বললো উর্মিলা যেন অবুঝ আবদারের স্থরে, 'তোমার তো 'বোন্' টি-বি, ওতে কিছু হয় না।'

'হয় বৈকি!' জড়ো করা দু'খানা হাতের একখানা বিছানার একপাশে ছড়িয়ে দিলো দীপ্তেন, ছড়িয়ে দিয়েই মুঠো করে চেপে ধরলো বিছানার খানিকটা, তারপর বড একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'কেউটে সাপের বড ছোট নেই, বুঝলে উর্মি! কেউটে কেউটেই। কাল থেকে আর এরকম কোর না।'

'কাল থেকেই বা কেন তবে?' উর্মিলা অভিমানের ঝাপট উড়িযে পেয়ালাটা নিতে যায় হাত বাড়িয়ে, 'আজই ফেলে দিচ্ছি জানলা গলিয়ে।'

'আহা ওকি হচ্ছে?' দীপ্তেন ক্ষুব্ধহাসি হাসে, 'কি করে যে তুমি অফিসের কাজ চালাও তাই ভাবি। এদিকে তো শুনি হোমরাচোমরা পোস্ট, ওয়েল-ফেযার অফিসার। ভেতরে ভেতরে সেই আদি ও অকৃত্রিম মেয়ে!'

মেযে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, 'তা কেউটে যদি সব অবস্থাতেই 'কেউটেগুণ-সম্পন্ন' হয, মেয়েই বা সকল অবস্থাতেই মেযে থাকবে না কেন? দু'জনে তো স্বজাতি।'

'এটা একটু বেশী বলা হযে যাচ্ছে না?' দীপ্তেনের শীর্ণমুখে হাসিটা বড্ড কেমন শ্রীহীন দেখায়, 'তবে আমি বলি কি সাবধান হওয়াই তো ভালো? তা' ছাড়া তোমার ডাক্তার যখন অত টিক্‌টিক্ করেন।'

'নিকুচি করেছে তোমার ডাক্তারের', সকালের রোদের আলোয় ঝলসে ওঠে সকালের ফুলের মত মুখ, সকালের চঞ্চল বাতাসে চঞ্চল হতে থাকে হলুদরঙা হালকা শাড়ির আঁচল, হাতের একটা অপূর্ব ভঙ্গী করে উর্মিলা বলে, ছুটির দিনে আমি তোমার সঙ্গে চা খাবোই খাবো। নাঃ কথায় কথায় চা-টা গেল! দাঁড়াও তোমার জন্যে একটু চিঁড়ে ভাজতে বলে এসেছিলাম, হয়ে গেছে বোধ হয়, নিয়ে আসি।'

দ্রুত ঘর থেকে যায় উর্মিলা।

ওর চলে যাওয়ার দিকে যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দীপ্তেন। আশ্চর্য! এতো লাবণ্য এতো সুষমা কোথা থেকে আহরণ করে উর্মিলা! এই লাবণ্যের ভাঁড়ারের চাবি কার কাছে?

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে যখন ফেরে এক একদিন ঈষৎ ক্লান্ত দেখায় ওকে, লাবণ্যের এই জোয়ার যেন কোন বালুর তলায় আত্মগোপন করে, দেখলে শান্তি আসে, স্বস্তি আসে। কিন্তু সকাল হলে, চান করলেই যে কে সেই।

কিন্তু এতে স্বস্তি কোথায়?

এ যেন দীপ্তেনের আয়ত্তের বাহিরে। এই উচ্ছলতার, এই অপর্যাপ্ততার চাবিকাঠি দীপ্তেন নিজে, এ কথা কখনো বিশ্বাস করা চলে?

দীপ্তেন ভাবতে চেষ্টা করে 'যখন রবো না আমি মর্ত কায়ায়--', ভাবতে চেষ্টা করে 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে—'

তখন?

তখন কি উর্মিলা ওর ওই হলুদরঙা শাড়িখানা আর পরবে না? তখন কি সকালের এই সোনারঙা রোদ্দুর ওর মুখখানাকে বাদ দিয়ে ঝরবে? তখন উর্মিলার সদ্য স্নান করে আসা তনুখানি থেকে লাবণ্যের জোয়ার বইবে না আর?

কিন্তু কেন তা' হবে?

উর্মিলা তো তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। উর্মিলার জীবনের মাঝখানে তো দীপ্তেন নেই। নেই সে জীবনে দীপ্তেনের মৃত্যুতে লাভ লোকসানের সমস্যা।

না, দীপ্তেনকে উর্মিলা হৃদয়ের মাঝখান থেকে জীবনের কেন্দ্রে এনে বসাবার অবকাশ পায়নি, তাদের যুগলজীবনের সমস্ত পরিকল্পনা এলোমেলো করে দিয়েছে দীপ্তেনের এই ক্রূর কুৎসিত হিংস্র নির্লজ্জ রোগটা।

কিন্তু উর্মিলা ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়, তাই দীপ্তেনের দাদারা যখন দীপ্তেনকে হাসপাতালে রেখে উঠে পড়ে চিকিৎসা করছিলেন," উর্মিলা তখন উঠে পড়ে লেগে চাকরি খুঁজে বেড়িয়েছে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়ে।

অবশেষে পেয়ে গেল এই চাকরিটা।

আশাতীত রকমের ভালো।

বাংলার সীমান্তঘেঁসা একটা চিনির কলের মেয়েশ্রমিকদের তত্ত্বাবধায়কের কাজ।

চাকরি পেয়েছে উর্মিলা, পেয়েছে কোয়ার্টার্স, তারপর প্রস্তাব পাঠিয়েছে দীপ্তেনের বৌদিদের মাধ্যমে তার দাদাদের কাছে।

এখানের আবহাওয়া ভালো, দীপ্তেনকে যদি ওঁরা এখানে রাখেন কিছুদিন।

—'কিছুদিন কেন, চিরদিন রাখোনা', বলেছিল দীপ্তেনের এক বৌদি মনে মনে, 'তোমার যখন ভালোবাসার ধন!'

'দীপ্তেনের দাদারাও এ প্রস্তাবের মধ্যে অসামাজিকতা কিছু দেখতে পেলেন না, কারণ হাসপাতাল থেকে তখন চাপ আসছে রোগীকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে। ওর চাইতে আরো অনেক অক্ষম রোগী আছে, অনেক মুমূর্ষু মৃতকল্প, তাদের জন্যে ঠাঁই ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে নীতি নিয়ম। ওর অপারেশন হয়ে গেছে, ওকে রাখার ঠাঁই আর নেই।

'হাসপাতালে আর রাখতে চাইছে না', এই গুঞ্জনের মাঝখানে উর্মিলা চাইলো দু'হাত বাড়িয়ে, 'আমার কাছে দাও।' মুখে বললো বটে 'কিছু-দিন', তবু ওর মুখ দেখে মনে হলো যেন বলছে 'চিরদিন! দীপ্তেনের জীবনের যে কটা দিন আছে সে কটা দিন। মরলে আমার, সারলে আমার, তাইতো নিয়ে যেতে চাই একান্ত করে আমার কাছে।' এই বুঝি ছিল ওর অব্যক্ত আবেদন।

তা' সেরেই তো উঠেছিল দীপ্তেন প্রথমদিকে।

কিন্তু যে সাপের যে বিষ, যে বিষের যে গুণ। সারতে সারতে রোগ হঠাৎ একদিন অকারণে বেড়ে উঠলো প্রবলভাবে। দেখা দিল নানান উপসর্গ। উর্মিলা টের পায়নি, কিন্তু দীপ্তেন তো টের পেয়েছে—রোগের জড় এক ঠাঁই থেকে আশ্রয় হারিয়ে অপর এক ঠাঁই-এ বাসা বেঁধেছে, দিচ্ছে মোক্ষম কামড়।

এখন টের পায়নি উর্মিলা, ক্রমশঃ তো পাবে! তখন? তখনও কি এত

সাহস দেখিয়ে এক টেবিলে খেতে আসবে

চিন্তার গতি দ্রুত বৈকি।

নইলে উর্মিলার শুধু একবার রান্নাঘর থেকে আসতে যেতে এত অজস্র কথা ভাবা হয়ে যায় দীপ্তেনের? ও ভেবেই চলেছে,—আচ্ছা উর্মিলার এই নির্ভীকতা কি সত্যিই প্রেমের আবেগ, না শুধু বাহাদুরি দেখানো? সুস্থ সবল আস্ত একটা মানুষকে যেমন করে ভালোবাসা যায়, তেমন ভালোবাসা কি সম্ভব অনড় পঙ্গুকে?

অসম্ভব! তা' হয় না। হতে পারে না।

এ আর কিছু নয় উর্মিলার শুধু দয়া। হতভাগ্য দীপ্তেনের প্রতি দয়া, করুণা, অনুকম্পা। আর সেই বস্তু পেয়ে কৃতার্থ হয়ে পড়ে আছে দীপ্তেন! কৃতার্থ হয়ে গ্রহণ করছে উর্মিলার উপার্জনের অন্ন, উর্মিলার শৌখিন সেবা, আর বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, উর্মিলা কেমন করে নিত্য নানা রঙের শাড়ির আঁচল দুলিয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য, দীপ্তেন আবার ঘাড় ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যতক্ষণ না পথের বাঁকে সেই আঁচল অদৃশ্য হয়ে যায়। আর—আবার বিকেল থেকে ঘাড় তুলে তাকাতে তাকাতে ঘাড় ব্যথা করে ফেলে কতক্ষণে ফের সেই আঁচল ঝলসে উঠবে চোখের সামনে।

ছি ছি!

দীপ্তেনকে উর্মিলা সেবাযত্ন করবার জন্যেই এনেছে সত্যি, কিন্তু ছুটির দিনে ওইরকম একটু শৌখিন সেবা ছাড়া নিজের হাতে আর কীই বা করে সে? সবই তো ফেলে দিয়েছে একটা চাকরের হাতে।

উর্মিলা যদি দীপ্তেনের বিবাহিতা স্ত্রী হতো, পারতো এভাবে ছেড়ে দিতে? পারতো এভাবে হাসির ঝড় তুলে রঙিন আঁচল উড়িয়ে শুধু গল্প করতে, তাস খেলতে, গান শোনাতে? অহরহ অশ্রুসজল দু'খানি দৃষ্টি মেলে চুপ করে কাছে বসে থাকতো না কি? সে কি গান গাইতো? ছবি আঁকতো? সেলাই করতো? অফিসের ছুতো করে সারাদিন বাইরে কাটিয়ে আসতো? নিত্যি সেই অফিসের বায়নাক্কা নিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরতো?

নিশ্চয় না।

হয়তো আর্থিক অনটন হতো তা'তে হয়তো আত্মীয বন্ধুর কাছে প্রার্থীর হাত বাড়িয়ে ধরতে হতো, তবু সেইটাই বুঝি ছিল ভালো।

অসহায়ের কাছে আর এক অসহাযের আত্মনিবেদন সহজ হতো। সহায় আর অসহাযের একটা বিরাট বিভেদ মাথা তুলে দাড়িযে থাকতো না।

'যখন বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে!'

তখন?

উর্মিলার কি কিছু বন্ধ হযে যাবে তখন? উর্মিলা কি শাড়ির রং হারাবে? হারাবে জীবনের সমস্ত রং? উর্মিলা কি অফিস যাবে না? মীটিং করবে না? এপাড়া ওপাড়ার যত সব ছোট ছোট ফাংশানে সভানেত্রী হবে না?

সবই হবে।

দীপ্তেন জানে উর্মিলা ভেঙে পড়বার মেযে নয।

কিন্তু ভেঙে পড়লেই বুঝি ভালো হতো! তাই হলেই বুঝি শোভন হতো। তাইতেই বুঝি দীপ্তেনের শান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল, সুখ ছিল।

মরার পর কি সুখদুঃখবোধ থাকে? হযতো থাকে না, কিন্তু মরার আগে, 'মরছি' একথা জানতে পারার পরে বুঝি সে বোধটা বড় তীব্র হয়ে থাকে।

বাঙালীমনের অনুভূতিটা বড বেশী তীক্ষ্ণ বোধ হয, তাই তাদের পুরুষরা নিজেরা মরে যাবার পরে স্ত্রীকে বিধবা হয়ে থাকবার বিধান করে রেখেছে।

যে মানুষটা একান্তই আমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী ছিল, আমাকে বাদ দিয়েও তার দিন চলে যাবে, আমাকে বাদ দিয়েও সে পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস শব্দ স্পর্শ উপভোগ করবে, এ বড় অসহ্য!

হ্যাঁ হ্যাঁ অসহ্য।

বুকের মধ্যে ভযানক একটা মোচড় দিয়ে উঠল দীপ্তেনের, একান্ত অসহ্য এই পরম আর চরম সত্যটুকু—দীপ্তেন না থাকলেও উর্মিলা থাকবে। থাকবে ওর ওই গাঢ় হলুদ ব্লাউজ আর হালকা হলুদ শাড়ি। থাকবে সকালের রোদ্দুর আর সন্ধ্যার রক্তিমাভা। যাতে উর্মিলা এত মনোহর, এত অপরূপ হয়ে ওঠে।

দীপ্তেনের চোখ বন্ধ হয়ে যাবে বলে কি সেই অপরূপার দিকে আর কেউ তাকিয়ে দেখবে না?

হয়তো ওই হতভাগা ডাক্তারটা তাকিয়ে দেখে বলে উঠবে ‘বাঃ চমৎকার!’ হয়তো বা ওর অফিস ম্যানেজার সেই বাঙলা কথায় ধুরন্ধর পাঞ্জাবী ছোকরাটা বলবে ‘ওঃ কী সুন্দর!’

হয়তো দীপ্তেনের এই খাট বিছানা আর তার সমস্ত চিহ্ন ঘর থেকে বিদূরিত করে দিয়ে ফিরেফিরতি আবার আগের মত করে ঘরটাকে ড্রইংরুমে পরিণত করবে উর্মিলা সোফা সেটি পর্দা ফুলদানী দিয়ে। হয়তো সে ঘর সকাল সন্ধ্যা অতিথির ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকবে, হয়তো সেই জমজমাটির মধ্যে চায়ের পেয়ালার ঠুংঠাঙের সঙ্গে সঙ্গে উঠবে পিয়ানোর টুংটাং!

এর কোনটাই অসম্ভব নয়, আশ্চর্য নয়, কষ্টকল্পনা নয়। নিখুঁত সত্য, নির্ভেজাল সত্য। দীপ্তেন থাকবে না, তবু পৃথিবী থাকবে, থাকবে উর্মিলা, থাকবে উর্মিলার যৌবন!

উর্মিলার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, বকাবকি করছে চাকরটার সঙ্গে। বোধহয় ওর চিঁড়েভাজার আদেশপালনে কোথাও ঘাটতি ঘটেছে।

চাকরটাকে কী বকাবকিই করে উর্মিলা, অনুষ্ঠানে এতটুকু ত্রুটি হবার জো নেই ওর।

এ বকাবকি কি বন্ধ হয়ে যাবে?

নাঃ। দীপ্তেন ফুরিয়ে গেলেও উর্মিলা ফুরিয়ে যাবে না। তখনও ও এমনি করেই গলা তুলে বকবে, শাড়ির ইস্ত্রি খারাপ হলে চাকরের ওপর রাগ করে সে শাড়ি ফের জলে ফেলে ভিজিয়ে দেবে। রান্না পছন্দ না হলে মাইনে কাটার ভয় দেখাবে।

অফুরন্ত ওর প্রাণশক্তি।

অতিরিক্ত প্র্যাকটিকাল।

নাঃ চা-টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

উর্মিলা খায় ঠাণ্ডা চা, দীপ্তেনের বিশ্রী লাগে। সে কথা তো জানে উর্মিলা। তবু দেরী করছে? চাকরকে শাসন করাটাই ওর কাছে প্রধান হয়ে উঠলো?

ছুটির দিনে একসঙ্গে চা খাওয়ার শখটা তা'হলে স্রেফ্ 'ফর শো'।

ঠিক আছে, দীপ্তেন খেয়েই নেবে একা একা।

বালিশে কনুই দিয়ে আধাআধি বসে চায়েব পেয়ালাটা টেবিল থেকে টেনে নিয়ে একটা চুমুক দিল দীপ্তেন, আব ঠিক সেই মুহূর্তেই ওকে পেয়ে বসলো সেই ভয়ংকর ইচ্ছেটা।

একেবারে অকস্মাৎ।

কিন্তু দুরন্ত দুর্দাম।

'যখন পডবে না মোর পায়েব চিহ্ন এই বাটে।'

তখন ?

তখন সে 'বাটে' উর্মিলাব পদচিহ্ন না পডলেই বা ক্ষতি কি ?

না, না পডবে না। ফুবিযে যাক উর্মিলাবও পদচিহ্ন। আর দীপ্তেনের হাতেই তো বয়েছে তাব উপায, বয়েছে কেউটেব বিষ।

একচুমুক-দেওয়া চায়েব পেয়ালাটা আস্তে আস্তে ঠেলে দিল দীপ্তেন আঙুলের ডগা দিয়ে দিয়ে আলতো করে, আর সেই আঙুলের ডগা দিয়েই টেনে নিল অপর পেয়ালাটা। একটু পবেই ঘবে ঢুকলো উর্মিলা চিঁডেভাজার প্লেট হাতে।

উঃ ভাগ্যিস।

বালিশ থেকে কনুই তুলে দীপ্তেন যে একেবাবে সোজা উঠে বসেছে একথা উত্তেজনার মুহূর্তে দীপ্তেনের খেযাল না হতে পাবে, কিন্তু উর্মিলার ?

উর্মিলা অমন নিরুত্তাপ চোখে টেবিলে প্লেটটা নামিযে বেখে চেযার টেনে বসলো যে। 'হাঁ হাঁ' কবে উঠলো না তো।

না, 'হাঁ-হাঁ' করে উঠল দীপ্তেনই। 'আরে আবে পেযালাটায় মাছিব মত কি একটা পডেছে দেখছি।'

আচমকা টানাটানি করতে গিয়ে দুটো পেয়ালাই পডে ভাঙলো ঝন্‌ঝনিয়ে।

চা পডে ঢেউ খেললো বিছানায, টেবিলঢাকায়, ঘবের মেজেয়।

'ধেৎ কী করলাম!'

অপ্রতিভ মুখে আক্ষেপ প্রকাশ করলো দীপ্তেন। আর এতক্ষণে বোধহয় খেয়াল হলো ওর যে মাথাটা ওর বালিশ থেকে অনেকখানি উঁচুতে খাড়া হয়ে রয়েছে। তাই মাথাটাকে এতক্ষণে আবার যথাস্থানে রেখে আর একটু অপ্রতিভ হাসি হাসতে হলো দীপ্তেনকে—'হঠাৎ মাছিটাকে দেখে—ইয়ে ছি ছি, দু'দুটো পেয়ালা ভাঙলাম।'

'পেয়ালা!'

উর্মিলা অচঞ্চল মুখে একটু হাসলো, 'পেয়ালা তো ভাঙলে আবার কেনা যায়।'

'তার মানে?'

দীপ্তেনের মুখটা যেন বড্ড বেশী বোকাটে দেখালো। কিন্তু উর্মিলার মুখের রেখায় যেন কোন ভাবনা নেই। আর গলার স্বরটাও যেন অদ্ভুত ঠাণ্ডা।

'মানে? নাঃ মানে কিছু নেই, এমনি। সব কিছুরই কি আর মানে থাকে?'

॥ মুখরক্ষা

বিখ্যাত সাহিত্যিক সত্যশরণ গুপ্ত ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'হাতে টাকের চুল ছিঁড়ছিলেন।

না-না—উকুন নয়, মনের আগুন।

তা' মনটাকে তো আর মুঠোয় বাগিয়ে ধরে নাড়া দেওয়া যায় না, তাই চুলগুলোকে বাগিয়ে ধরেই নাড়া দিচ্ছিলেন সত্যশরণ, আর দাতে দাঁত পিষে সরবে উচ্চারণ করছিলেন, 'ওরে মুখ্যু! ওরে নির্বোধ! সাহিত্যিক হতে কে বলেছিল তোকে? বাপ পিতামোর খল নুড়ি ছেড়ে কেন এসেছিলি কাগজ কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে।'

সত্যশরণের গিন্নী কিছুদিন হ'ল তিতবিরক্ত হয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছেন, এবং বলে গেছেন সত্যশরণ কলম না ছাড়লে তিনি সত্যশরণকে ছাড়লেন! সত্যশরণ বুঝিয়ে হার মেনেছেন। বোঝাতে পারেন নি তিনি কলম ছাড়লেও কমলি তাঁকে ছাড়বে না।

কিন্তু শুধুই কি কলম?

শুধুই কি গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ কবিতা, রম্যরচনা, শুভেচ্ছা, আশীর্বাণী, অভিমত, স্বস্তি?

ফাংশান নেই দেশে?

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্র।

আর সত্যশরণ নামকরা সাহিত্যিক নন? নন একটি বিখ্যাত কাগজের সহকারী সম্পাদক?

তবে?

টাকের ওপরকার আলগা চুলগুলো ভুস ভুস করে হাতে উঠে আসছে। সত্যশরণ তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলেন, সবগুলো এমন পেকে গেল

কবে? শেষ কবে চিরুণীতে কাঁচা চুল উঠেছিল!

মনে নেই।

কোথা দিয়ে যে দিন মাস বচ্ছর হু হু শব্দে উড়ে যাচ্ছে সত্যশরণ টের পাচ্ছেন না। সত্যশরণ লিখছেন, সভা করছেন, লিখছেন। কাঁচা চুল পেকে যাচ্ছে। শক্ত দাঁত ঢিলে হচ্ছে।

আর চুল ছেঁড়ারও সময় নেই। এখুনি প্রস্তুত হতে হবে। পর পর চারটে সভা আছে। শনি রবিবারে—এই রকমই থাকে।

সত্যশরণ নোটবুক খুললেন। ওঃ আর দেরী নেই, এখুনি বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার লোক এসে যাবে। প্রথমেই একটা রবীন্দ্র-শতজয়ন্তী। ঠিক আছে, ওটার জন্যে ভাবনা নেই। জলের মত মুখস্থ আছে। কিন্তু ঠিক তারপরেরটাই বিচ্ছিরি খটমটে। ভাল করে পড়ে নিলেন। 'নিখিল লণ্ড্রী অভিযোগ সমিতি।'

সত্যশরণ ভাবতে লাগলেন, কী ওদের অভিযোগ! কি ধরনের কথা বেশ জুৎসই হবে।

তার পরেরটা?

তার পরেরটা হচ্ছে 'অখণ্ড নামামৃত মাধুকরী সঙ্ঘের কৈবল্য একাদশী উৎসব।'

ভগবান জানেন কি তার মানে! আর কি বলতে হবে সেখানে। সত্যশরণ ভাবলেন, এইমাত্র চায়ের সঙ্গে মুরগীর রোষ্টটা খাওয়া হ'ল। ঠিক হল কি? যাকগে, দুটো ছোট এলাচ খেয়ে নিলেই হবে।

শেষেরটা হচ্ছে 'অভিযান ফুটবল ক্লাবে'র পারিতোষিক বিতরণী উৎসব।

সকলেই বলেছে 'আধঘণ্টার জন্যে স্যর! আপনি একবার গিয়ে দাঁড়ালেই—' তবে সত্যশরণ জানেন এই চারটে সভা ঠেলে তুলতে ছ'ঘণ্টার কম সময় লাগবে না। পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হতে কেউ দ্বিধা করবে না। দেড়ঘণ্টা করে সময় সব জায়গায় দিতে হবে।

এখন বেলা চারটে, ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা নিশ্চয়ই বাজবে।

অথচ ডাক্তারের কড়া নির্দেশ, সন্ধ্যার মধ্যে রাত্রের খাওয়া খেয়ে শুয়ে পড়ার।

হাই ব্লাড প্রেসার, ডায়বিটিস্, এ্যাজমা, গ্যাসট্রিক আলসার, পাইল্‌স্, এতগুলি ব্যাধি-বিহঙ্গ কবিরাজ বংশধর সত্যশরণের দেহ-বৃক্ষ-কোটরে আশ্রয় নিয়েছে, এবং যে হেতু সত্যশরণ নামকরা ব্যক্তি, তাই তিনি শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম করা ডাক্তারদের চিকিৎসাধীনে আছেন।

তাঁদের বহু চিন্তাপ্রসূত ব্যবস্থা-পত্রসম্মত ঔষধ-পত্রগুলি যথানিয়মে বাড়ীতে আসে, টেবিলে রক্ষিত থাকে। তবে ঘড়ি ঘণ্টা ধরে নিয়ম পালন করবেন এত সময় কোথা সত্যশরণের?

ওই সারাদিনের যতগুলো ওষুধ সব একত্র করে গিলে চিবিয়ে চুষে পান করে, অর্থাৎ যাকে যা করবার পর পর করে নিয়ে রাত্রি দেড়টা দুটো নাগাদ 'সকাল সকাল' শুয়ে পড়েন সত্যশরণ!

তবু সত্যশরণ সকলের সব চাহিদা মেটাতে পারছেন না! তবু বাইরে বসবার ঘরে সদাসর্বদা রথ-দোলের ভীড়। কারো আবেদন, কারো নিবেদন, কারো অভিযোগ, কারো অনুযোগ;

সত্যশরণ প্রাণপণ করছেন ঠিকই। কিন্তু ওরাও যে প্রাণপণ করছে। ওই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের। ঐ লনড্রী থেকে নামামৃত মাধুকরী।

অতগুলো প্রাণপণের ভার একার প্রাণপণে কোথায় 'থাই' পাবে?

হাত থেকে চুলগুলো ঝেড়ে, চুলে চিরুণী বসাচ্ছিলেন সত্যশরণ, চাকর ভবভূতি এসে জানান দিল, 'চারজন ছেলে।'

সত্যশরণ বললেন, 'বলগে যা হয়ে গেছে যাচ্ছি।'

'আজ্ঞে না নিতে আসেনি। এরা নতুন!'

ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসল ভবভূতি।

'নতুন!'

বসে পড়লেন সত্যশরণ! বললেন, 'বলগে যা সময় নেই, এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

ভবভূতি তেমনি একটু সূক্ষ্ম হাসি হেসে বলল, 'যা যা বলবার সবই বলেছি বাবু, বাকী কিছু রাখিনি। বাড়ী নেই বেরিয়ে গেছেন বললাম। একজন খিড়কির দোর আর একজন সদর দোর চেপে বসে রইল। বলল, 'রাত্তিরের মধ্যে তো ফিরবেন!'

'উঃ ভগবান!'

সত্যশরণ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'নিয়ে আয়।'

চারটি দস্তমানিক এসে প্রবেশ করল।

সত্যশরণ তাদের বসতে বললেন না, বসতে বলা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছেন।

এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে সত্যশরণের, অনেক দিন আগে যারা তাঁর কাছে আসতো, তাদের চা খাওয়াতেন, খাওয়াতেন সন্দেশ সিঙাড়া। বসতে বলতেন যত্নভরে, মন দিয়ে শুনতেন তাদের সঙ্ঘ বা সমিতির নীতি নিয়ম, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা! তাদের আশা দিতেন, উৎসাহ দিতেন।

সে কোন্ সত্যশরণ?

যে সত্যশরণ মন দিয়ে আর মননশীলতা দিয়ে ভাল ভাল সব বই লিখেছিলেন তিনিই। তিনিই না?

এখন অবশ্য লোকে মানে পাঠকে বলে সত্যশরণের লেখা আর গেলা যায় না। কিন্তু তাতে কি এসে যাচ্ছে! সত্যশরণের নাম থাকলেই পত্রিকারা ভাল ভাল কোম্পানীর বিজ্ঞাপন পায়, আর লাইব্রেরীওয়ালারা সত্যশরণের বই না কিনলে 'পতিত' হবে বলে, বেরোবার আগেই অর্ডার দেয়।

তবে আর লোকসানটা কার?

প্রকাশকেরো নয়, সম্পাদকেরো নয়, বিজ্ঞাপনদাতাদেরো নয়, সত্যশরণের নিজেরো নয়। একমাত্র লোকসান পাঠকদের।

মরুক গে যাক।

দালদা আর গুঁড়ো দুধের গোলা খেয়ে খেয়ে ভিত পাকা হয়ে গেছে ওদের।

ছেলেদের দিকে তাকিয়েই সত্যশরণ বললেন, 'হবে না!'

ওরা মর্মাহত মুখ করে বলল, 'কথা না শুনেই দূর করে দিচ্ছেন স্যর!'

কোথাও কোনখানে অতীতকালের ভদ্র আর স্নেহশীল সত্যশরণের কণিকামাত্র অবশিষ্ট ছিল হয়তো, সেই কণিকাটুকু বলল, 'কি করবো বল বাপু, আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ!'

ওরা ধূর্তহাসি হাসল, 'সবাইয়ের বেলা শরীর খারাপ হয় না স্যর, শুধু যত দোষ নন্দঘোষ আমাদের বেলায়?'

'সবাইয়ের বেলাতেই হয়। ছাড়ে না।'

'আমরাই যে ছাড়বো, একথা কেন ভাবছেন স্যর।'

'দেখ বিশ্বাস কর সত্যি আমার অসুখ।'

'জানি স্যর। কিন্তু অসুখ বললে তো চলবে না, আমরা অনেক আশা করে এসেছিলাম।'

'আমার হাই ব্লাড প্রেসার—'

'জানি স্যর.' কিন্তু আমরাও নিরুপায়।'

'আমার ডায়বিটিস এ্যাজমা—'

'জানি স্যর, আপনার কলেরা বসন্ত টাইফয়েড করোনারি থ্রম্বসিস, কিন্তু আমাদের উপায় নেই। কার্ড ছেপে ফেলেছি আপনার নামে।'

সত্যশরণ রক্তচক্ষে বলেন, 'কে তোমাদের বলেছিল কার্ড ছাপাতে?'

'কেউ নয় স্যর, নিজেরাই। ও ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমাদের আর মুখ থাকছিল না। দু' তিন বছর আপনি আমাদের ঠকিয়েছেন ভুগিয়েছেন।'

'ঠকিয়েছি? ভুগিয়েছি।'

সত্যশরণ স্তম্ভিত নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। ওরা অবশ্য নির্বিকার।

'হ্যাঁ স্যর, মিছিমিছি করে বলেছেন সময় নেই।'

'মিছিমিছি করে '

'তা ছাড়া কি বলবো বলুন স্যর। গত বছরে আপনি পাঁচশো এগারোটা সভা করেছেন, অথচ আমাদের বেলাতেই—না, এবার আর ছাড়বো না স্যর। আমাদের মুখরক্ষা করতেই হবে।'

'আমার যে প্রাণরক্ষা হচ্ছে না।'

'উপায় কি স্যর? আমরা নিরুপায়। ফিরাবে আপনি আমাদের ফিরিয়ে দেন, ওরা বিশ্বাস করবে না। বলে আমাদের ওপর আপনার আক্রোশ আছে।'

'আমি যাবো না।'

'' বললেন সত্যশরণ।

ওরা হেলল না, টলল না, দমল না। বলল, 'যেতেই হবে স্যর। নইলে আমাদের মুখ থাকবে না।'

'দেখ হে আমার মাথা ঘুরছে।'

'উপায কি স্যর? আর ক্ষতিই বা কি? গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবাই যখন ঘুরছে।'

'দেখ আমার মনে হচ্ছে আজই একটা শক্ত অসুখে পড়ব আমি।'

'কোন ক্ষতি নেই স্যর! ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যাবো। তবু মুখটা থাকবে আমাদের।'

ভবভূতি এসে বলল, বাইরে গাড়ী নিয়ে লোক এসেছে।'

সত্যশরণ ভাবলেন, পার পেলেন। বললেন, 'ওই দেখ রথ এসে গেছে।'

'আসুক।' তাচ্ছিল্য ভরে বলল ওরা, 'আমরা দরজা চেপে দাঁড়াচ্ছি। আগে কথা দিন।'

'দেখ আমি আর পারছি না।'

'না পারলে চলবে কেন স্যর?'

'দেখ হে আমি যদি হঠাৎ আজ মারা যাই, কে তোমাদের সভা করবে?'

এবার মর্মাহত হ'ল ওরা 'আমাদের [illegible]তা সাধতে মারা পর্যন্ত যেতে চাইছেন স্যর?'

'চাইছি না। তোমরাই চালিয়ে যাচ্ছো। মরলে করবে কি?'

'যতক্ষণ না পচে উঠছেন স্যর, ঠিক চালিয়ে নেব। তারপর শোক সভা করবো।'

'বার ওরা তাড়া দিচ্ছে।'

'যাচ্ছি যাচ্ছি।' সত্যশরণ বলেন, 'দেখ আমার কান্না পাচ্ছে—'

'আমাদের তার চাইতে বেশী স্যর।'

'দেখ, ডাক্তার আমায় বলেছে ফুল রেষ্ট নিতে। অথচ এই দেখ একদিনে চার পাঁচটা করে সভা, সপ্তাহে দু'খানা করে উপন্যাস—'

'আজ্ঞে সেই আক্ষেপই তো করছি। সবাইযের সব চাহিদা মেটাচ্ছেন।'

সত্যশরণ রগটা টিপে ধরে কাতরমুখে বলেন, 'স্বর্ণহংসীর গল্প জানো?'

'দেশের সবাই জানে স্যর। কিন্তু সবাই সোনার ডিম পাবে আর আমরাই—'

'সোনার ডিম আর পাচ্ছে না কেউ, বুঝলে? যা পাচ্ছে সে হচ্ছে নাড়িভুঁড়ি। স্বর্ণহংসীর পেট চেরা হয়ে গেছে।'

'আমরা একা চিরিনি স্যর।'

বেশ পরে এসো কথা হবে।'

ও ট্রিকসে ভুলব না স্যর! কথা দিয়ে যেতে হবে।'

'আচ্ছা আমার অবস্থা কি তোমরা কিছুতেই বুঝবে না?'

সত্যশরণ সহসা ধমকে উঠলেন।

ওরা কিন্তু চমকে উঠল না। সমান তেজে বলল, 'আমাদের অবস্থাই বা আপনি বুঝছেন কই স্যর? বিবেচনা করছেন কি আমাদের মুখ থাকবে কি করে? কার্ড ছাপিয়ে ফেলেছি। আপনাকে নিয়ে যেতে না পারলে ওরা আমাদের ছিঁড়ে খাবে না?'

'ওরা কারা?'

শিথিলভাবে বললেন—সত্যশরণ!

'আজ্ঞে স্যর, জনসাধারণ!'

'জনসাধারণ! কোথায় তারা?'

ছেলেগুলো সত্যশরণের হাল ছেড়ে দেওয়া ভাব বুঝে টপাটপ চারখানা প্রণাম করে ফেলে, এক এক গাল হেসে বলে, 'আজ্ঞে স্যর মালিপাঁচঘরায়। এই যে কার্ড "মালিপাঁচঘরা সাংস্কৃতিক সংঘ"। কাল এই সময় নিতে আসবো—"

ভবভূতি এসে বলল, 'ওরা মহা হল্লা করছে বাবু।'

'চল বাবা চল।' বলে সভার উপযুক্ত বেশভূষা করতে গেলেন সত্যশরণ। মালিপাঁচঘরাও সাফল্যের হাসি হেসে চলে গেল।

কিন্তু চারটে সভা আর শেষ করতে পারলেন কই সত্যশরণ?

দ্বিতীয় সভাটাতেই 'মাথা ঘুরছে' বলে মাইক ছেড়ে সরে এসে বসে পড়েছিলেন, তবু তৃতীয়রা 'একবার অন্ততঃ দেখা দেবেন চলুন স্যর'—বলে প্রায় পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেল।

ব্যস, সেখানেই!

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে, বার তিনেক 'আপনারা আমাকে, আপনারা আমাকে—আপনারা আমাকে—'

বলেই মঞ্চের ওপর লটকে পড়লেন সত্যশরণ।

'এঁরা তাঁকে কি' সে কথাটা আর শেষ করে উঠতে পারলেন না। সেটা চিররহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

বিখ্যাত লোকের মড়া, বাসি না হয়ে উপায় নেই।

পরদিন বিকেলে যখন 'মালিপাঁচঘরার' ওরা সত্যশরণকে নিতে এল, তখনও শবদেহ শ্মশানে যায় নি, ফুল সাজানো হচ্ছে।

ফুলের ভারে খাট ভেঙে পড়বার জোগাড়।

কারণ সত্যশরণ শুধু একটি শ্রেণীর নয়, দেশের সর্বশ্রেণীর। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, রঙ্গমঞ্চ ও ছায়ামঞ্চ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিধান সভা, সঙ্ঘ, সমিতি লাইব্রেরী, মঠ, মন্দির, আশ্রম ইত্যাদি করে সকলের তরফ থেকে ফুল আসছে।

এ ছাড়া জনগণের পুষ্পাঞ্জলি তো আছেই!

ভীড়ের চাপে ছুঁচ গলবার উপায় নেই, তবু মালিপাঁচঘরার পাঁচজন ওর মধ্যে ঢুকে পড়ল। গিয়ে বলল, 'শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে একবার মালিপাঁচঘরায় ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

সত্যশরণের ছেলে নেই।

ভাইপো অন্য বাড়ী থেকে এসেছে মুখাগ্নি করতে। অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে?'

'মানে অতি সোজা ব্রাদার! উনি কথা দিয়ে ছিলেন আজ আমাদের সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত থাকবেন!'

ভাইপো হতাশভাবে বলল, 'আচ্ছা, কাকীমাকে জিগ্যেস করি!'

'ক্ষেপেছেন, তিনি ছাড়েন কখনো?'

'কিন্তু যিনি কথা দিয়েছিলেন, তিনি কোথায়?'

'ভুল বলবেন না ব্রাদার! তাঁর অমর আত্মা এখানেই ঘোরাঘুরি করছে। ওনাদের কি মৃত্যু আছে?'

'এ রকম অসম্ভব কথা তো শুনিনি—'

'এ রকম মহামানবই বা কবে দেখেছেন?'

এদিকে পাড়ার ছেলেরা তুমুলকাণ্ড করছে।

দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ভাইপো গিয়ে ব্যাকুলভাবে মালিপাঁচঘরার প্রস্তাব জানায়। সঙ্গে সঙ্গে লাঠালাঠি বেধে যায়।

এরাও দেবে না, ওরাও ছাড়বে না।

মালিপাঁচঘরা সকালবেলা খবরের কাগজ দেখেছে, প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। একদল লাঠিয়াল চলে এলো মোড়ের মাথা থেকে।

অনেক চেঁচামেচি, অনেক কেলেঙ্কারীর পর একজন বিজ্ঞ অধ্যাপক কাতর অনুনয়ে বললেন, 'তোমরা এরকম করছো কেন? এই শবদেহ নিয়ে গিয়ে কি করবে?'

ওরা নরম হল।

বলল, 'আর কিছু নয় স্যর, মুখরক্ষা করবো। এবার বড মুখ করে বলে-ছিলাম—বার্ষিক উৎসবে ওঁকে নিয়ে যাবোই। না নিয়ে যেতে পারলে শেষ করে দেবে আমাদের। ফি বছর স্যর, আমাদের চিটিংবাজ বলে। বলে আমরা মিছিমিছি রটাই ওঁর কাছে এ্যাপ্রোচ করেছি। বলেছে এবারে নিয়ে যেতে না পারলে আমাদের মাথা ফাটিয়ে দেবে। এতগুলো ছেলে মারা পডবো স্যর?'

অধ্যাপক হতাশভাবে বলেন, 'কতক্ষণ সময় লাগবে তোমাদের?'

ওরা মহোৎসাহে বলে, 'বেশীক্ষণ নয় স্যর, যাবো আর ফিরবো। লরি এনে ঠিক করে রেখেছি। আমাদের সংঘের মাঠে একবার নামাবো, সকলের সঙ্গে ফটো তুলবো। আর এইটাই যে ওর শেষ সভা করা এই নিয়ে সাধারণ সম্পাদক একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেবেন। ব্যস! সে বক্তৃতাটক্তৃতা সবই রেডি করা আছে স্যর!

ওর জন্যে তু'মিনিট দাঁড়িয়ে শোক প্রস্তাব গ্রহণ, এবং আগামী অধিবেশনটা—'সত্যশরণ শোক সভা' হবে, সে সবও ঠিক হয়ে গেছে। ছেড়ে দিন স্যর। আবার কাগজে-কাগজে 'সাফল্যমণ্ডিত সভা'র বিবৃতি ছাপতে দিতে হবে ফটো ব্লক করিয়ে।'

অধ্যাপক পাড়ার ছেলেদের কাছে করজোড়ে জানান, 'সাহিত্যিক সত্যশরণ এদের কাছে কথা দিয়েছিলেন। মহামানবের বাক্য মিথ্যা হতে দেওয়া চলে না। তাই, কিছুক্ষণের জন্যে শবদেহটিকে ছাড়তেই হবে। ক্ষুব্ধ জনতা যেন ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করেন।'

ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল।

মালিপাঁচঘরার দল মহোৎসাহে খাট লরিতে তুলে, 'জয় সত্যশরণ কী জয়—' বলে চীৎকার করতে করতে পাড়ার লোকের নাকের সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

॥ বিনামা

গান শুনতে গিয়ে প্রাণ হারাল অনিমেষ আঢ্যি। অথচ কারণটা কিছুই নয়, তুচ্ছ একটু ভুল। সেই তুচ্ছ ভুলের উচ্চ মাশুল দিতে হল অনিমেষকে, আর তার ফলে অনিমেষ আঢ্যির চিরদিনের একান্ত বন্ধু হিতসাধন বন্ধুহারা হল।

গতকাল রাত্রেই ঘটনার সূত্রপাত।

দিবাকর পার্কের সেই "যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সঙ্গীত সম্মেলনে"র আসরে। অবিশ্যি ওই সঙ্গীতের ফলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেকেই প্রাণ হারাবে। হারাবে নিউমোনিয়ায়, ইনফ্লুয়েঞ্জায় বাতবৃদ্ধির নিদারুণ যন্ত্রণায়। কারণ সম্মেলন যখন চলছিল, তখন কলকাতার উপর দিয়ে হিমপ্রবাহ বইছিল, আর তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচের তলার ঘরে উঁকি মারবার চেষ্টায় সিঁড়ি ভাঙছিল।

তবু রাত দু'টো অবধি সুরের মূর্ছনায় সেই বিরাট প্যাণ্ডেল থরথর করছিল, আর হাজারে হাজারে শ্রোতা মরণপণ করে দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল স্থির হয়ে। মাথার অরণ্য দেখে মনে হচ্ছিল, বুঝি বা সমস্ত কলকাতা শহরটাই এসে হুমড়ে পড়েছে এই প্যাণ্ডেলে।

তা' পড়েও ছিল প্রায়।

না পড়ে উপায় কি, এমন "ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ বায়ু" সম্মেলন তো নিত্য ঘটে না। তাই মরিয়া হয়ে সঙ্গীত সুধারস পান করছিল সবাই।

অনিমেষও তাদের মধ্যে একজন।

অনিমেষ অবশ্য একা আসেনি, আসেও না কখনও। সেই শৈশবাবধি যখন যেখানে যায় আসে, সঙ্গে থাকে তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হিতসাধন। ওদের প্ল্যান করা আছে—যখন দুজনের মধ্যে একজনের যমের বাড়ী যাবার ডাক

আসবে, তখন অপরজনও যমকে ডাকাডাকি করে একটা টিকিট জোগাড় করে ফেলে একই রথে চড়ে বসবে।

বাকী শুধু শ্বশুরবাড়ী! যেখানে কিছুতেই দুজনে যাওয়া চলে না, তার সম্পর্কেও ব্যবস্থা করা আছে—দু'জনের কেউই বিয়ে করবে না।

অতএব গান শুনতে দু'জনেই এসেছিল।

অনিমেষ আর হিতসাধন।

কিন্তু নামের মাহাত্ম্যে কলঙ্কলেপন করে হিতসাধন যে অহিত করে বসল বন্ধুর, সে একেবারে প্রতিকারের বাইরে। যে ভুলের ফলে আজ অনিমেষ প্রাণহারা, হিতসাধন বন্ধুহারা; সে ভুল ঘটবার কারণ হিতসাধনই। "খেয়াল" গান দিয়ে সভা শেষ হচ্ছিল।

হিতসাধন খেয়ালের ভক্ত নয়। তাই সে কিঞ্চিৎ উসখুস করছিল, কিন্তু অনিমেষ একেবারে অনিমেষনেত্রে বসেছিল। খেয়াল ছিল না কখন থেকে তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে, তার নাক দিয়ে অবিরলধারে জল ঝরছে।

খেয়াল হল, যখন সেই শেষ খেয়াল গানটি শেষ হল।

হাত তুলে ঘড়ি দেখতে গেল অনিমেষ, কিন্তু হাত তুলতে পারল না। না না, একেবারে অবশাঙ্গ হয়ে যাওযার দরুন নয়, পারল না হাত নাড়তে পারার মত ফাঁকের অভাবে।

কারণ সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণকার নিশ্চুপ জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি, পা-মাড়ামাড়ি কাণ্ডে প্যাণ্ডেলেব ভেঙে পড়ে আর কি! কে বলবে, এই কাণ্ডের নায়ক-নাযিকারা এতক্ষণ "ঘর-সংসার মিছে সব" ভঙ্গীতে সঙ্গীত-রসে বিভোর হয়ে বসেছিলেন।

হাত তুলে ঘড়ি দেখতে পারল না অনিমেষ, মরুক, যাক না পারল, কিন্তু চোখ তুলে যে বন্ধুকে দেখতে পেল না!! কি হবে তবে।

দিশেহারার মত উর্ধ্বনেত্রে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে বিনা পদপাতে কেবলমাত্র ভিড়ের ঠ্যালায় শূন্যে ভাসতে ভাসতে কখন যে অনিমেষ প্যাণ্ডেলের গেটের কাছে এসে পড়েছিল জানে না, হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিমটির অঙ্কুশাঘাতে চমকে দেখল হিতসাধন ওকে কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম একটি চিমটির সাহায্যে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলছে, "বেরিয়ে আয়, শীগগির বেরিয়ে আয়! বিমল বোস ফাঁকা গাড়ীতে একা যাচ্ছে।"

বিমল বোস ওদের পাড়ার পরিচিত।

আগে একত্রে গল্প আড্ডাও ছিল এদের সঙ্গে।

কিন্তু সম্প্রতি বিমল বোস কী একটা বড ফার্মে চাকরি পেয়েছে, এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অফিস থেকে একটা আধভাঙা গাড়ী পেয়েছে। সেই অবধি বিমল বোস আর এদের তেমন চিনতে পারছে না। কাজেই অনিমেষরাও গায়ে পড়ে চিনতে যায় না। কিন্তু এই রাত দুটোর যানবাহন শূন্য আর হিমপ্রবাহপূর্ণ রাস্তার কথা স্মরণ করে সে অভিমানকে আমল দিল না হিতসাধন।

বিমল গাড়ীর দিকে এগুচ্ছে দেখেই ভীড়ের মাঝখান থেকে অনিমেষকে চিমটি দিয়ে বার করে আনতে এলো। কিন্তু একি করছে অনিমেষ। হিত-সাধনের প্রবল আকর্ষণ প্রতিহত করে, উদ্‌ভ্রান্তের মত, এদিক ওদিক হাত-পা চালছে কেন?

বিরক্ত হিতসাধন বন্ধুকে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে, 'হল কি তোর? যাবি না, মরবি?'

অনিমেষ তোৎলা জিভে একবার বলে উঠল, 'জু—জু—জু—'

দেখাচ্ছি তাকে 'জুজু'। বলে হ্যাচ্‌কা টানে বন্ধুকে টেনে এনে একেবারে বিমল বোসের গাড়ীর দরজায় দাঁড করাল হিতসাধন।

কিন্তু কী ঘটল তারপর?

নৃশংস বিমল বোস হতভাগ্য পডশীদের গাড়ীর মধ্যে ডেকে না নিয়ে গাড়ীর তলায় পিষে দিয়ে চলে গেল? সেই পেষাইতে 'তু হুয়ে' গেল অনিমেষ? নাকি হিমপ্রবাহে হিমাঙ্গ অনিমেষ গাড়ীর মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল?

কিন্তু না না, সে সব কিছু না।

বিমল বোস না—কেনা গাড়ীর মদির নেশায় একটু বেসামাল হতে পারে, তা বলে একেবারে কিছু আর জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়নি। গাড়ীতে ওদের উঠতে দিয়েছিল ঠিকই। চালিয়ে নিয়ে গিয়ে যার যার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছেও দিয়েছিল, শুধু গাড়ীতে তোলার সময় এইটুকু মন্তব্যের পাচন গিলিয়ে, "গাড়ী না থাকলে যে কী করে নিশ্চিন্ত হয়ে রাত দুটো পর্যন্ত বসে গান শুনতে পারে মানুষ! আশ্চর্য!'

কিন্তু এ আর এমন কি?

প্রাণের দাযে আরও কত কটু কষায় অম্ল তিক্ত পাঁচন গলাধঃকরণ করতে হয় মানুষকে। "যাক প্রাণ থাক মান"—ওসব কেতাবী কথা শুনতেই ভাল।

অতএব মন্তব্যে লাল হয়ে ওঠা কান পশমী মাফলারে ভাল করে ঢেকে নিয়ে গুছিযে বসেছিল দুই বন্ধুই। অতি মানী অনিমেষ আঢ্যি অপমানের জ্বালায় চলন্তগাড়ী থেকে লাফিযে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়নি।

প্রাণ বিসজন দিল অন্যত্র।

তার কারণ আলাদা।

কারণ হচ্ছে—হ্যা কারণ হচ্ছে দু' পাটি চটি।

না এক 'জোড়া' নয়, দু' পাটি।

সেই দু' পাটি চটি দু' টুকরো করে ফেলেছে অনিমেষকে।

আর আজ সন্ধ্যায়—দু' টুকরো হয়ে যাওয়া অনিমেষ আঢ্যি অনিমেষ নেত্রে বসে আছে সেই হত্যাকারী পাটি দুটি সামনে নিযে। বসে আছে প্রাণহীন শবদেহে।

দরজা ভেজানো ছিল।

সবেগে ঠেলে ঘরে ঢুকেই দৃশ্যটা দেখল হিতসাধন। দেখল সারা ঘর 'বছা'অন্ধকার, শুধু টেবলের উপর টেবল ল্যাম্পে একটি মৃদু নীলাভ আলো জ্বলছে, আর সেই মায়াময় মোহময় স্বাপ্নিক আলোর নীচে টেবলের উপর পাশাপাশি দু' পাটি জরিদার চটি।

এক পাটি জমাট রক্তের মত গাঢ লাল ভেলভেটের, অপরটি কচি কলার পাতের মত সবুজ নাইলনের। প্রথমটিতে সূক্ষ্ম জরির রেখাঙ্কিত কারুকার্য, দ্বিতীয়টিতে আলগা জরির ফুলো ফুলো থোপা।

এই যুগল অথচ বিচ্ছিন্ন দুটি চটির পাটির প্রতি ধ্যানদৃষ্টি মেলে হিমগিরির মত নিথর হয়ে বসে আছে অনিমেষ। মনে হচ্ছে দেহে প্রাণ নেই।

সশব্দে ঘরে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হিতসাধন। দাঁড়িয়ে পড়ে অস্ফুট গলায় বলল, 'কী ব্যাপার?'

বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দেবার মত শক্তি অনিমেষের ছিল না।

কারণ প্রশ্ন ক্ষুদ্র, কিন্তু উত্তর দিতে হলে বিরাট। তাই উত্তর না দিয়ে সে শুধু মুখ তুলে একটু সর্বহারার ফিকে হাসি হাসল।

হিতসাধন বেকুবের মত একটু তাকিয়ে থেকে—ফের বলল, 'কী ব্যাপার রে বাবা! এ জুতো কিসের?'

এবার কথা বলল অনিমেষ।

প্রাণের বন্ধুকে সহসা খিঁচিয়ে উঠে বলল, চেন না কিসের? দিচ্ছি চিনিয়ে। দেখ তাকিয়ে—এটা হচ্ছে ভেলভেটের, আর এটা নাইলনের। আর এই বাহারগুলো জ—'

'নিকুচি করেছে তোর ভেলভেট আর নাইলন, জরি আর রেশম।' খিঁচুনীতে বন্ধুকে পাল্লা দিয়ে হিতসাধন বলে, 'জিগ্যেস করছি টেবিলে জুতো কেন? নতুন কেনা নয়, আর এক জোড়াও তো নয় দেখছি, দু' জোড়ার দু' পাটি। মানে কি এর? কার জুতো? অর্থাৎ কাদের জুতো?'

'সেটা তো আমিও তোমাকে জিগ্যেস করতে পারি?' গম্ভীর প্রশ্ন করে অনিমেষ।

'তুমিও জিগ্যেস করতে পারো? তার মানে তুমি জানো না?' হিতসাধন নাক কুঁচকে বলে, সন্দেহ নেই এ চটির অধিকারিণীরা তরুণী। তা এই তরুণীযুগল কি হংসদূত বা মেঘদূতের মত এক পাটি করে চটির দূত পাঠিয়ে প্রেম নিবেদন করেছেন? নইলে বাড়িতে থাকতে তো তোমার মা আর পিসি, এ চটি নিশ্চয় তাঁদের নয়। তা ছাড়া তাদের জুতো তোমার ধ্যানের বস্তু হবার কথাও নয়।'

'মেলা বকবক করিসনি হিতে, ভাল লাগছে না।'

'হু! লক্ষণ ভাল দেখছি না। বলি, এরা এল কোথা থেকে?'

'কাল রাত্রে প্যাণ্ডেল থেকে।'

গম্ভীর উত্তর দেয় অনিমেষ।

হিতসাধন চমকে বলে, 'প্যাণ্ডেল' থেকে? মানে চুরি করে এনেছিস?'

'হাদামী রাখ হিতে।'

ওঃ, তা হলে চুরি নয়, তবে বোধ করি বেওয়ারিশ দেখে কুড়িয়ে এনেছিস। নাকি দেহি পদপল্লবমুদারমের ময় হাতে উঠে এসেছে। কিন্তু তাই বা কি করে হবে? ঐ তো দু' জোড়ার—দু' পাটি। একযোগে দু'-

.জনের পদপল্লবেই কি—'

'গেঁয়ো রসিকতা থামাবি তোর ?' টেবিলে ঘুষি মারে অনিমেষ।

'বেশ থামালাম। নিজেই তুই জুতো রহস্য ভেদ কর।'

'এর আবার রহস্য কি। কাল রাত্রে তোমার চিমটির তাড়নায় বেরিয়ে আসতে আসতে ভুল করে নিজের জুতোর বদলে—'

.কথা অবশ্য শেষ করতে পারে না অনিমেষ, হিতসাধন সেই যুগল চটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে উচ্চরোলে হেসে উঠল। 'নিজের জুতোর বদলে—হো হো হো, এই জরিদার জুতোর দুটো —ওরে বাবা—পেট ফেটে গেল। ও—নিমেষ, কী করে রে ? তোর সেই কড়া চামড়ার স্যাণ্ডেলের বদলে এই জরি-মখমল—'

'তুই থামবি ?'

'থামবো কি রে ! ও অনিমেষ, এ কী থামবার কথা ? এই দু'পাটি চটি দু'হাতে তুলে উর্ধ্ববাহু হয়ে শোভাযাত্রায় বেরোতে ইচ্ছে হচ্ছে যে তোকে নিয়ে। ঈস ! কী বলে তুই এই দুটো পায়ে গলিয়ে—ডাকের কথায় আছে 'পেট বোঝে মা, আর জুতো বোঝে পা। আর তুই কিনা—'

'হিতে তোর ওই দাঁতগুলো ঘুসি মেরে ছাতু করে দিতে ইচ্ছে করছে তা' জানিস ? জন্মের শোধ যাতে তোর ওই হাসি থেমে যায়। বলি পায়ের কোন সাড ছিল তখন ? আর সাড ফেরবার সময় দিয়েছিলি ? 'বিমল বোস ফাঁকা গাড়ীতে একা যাচ্ছে।' তবে আর কি, ছোট্ট বিমল বোসের কাছা ধরতে। যেন ত্রিভুবনে বিমল বোস ছাড়া আর কারো গাড়ী ছিল না—'

'থাকবে না কেন, অসংখ্য ছিল।' হিতসাধন ঝটকান মেরে বলে, 'তবে তোমাকে লিফ্‌ট দেবার জন্যে কেউ হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে বসে ছিল না নিশ্চয়।'

'না থাকতো, হেটেই আসতাম।'

'হেঁটেই আসতে। মরিরে মরি, তোমায় কী ভাষায় তারিফ করি। এতো তবু জুতো খোয়া গেছে, তাতে যে প্রাণটাই খোয়া যেত—'

অনিমেষ সহসা চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে গলার স্বর পাল্টে বলে, 'সে কী আর বাকী আছে বন্ধু ?'

হিতসাধনও সহসা বসে পড়ে বলে, 'বটে ! তাই ! তাই তোমার আজ আমার সঙ্গে কথা কওয়ায় এত অরুচি, তাই কথায় কথায় তেড়ে মারতে

আসছো। বুঝেছি। কিন্তু একদা আমি তোর বন্ধু ছিলাম অনিমেষ, সেই অধিকারে একটি প্রশ্ন করছি, চটি তো দু'জনের দুপাটি, কার পায়ে প্রাণটা বিসর্জন দিলি?'

অনিমেষ এবার কাতর কণ্ঠে একদার বন্ধুর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'সেইটাই তো বুঝতে পারছি না ভাই। এই এক ঘণ্টা ধরে ধ্যানমগ্নচিত্তে তাকিয়ে বসে শুধু জুতো থেকে প্রকৃতি বিচারের চেষ্টা করছি।'

'জুতো থেকে প্রকৃতি বিচার!'

'হ্যাঁ। কেন নয়? এই যে এই ভেলভেটের পাটিটি দেখছিস, এর গাঢ় লাল রংটা কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না এর অধিকারিণী গভীর রহস্যময়ী? তার প্রেম গাঢ় ঘন, আর রক্তের মত উষ্ণ তপ্ত। এর গায়ের এই সূক্ষ্ম কাজটুকু যেন তার সূক্ষ্ম রুচির আর সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রতীক। আবার এই নাইলনেরটি! এ কি চোখের সামনে একটি হাস্যচঞ্চলা প্রাণোচ্ছলা সদ্য তরুণীর ছবি ধরে দিচ্ছে না? এর এই ফুলো ফুলো জরির ফুল, যেন তার ঠোঁট ফোলানোর ভঙ্গী, যেন তার আবেগের—'

'ও—নিমেষ! ডাক্তার ডাকবো?' বলে হিতসাধন।

'ডাক্তার! হিতে, তুই কি ভাবছিস আমি পাগল হয়ে গেছি? তা' নয় তা'নয়। শুধু ভয়ানক একটা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছি। জীবনে কাকে বরণ করে নেব? মহনীয়াকে না শোভনীয়াকে? রহস্যময়ীকে, না আনন্দময়ীকে, ভেলভেটকে না নাইলনকে? আমার খোয়া যাওয়া প্রাণটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এদিক থেকে ওদিক, আর ওদিক থেকে এদিক করছে।'

হিতসাধন পেঁচার মত মুখ করে বলে, 'বুঝছি তোমার ~ ম্ব থেকে আমার স্রেফ বিলোপ ঘটে গেছে। যাক্ আজ থেকে আমার চক্ষে তুমি মৃত। কিন্তু মেষত্বপ্রাপ্ত—ও নিমেস্ আমাদের যে একটা কন্‌ডিশান ছিল—'

'সে কথা ভুলে যা ভাই। আজ আমার জীবন-মরণ সমস্যা!'

'সমস্যা যখন, তখন ওই মরণটাই থাকবে, জীবনটা যাবে। যাক্। তবে আমি যাবার আগে একটা উপদেশ দিয়ে যাই, হৃদয়কে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে না দিয়ে, নিক্তির কাঁটার মত বাগিয়ে ধর, আর তার এক দিকে চাপাও ওই তোমার সবুজ নাইলন, অপরদিকে চাপাও লাল ভেলভেট, দেখ কাঁটা কোনদিকে ঝোঁকে।

'তাই বলছ ?'

'তাই বলছি। আর ভাবছি শেষ কালে কি না এত দিনের প্রাণটা বিসর্জন দিলি তুচ্ছ একটা চটির তলায়! এর থেকে যদি দোতলা বাসের তলায়—'

'ভুল করছিস হিতে, একটা চটি নয়, দুটো—'

'তা' ওই দু'পাটি চটি দুহাতে আঁকড়ে জীবনটা কাটিয়ে দে। কোন সংঘর্ষ আসবে না। চটিধারিণীদের তো আর পাচ্ছিস না।'

'পাচ্ছি না। বলিস কি ? পেতেই হবে রে। রূপকথার সেই রাজপুত্রও তো পরীর জুতোর এক পাটি থেকেই—'

'থামো হে রাজপুত্র। এটা রূপকথার যুগ নয়।'

অনিমেষ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তা' বটে। এ যুগে রূপও আছে কথাও আছে, নেই শুধু রূপকথা। কিন্তু যে যুগে যা। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দিবি ?'

'হ্যাঁ এই দুটি জুতোর বিবরণ দিয়ে।'

'আর তোর সেই স্ত গুলটা—'

'চুলোয় যাক।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটায় মনস্থির করবি '

'স্থির করতে পারছিনে হিতে, ভয়ানক অস্থির হয়ে আছি। হৃদয়টা গেছে, কিন্তু বুঝতে পারছিনা কার পায়ে। যাক পরশুর কাগজগুলো দেখিস। কাল দিয়ে দেব বিজ্ঞাপনটা।'

'শুভমস্তু। কিন্তু তুমি আমার কাছে মৃত, এই জেনো।'

হিতসাধন চলে যায়।

আর যেতে যেতে ভাবে কার কাছে আত্মবিক্রয় করবে অনিমেষ ? গাঢ় লালে, না ফিকে সবুজে ? প্রাণের গভীরতায়, না প্রেমের উচ্ছলতায় ?

পরশুর কাগজ খুলে কিন্তু 'হাঁ' হয়ে গেল হিতসাধন। বিজ্ঞাপন দিয়েছে অনিমেষ চটির বিবরণ দিয়ে, তার সঙ্গে লিখেছে 'ফটোসহ আবেদন করুন'।

ফটো চেয়েছে কোন সাহসে ?

কিসের ফটো চেয়েছে ? মুখের না পায়ের ?

থাকতে পারল না হিতসাধন, কিছুতেই পারল না কৌতূহল চেপে রাখতে। সমস্তটা দিন মান নিয়ে বসে থেকে বিকেলের দিকে মানকে খুইয়ে চলেই গেল

বিনামা

বন্ধুর বাড়ী।

গিয়ে বলল, 'এটা কি ?'

'কোনটা ?'

'এই ফটোটা ? কী এ ? পায়ের ফটো ?'

'পায়ের ? না বন্ধু পুরো মানুষটারই। কি করি, একদিকে লাল দুর্বার বেগে টানছে, একদিকে সবুজ প্রবল বিক্রমে আকর্ষণ করছে, তাই—কিন্তু এদিকে মহা বিপদ !'

'বিপদ !' মুখটা করুণ হয়ে ওঠে হিতসাধনের। যতই হোক 'ইযে' বেলাকার বন্ধু ! বলে, 'বিপদ কিসের ভাই মেসত্বপ্রাপ্ত অনিমেষ।'

'আরে ভাই সেই 'ফটোসং'র খেসারৎ ! ভেবেছিলাম লাল সবুজ দুজনের ফটো থেকে বেছে বেছে নেব কে বেশী মনোগ্রাহিণী। কি করে জানবো, জীবনে যাদের কখনো জুতো হারায়নি, ভেলভেট আর নাইলন যারা চোখেও দেখেনি কখনো, এমন সব মেয়ে দলে দলে আসতে থাকবে !'

দলে দলে।'

'না তো কি ? সকাল থেকে খালি মহিলা তাড়াচ্ছি ?'

'মহিলা তাড়াচ্ছি ?'

'না তা নয় ? ভোর থেকে—অর্থাৎ কাগজ বেরোনোর ঘণ্টাখানেক পর থেকে সুরু। পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ; কুমারী থেকে বিধবা, উজ্জল শ্যাম থেকে আবলুশ কাঠ, পাকাটি থেকে পাটের গাট, কাতারে কাতারে আসছে, আর প্রশ্নশরাঘাতে আমাকে একেবারে ভীষ্ম বানিয়ে ছাড়ছে।'

'কিসের প্রশ্ন ? ওই এক পাটি জুতো সম্পর্কে ? সবাই চাইছে ওই জুটো ?'

'না ভাই, জুতো কেউ চাইছে না, চাইছে আমাকে। সকলের প্রশ্ন আমার বয়স কত, কোথায় চাকরী করি, কত মাইনে, বাড়ীটা ভাড়াবাড়ী না নিজের বাড়ী, আরও ভাই আছে না আমিই একা ? বাড়ীতে ক'জন মেম্বার, কে কে গলগ্রহ, এই সব। ওদের ধারণা জুতোটা হচ্ছে ছল। এটা আমার 'পাত্রী চাই'যের বিজ্ঞাপনের এক অভিনব পন্থা।'

হিতসাধন কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে বলে, 'মহিলারা নিজেই এসে হানা দিয়েছিলেন ? লজ্জা-টজ্জা কি উঠে গেল দেশ থেকে ?

অনিমেষ বলে, উঠে—না উঠে যাবে কেন, উঠে কেউ যায় না, শুধু বাসা

বদলায়। লজ্জা মহিলাদের হৃদয় ছেড়ে পুরুষের হৃদয়ে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে লজ্জায় মারা যাচ্ছিলাম আমিই।'

হিতসাধন বলে, 'তার মানে অতঃপর পাঠ্য পুস্তকে লেখা হবে 'লজ্জা পুরুষের ভূষণ'। যাক। এখন ভাল পরামর্শ শোন, বৃথা মরীচিকার আশায় বসে না থেকে ওদের মধ্যেই কাউকে বেছে নে। আর ওই চটি ছুটি চন্দন-কাঠের বাক্সয় তুলে রেখে দে। যখন জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একটু সান্ত্বনা খুঁজবি, তখন এক একবার খুলে দেখবি।

'খুন করবো তোকে' বলে অনিমেষ সহসা লাফিয়ে উঠে ছু'হাতে বন্ধুব গলাটা টিপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে উদার হাসি হাসে, 'কী বলবো হিতে, সাপেব ছোবল তো কখনো খাসনি! ওই ছু'খানি চটি আমার মনের মধ্যে যে ঝড তুলেছে, তার ধাক্কা যদি বুঝতিস!'

'বেশ তো না হয অনুমানেই বুঝলাম। না মরেও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা যায়। কিন্তু ধর তাদের দেখা পেলি। কিন্তু তখন? প্রাধান্য দিবি কাকে? মালা বদল করবি কার সঙ্গে?'

'বুঝতে পারছিনা হিতু!'

'হিতু' ডাকে হিতসাধনের মনটা একটু গলে, সে নরম গলায় বলে, 'আমি বলি, ওই লাল ভেলভেটই ভালো। একটু গভীর, একটু গম্ভীর একটু—'

'না হিতে, তুই বুঝছিস না—' অনিমেষ মাথা নেড়ে বলে, 'মনে হচ্ছে তাব সঙ্গে বাস করতে করতে বড্ড বেশী সিরিযাস হয়ে যাবো আমি। হযতো হাসতেই ভুলে যাবো!'

'তবে ওই সবুজ নাইলন! বেশ উজ্জ্বল, উচ্ছল, চঞ্চল, জীবনের কোথাও কোন দাগ কাটবে না—'

'খবরদার হিতে', গর্জন কবে ওঠে অনিমেষ 'আমার বৌকে নিয়ে অত বিশ্লেষণ চলবে না। কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুই চাস সে ঘর সংসার সব ভাসিয়ে দিয়ে শুধু স্বামীর বন্ধুদের ডেকে ডেকে চা খাওয়াবে, বাড়ীতে আড্ডার আসর বসাবে, আর রাতদিন মুখে চোখে পেণ্ট করবে—'

কথা শেষ করতে পায় না, অনিমেষের ছোকরা চাকর নিধু হেসে গড়াতে গড়াতে এসে হাজির হয়, 'দাদাবাবু—একটা মেয়েছেলে—'

'মেয়েছেলে, তার হাসির কী আছে?' ধমকে ওঠে অনিমেষ, 'সকাল

থেকেই তো মেয়েছেলে দেখছিস—'

'হাসির কী আছে! নিধু আরও জোরে হাসতে থাকে, 'চলুন দেখবেন চলুন 'কী' আছে। মুখের পানে তাকাবেন না, পায়ের পানে তাকাবেন।'

'পায়ের পানে—' —গলা কেঁপে ওঠে অনিমেষের।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দু'পায়ে—হি হি—দু'পায়ে—দু'রকম—'

অনিমেষ চেঁচিয়ে ওঠে, 'হিতু, আমার মন বলছে এ সেই।'

'আমারও মন তাই বলছে মেষ! শুধু ভাবছি কোনটি!'

নিধু ছুট মারে।

কারণ হঠাৎ বাইরে একটি প্রবল কণ্ঠের ধমক ওঠে।

দু'বন্ধুও ছোটে।

বাইরে এসে দু'জনে নিষ্পলক নেত্রে দেখে একটি আঁটসাঁট সুরূপসী মহিলা। বিরক্ত বিরক্ত মুখ, মাজা মাজা গাল, আর মুখ কপাল গাল সব থেকে আভিজাত্য যেন ছলকে পড়ছে। পরণে ধনেখালির শাদা খোলের শাড়ী, পায়ে—হ্যাঁ পায়ে, অর্থাৎ এক পায়ে লাল ভেলভেটের এক পাটি, আর অন্য পায়ে অনিমেষের কড়া চামড়ার স্যাণ্ডেলের এক পাটি।

'আপনি অনিমেষ আঢ্য? বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনি?'

বলা বাহুল্য অনিমেষের বাক্‌শক্তি অপহৃত।

সে শুধু তোৎলাতে থাকে।

'রাখুন আপনার তোৎলানি—' মহিলা আরও জোরে ধমক দেন। 'ভেবেছেন কি? মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কি করবার এর থেকে সভ্য কোন উপায় আবিষ্কার করতে পারেন নি বুঝি? বার করুন আমার জু তা।

ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে ভিতর থেকে সেই অনেক আবেগে রোমাঞ্চময় চটির পাটিটি নিয়ে এসে সামনে রাখে অনিমেষ।

মহিলাটি তীব্র দৃষ্টিতে একবার দু-জনের দিকে তাকিয়ে স্যাণ্ডেলের পাটিটা পা থেকে ছুঁড়ে রাস্তায় ছিটকে ফেলে দিয়ে, নিজের লাল ভেলভেটে খালি পাটা গলিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে যান।

অনেকক্ষণ সে দিকে হা করে তাকিয়ে থেকে অনিমেষ বলে, 'দেখলি? 'প্রকৃতি বিচার' কাকে বলে বুঝলি? বলিনি, ওই লালকে নিয়ে ঘর করতে হলে আমি হাসতে ভুলে যাবো!'

'যাক্ ভালই হ'ল। এবার নিশ্চিন্ত মনে সবুজকেই—কথার মাঝখানে একখানি রিকশা এসে সামনে থামে। তার মধ্যে একটি একাকিনী মহিলা।

কিন্তু এই কি আশা ভরসা স্থল?

শীর্ণকায় কর্কশ-কণ্ঠি একটি চল্লিশোত্তীর্ণা মহিলা ভাঙা কাঁসরের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এটাই কি তিন নম্বর তারিণী তলাপত্র লেন? অনিমেষ আঢ্যের বাড়ী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কা'কে চাই?'

'কাউকে না। চাইতে যাবো কোন দুঃখে? নিজের জিনিস দাবী করতে এসেছি। কই জুতো কোথায়, বার করুন। জুতো বার না করেন তো, আমি আপনার ফটো চাওয়া বার করছি।'

'আজ্ঞে রাস্তার সামনে চেঁচামেঁচি না করে, ভিতরে—'

'ভিতরে? কেন কী আমার দায় পড়েছে? জুতোটা আনুন। জুতো আনুন।'

অনিমেষ ধীরে মন্থর গতিতে গিয়ে নাইলনের চটিটি নিয়ে আসে।

মহিলাটি তৎক্ষণাৎ নেমে এসে সেটি রিকশায় তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন, 'কী বলবো আপনি ভদ্রলোক! নইলে আগাপাশতলা এই চটি দিয়ে—'

'থামুন থামুন।'

'থামবো? কেন থামবো? জানেন, আমার মেয়ে জুতোর শোকে আজ তিনদিন বাড়ী থেকে বেরোয় নি।'

মেয়ে! ভগবান! তবে তুমি আছ।

অনিমেষ সহাস্যে কাছে এসে বলে, 'তাই বলুন, আপনার মেয়ে। চটিটা আপনার মেয়ের খুব প্রিয় বুঝি?'

'চুপ করুন! আমার মেয়ের কী প্রিয়, তাই নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে না। আর—ভবিষ্যতে আর কখনো এমন ভুল করবেন না, মনে রাখবেন।'

ভদ্রমহিলা ফের রিকশায় চড়ে বসে তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'জুতোর বদলে ফটো! কেউ আর মানে বোঝে না? ধানের ভাত তো খায় না কেউ খায় ঘাসের বিচি। যাক্ ঠিক আছে, আপনার যে স্যাণ্ডেলের পাটিটা আমার

বাড়ী চলে গেছে, সেটা চাকর পাঠিয়ে আনিয়ে নেবেন। এই নিন ঠিকানা। এই কাগজে লেখা আছে। চাকর পাঠাবেন, মনে থাকে। খবরদার নিজে যেতে চেষ্টা করবেন না।'

রিকশা দৃষ্টি ছাড়া হতেই হিতসাধন বলে ওঠে, 'যাঃ হয়ে গেল। কূলে এসে তরী ডুবল।'

অনিমেষ অশ্রু ছলছল চোখে বলে, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তুই আর কী দেখছিস?' হিতসাধন খিঁচিয়ে ওঠে, 'তোর পানসি তো ভেসে উঠল। ডুবতে আমারই ডুবল। ভাবছিলাম ফাঁড়া কাটল, যমের বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত দু'জনে একসঙ্গেই থেকে যাওয়া চলবে। সে আশায় ছাই পড়ল।'

'তার মানে?'

'মানে বোঝ না? ন্যাকা? ঠিকানা লেখা কাগজ দিয়ে যাবার মানে কি?'

'আরে ভাই সেথ নে তো দিব্যি দেখো।'

'বকিস কেন। দিব্যি। বাটির ওপর বাটি সাত দিব্যি কাটি।' নার চরিত্রের চাতুরী বুঝিস না? সত্যি আপত্তি থাকলে নিজের চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিত। তোর চাকরের জন্য ঠিকানা দিয়ে যেত না। যাবার আগে কেমন ফিক্ করে হেসে গেল দেখলি না?'

'অ্যাঁ কী বললি।' অনিমেষ ফুটপাথের ধুলোর উপরই বসে পড়ে 'হেসে গেলেন? ঠিক বলছিস? হিতে কি করলি ঠিকানার কাগজটা কোথায় রাখব।'

'ছি ছি অনিমেষ।' বলে আরও কিছু বলতে যায় হিতসাধন, কিন্তু ততক্ষণে অনিমেষ সেই ঠিকানার কাগজ হাতে নিয়ে হাওয়া।

হিতসাধন একদৃষ্টে সে দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে 'ধুত্তোরি পৃথিবী' বলে হন হন করে চলে যায়।

রাস্তার ধারে অনিমেষের সাথীহারা এক পাটি স্যাণ্ডেল আকাশমুখো হয়ে পড়ে পড়ে নিঃশব্দে কৌতুকের হাসি হাসতে থাকে।

॥ নিরুপায়

শুধু পুরুষ ? মেয়ে নয় ?

নিমন্ত্রণ পত্রখানা হাতে নিয়ে রামানুজ বন্ধুকে প্রশ্ন করলো—'মেয়েদের বলছো না তাহলে ?'

বন্ধু অরবিন্দ এ রকম সরাসরি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলো না অবশ্যই, ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বলে—'ইচ্ছে তো খুবই ছিলো ভাই, কিন্তু বাড়ী ছোটো, দেখা শোনার লোক কম—বুড়োবয়সের সখ, বুঝতেই পাচ্ছো নিজেকেই সব করতে হচ্ছে—তোমাদের ব্যাপারে যাহোক চলবে, শ্রীমতীদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হলে—'

রামানুজ হেসে বলে—'আরে অতো ঘাবড়াচ্ছো কেন ? আমি শুধু জানতে চাইছি ! মানে আর কি, তাহলে ভাই আগেই বলে রাখি, আমাকে তোমার বিয়ের ভোজে বাদ বলেই ধরে নাও।'

একথা কেন বলছো ভাই ? অরবিন্দ কাতর ভাব দেখিয়ে বলে—

'[illegible]ক বাদ দেবো, এমন অন্যায় আদেশ কেন ?'

ভেতরের কথা বলবো ভাই ? রামানুজ ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলে—তোমার বৌদি বিয়েবাড়ীতে নেমন্তন্ন যেতে এতো ভালোবাসে যে, ওকে ফেলে রেখে যেতে ঠিক মন সরে না।'

অরবিন্দের জীবনে অরবিন্দ এমন কথা কখনো শোনেনি। কিন্তু শুনলো যখন, তখন তার প্রতিকারকল্পে কিছু বলতেই হয়। তাই ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে—সে কি ! 'সে কি ! আমি বৌদিকে ভালো করে বলে যাচ্ছি, তুমি ভাই অবশ্য করে ওঁকে নিয়ে যাবে।'

'আহা, মিছে আবার কেন ঝামেলা বাড়াবে ? মেয়েরা কেউ যখন যাচ্ছেন না তখন শুধু একা ওঁকে বলাটা কি ভালো দেখাবে ? আমি বরং

না গেলাম!

'অসম্ভব! তুমি যাবে না, এ হ'তেই পারে না। বৌদির স্পেশাল নেমন্তন্ন! চলো ভেতরে। আমি ওর সঙ্গে দেখা করে ভালো করে বলে যাই।'

'এই দেখো, তোমাকে ভেতরের কথা খুলে না বললেই হ'তো! যাতে সাতখুন মাপ হয়, সেই শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে ডুব দিলেই ভালো ছিলো। সত্যেশ, বিরাম, অহীন ডাক্তার এঁদের স্ত্রীরা কি বলবেন শুনলে? কারণটা কি দেখাবে?'

অরবিন্দ হেসে ফেলে বলে—'যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তোলে, বলবো, এ হচ্ছে রামানুজের মহান্ প্রেমের সম্মানার্থে। কই বৌদি, বৌদি! ডাকবে? না হয় চলোনা ভেতরে।'

'তিনি বোধ হয় এখন পূজোর ঘরে। সারা সকাল তো সেইখানেই কাটে কি না।'

এমন একটি উচ্চাঙ্গের হাসির সঙ্গে কথাটা শেষ করে রামানুজ, যাতে মনে হ'তে পারে তা'র স্ত্রী সংসারের অপর সকলের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে! মনে হতে পারে—মূল্যবান সকালটা সংসারের দেনা-পাওনা না মিটিয়ে, শুধু ঈশ্বরের দেনা শোধ করতে বসাটাই যথার্থ বাহাদুরীর কাজ।'

অরবিন্দ মনে মনে বোধকরি নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলে মুখে হতাশভাব দেখিয়ে বলে—'তবে আর কি বলবো। সেখানে তো আর এ নরাধমের উঁকি চলবে না। কিন্তু তুমি ভাই আমার হয়ে বলবে ভালো করে। মোট কথা, আমার বৌভাতে তোমার অনুপস্থিতি একেবারেই সহ্য হবে না।'

অন্য বন্ধুর বাড়ী এসে অরবিন্দ রামানুজের অপূর্ব পত্নীপ্রেমে গল্প না করে থাকতে পারলো না। বললো, 'আমি তো ভাই অপতিভের একশেষ। যাই হোক বলি ভাই—ও আর—বিরক্তর পালায় কাজ নেই। তোমাদের কাজ তোমরাই করে নেবে। শ্রীমতীকে নিয়েই যাবে। একান্ত অনুরোধ।'

'আরে সকলকে কেন আবার? বন্ধু বাধা দেয়—আমাদের প্রেমটা অতো জোরালো নয়। বরং শ্রীমতীকে বাদ দিয়ে একা কোথাও যেতে পেলেই গা ঝরঝরে থাকে!'

'সর্বনাশ! ভয় লাগিয়ে দিচ্ছো যে হে। আমার এই রঙিন চশমা পরা চোখের স্বপ্ন এক্‌খুনি মুছে দিও না ভাই, অন্তত ফুলশয্যাটা হতে দাও!'

মোটকথা, যেও দু'জনে।'

'অগত্যা!'

রামানুজের পত্নী বাৎসল্যের প্রভাবে বন্ধুদের সব সস্ত্রীক নিমন্ত্রণই বাহাল হয়ে গেলো।

এরকম উৎসবে শ্রীমতীদের যে সাজের ঘটায় বান ডাকবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। একে তো অরবিন্দর বাড়ীতে ওপরওলার বালাই নেই, স্বয়ং কর্তা হয়ে বিয়ে করছে, তা ছাড়া সামাজিকতার দাযটা তেমন বড়ো করে না ধরে নেমন্তন্নও করেছে তরুণ-তরুণী বেছে বেছে।

কাজেই নিদায় আমোদ, নিরঙ্কুশ স্ফূর্তি!

দালানে ছোটো ছোটো টেবিল পড়েছে, চারজন করে বসার মতো। সুসজ্জিতা মহিলারা ঘোরাফেরা করছেন, রূপে-রসে টলটলে।

রামানুজের স্ত্রী সারা সকাল পূজোর ঘরে কাটান বলে যে প্রসাধনে কিছু বৈরাগ্যের ছোঁযাচ লাগিছেন তা নয়। তার রূপ এবং রূপচর্চা দুটোই দেখার মতো! নতুন বৌয়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন তিনি। খাবার ডাক পড়লেই হয়।

হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করলেন। দারুণ যন্ত্রণা। ছটফট করতে থাকলেন তিনি। এমন অবস্থায় পরের বাড়ীতে থাকা চলে না। কে বলতে পারে এ যন্ত্রণা মেনিঞ্জাইটিসের পূর্ব লক্ষণ কি না।

রামানুজের গাড়ীর কাছে ছুটে এলো অরবিন্দ, এলো আরো দু'তিনজন।

কর্তা—'চলে যাবে, সে কি কথা? এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলেই ঠিক হয়ে যেতো। আমার তিন তলার ঘর খুলিয়ে দিচ্ছি, পাখা রয়েছে, কেউ ডিসটার্ব করবেনা। বুঝলে রামানুজ, না খেয়ে চলে যাবে এ হতেই পারে না। আমি বৌদিকে বলছি।'

রামানুজ হাতজোড় করলো—'বলার কোনো দরকার নেই। ওঁর ভীষণ 'প্রেসার', সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়। গোলমালে, বেশী আলোয় হঠাৎ কেমন বেড়ে গেছে। অভদ্রতা মাপ করো ভাই।'

'আহা-হা, ওকথা কেন? কিন্তু তুমি তা'হলে বৌদিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আর একবার চলে এসো না? ক' মিনিটের রাস্তা?'

'পাগল! ওঁর এখন শুশ্রূষার দরকার।'

এরপর আর কথা চলে না।

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি কিছু খাবার নিয়ে গাড়ীতে তুলিয়ে দিলো।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ঝড় উদ্দাম হয়ে ওঠে।

সত্যেশ বললো—'মেয়েদের ব্যাপার তো? সহসা কারো সঙ্গে মান-অপমানের পালা ঘটে গেছে বোধ হয়। অমনি প্রেসার বেড়ে গেছে।'

'বলেছো মিথ্যে নয়,' বললো বিরাম—আমারও সেই রকম সন্দেহ হলো। নইলে এই তো দেখছিলাম পার্টিতে গহনায় ঝলমলিয়ে পরীটি হয়ে বেড়াচ্ছিলেন।'

অতীন ডাক্তার বললো—'আহা মিথ্যে বদনাম দিচ্ছো তোমরা। রামানুজের বৌয়ের সত্যিই হাই প্রেসার। ওই জন্যে রামানুজ খেলাধুলো, বেড়ানো, আড্ডা—সব কিছুই প্রায় ছেড়েছে। বলে—ওকে একা বাড়ীতে রেখে নিজে আমোদ করতে যেতে মন সরেনা ভাই।'

'তা ছি ছি ছি! লোকটা একেবারে গোল্লায় গেছে! দলের মধ্যে ওরই না সকলের আগে বিয়ে হয়েছিলো? কোন্ না দশ বছর হ'তে চললো? এখনো এই?'

—আরে ভাই, শুনলে অবাক হবে, যে রামানুজ জীবনে বিলিতি ছবি ছাড়া দেখতো না, বাঙলা ছবিকে 'ছবিই' বলতো না, সে এখন বাঙলা ছাড়া দেখে না। বলে—'বৌ ইংরিজি বোঝে না, মেট্রোয়, লাইটহাউসে যেতে চায় না, কি করি? একা দেখে সুখ হবনা।'

আরো পাঁচজনে পাঁচরকম উদাহরণ দিতে সুরু করে। কবে রাম বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিঙ্ যাবে বলে কথা দিয়ে ফেলে অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে ছুটে এসে যাওয়া ক্যানসেল্ করে গিয়েছিলো, কি করে বৌকে বিরহজ্বালায় জ্বলতে দেবে না বলে তাদের আড্ডা ভেঙেছে, কি রকম করে যখন যেখানে যায় বৌ ঘাড়ে করে যায় এসব কথা খেতে খেতেও চলে।

মহিলারা একটু-আবটু ফোড়ন দেন, স্বজাতির হয়ে টেনে বলেন, পুরুষ জাতির নিন্দাবাদ করেন। সকলকে আদেশ দেন রামানুজের পত্নী-প্রেমকে আদর্শ হিসেবে নিতে। তবে খুব বেশী মুখ ফোটে না ওদের। কারণ স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে তেমন আলাপ কারুরই ছিলো না। তার ওপর আবার একত্রে খেতে বসতে হয়েছে। অস্বস্তিকর ব্যাপার। ঠিক এতে অভ্যস্ত হ'বার মতো

পরিবেশ এদের কারোরই নয়।

অরবিন্দ হেসে বলে—'আচ্ছা তোমরা অতো নিন্দে করছো কেন বেচারার? লোকটা সত্যিই প্রেমিক। দেখছো না ওর মনপ্রাণ চৈতন্য সব কিছু একেবারে প্রিয়তমাতে আচ্ছন্ন।'

বিরাম গম্ভীর ভাবে বলে—'তা হলে স্বীকার করতেই হবে—মিসেস্ রামানুজের প্রেসারটা হাই!'

হেসে উঠলো সকলে।

আলোচনার মোড় কিছু ঘুরলো। রামানুজের মনটা যে নিতান্তই স্নেহ-কোমল এবং সেই দুর্বলতার পঙ্কেই যে সে ডুবে মরেছে তাতে আর কারুর সন্দেহ রইলো না।

'এবার অরবিন্দ কি খেলা দেখায় দেখি। বললো অহীন—আমাদের তো ভাই বৌ জিনিসটা এতো গা-সওয়া হয়ে গেছে যে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করি, অথবা কি ব্যবহার করা উচিত, কিছুই মনে পড়ে না।'

সত্যেশ বলে—'এই চুপ! তোমার উনি রোষকষায়িত নেত্রে চাইছেন মনে হচ্ছে।'

'তার চাইতেও বেশী রুষ্ট হচ্ছেন কিন্তু অরবিন্দের নব প্রিয়তমা। লগ্ন পার হয়ে যাচ্ছে! সত্যি ফুলশয্যার মতো জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যময় দিনে বারোভূতকে ডেকে গাণ্ডেপিণ্ডে কতগুলো গেলাবার প্রথা যে কে সৃষ্টি করেছিলো আমাদের দেশে!'

এরপর ফুলশয্যার ব্যাপার নিয়ে এমন হৈ-হৈ সুরু হলো, যাতে মনে হলো না যে সাত আট দশ বছর আগে বিয়ে হয়েছে এদের, আর যাকে নিয়ে এই হৈ-চৈ করছে, সে লোকটা পঁয়ত্রিশ পার করে মাথায় টোপর পরেছে।

কিন্তু সে যাক্, যে রাতের প্রথম দিকটা এমন রঙিন হয়ে উঠেছিলো, তা'র শেষটা যে এমন ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দেখা দেবে সে কথা কে ভেবেছিলো?

অহীন ডাক্তার বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরে, স্ত্রীর বাক্যজালের হাত এড়িয়ে সবে চোখটা বুঝেছে, সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো টেলিফোন!

ডাক্তারের পরাধীন জীবন, উঠতেই হবে।

—হ্যালো! কে? একখুনি যাচ্ছি। সেই মাথাধরা থেকেই?

একখুনি, দু' মিনিট। ততক্ষণ একটু গরম জল চাপিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করো। আচ্ছা ছাড়লাম।

ডাক্তার-পত্নী নিদ্রাজড়িত বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করে—'কে আবার এখন মরতে বসলো ?'

'রামানুজের বৌ।'

'সে আবার কি ? কি হয়েছে ?'

'কি যে হয়েছে, তা তো ঠিক বুঝলাম না!—বললো, চার ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে আছে! আচ্ছা তুমি তা'হলে দোরটা দিয়ে দেবে এসো, চাকরদের আর ডাকাডাকি করতে পারি না।'

'গাড়ী বার করবে কে ?'

'হবে যাবে! আমি করবো। আমি শুধু বিরামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি যাবার সময়। রামানুজ ছোকরা যেমন বৌ-অন্ত প্রাণ, ওর ভাগ্যে বৌ টিকলে বাঁচি।'

বেরিয়ে গেলো অহীন। যাবার পথে বিরামের বাসা পড়ে, ডেকে নিয়ে যাবে। লোকবল একটা থাকা ভালো। রামানুজের বাড়ীতে কে-বা আছে। ডাক দিলো—'বিরাম নাবো তো। রামানুজের স্ত্রীর অসুখ, একবার যেতে হবে।'

বিরাম খানিক আগে ছেড়ে রাখা আদ্দির পাঞ্জাবীটা মাথায় গলাতে গলাতে নেমে এলো।

'হঠাৎ কি হলো বলো তো ?'

'ধরতে পারলাম না। ফোন করে বললো। নার্ভাস হয়ে পড়েছে আর কি ? বলতে গলা কাঁপছিলো।'

বিরাম গাড়ীতে উঠে অনুতাপের সুরে বললো—দেখো ভদ্রমহিলা সত্যিই কতো অসুস্থ, অথচ আমরা কতো কি মন্তব্য করলাম। না জেনে-শুনে কী না কি বলেছি! প্রেসারটা—'

'অতো অনুতপ্ত না হলেও চলবে। রামানুজের স্ত্রীর শরীর খুবই সুস্থ। ব্লাড্‌প্রেসার ওর কস্মিন্‌কালেও নেই।'

'তা'র মানে ?'

'মানে বোঝা শক্ত।'

রোগিণীকে পরীক্ষা করে অহীন স্টেথস্কোপ্টা গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর ভাবে বলে—'কতোক্ষণ এরকম হয়েছে?'

রামানুজ প্রায় কেঁদে ফেলে বলে—'সেই ওখান থেকে এসেই ভাই। অনেকক্ষণ স্থির হয়েছিলাম। ভাবলাম ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। কিন্তু এতোক্ষণ হয়ে যাওয়াতে অস্বস্তি হ'লো। একটু জলটল খাবে কিনা জানবার জন্যে ডাকতে গেলাম, তখনি দেখি—'

কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো রামানুজের।

'থাক্ থাক্ কান্নাকাটি করবার সময় অনেক পাবে, এখন শোনো'—অহীন নীরস স্বরে বলে—'কেস্টা ভালো করে না বুঝে সার্টিফিকেট আমি দিতে পারি না।'

'সার্টিফিকেট?' চমকে চীৎকার করে উঠলো বিরাম—'কী বলছো তুমি অহীন?'

অহীন একটু তিক্তহাসি হেসে বলে—'ঠিকই বলেছি বিরাম। দেখছো না, রামানুজ চমকে উঠলো না? রামানুজের স্ত্রী ঘণ্টা তিনেক আগে মারা গেছেন!'

নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে, ডাক্তার আর রামানুজ, ঝক্ঝকে ছোরার মতো দৃষ্টি মেলে।

মিনিট খানেক পরে রামানুজ হঠাৎ যেন হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে—'তা' আমি কি করবো? আমার কি দোষ? কেউ যদি বিষ খেয়ে শুয়ে থাকে, আমি জানবো কেমন করে ঘুম নয়।'

'তিন ঘণ্টা ধরে মাত্র এই কথাটুকুই তুমি বানাতে পেরেছো রামানুজ?'

রামানুজ এবার হেসে ওঠে।

বেপরোয়া একটা হাসি। হেসে উঠে বললো—'থানায় খবরটা তা'হলে তুমিই দিচ্ছো তো? নাকি আমিই যাবো?'

অহীন ধমকের স্বরে বলে উঠলো—'থাক অতো বাড়া-বাড়িতে দরকার নেই, বোসো চুপ করে। আমাকে ভাবতে দাও একটু।'

'আচ্ছা' বলে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে মৃতার মাথার কাছে বসে পড়ে রামানুজ। যেন কোনো কিছুতেই এসে যায় না ওর।

মিনিট খানেক রোগিণীর মুখের দিকে নির্নিমেষে দৃষ্টি মেলে চেয়ে থেকে

অহীন নিদ্রোত্থিতের মতো বলে ওঠে—'নাঃ একটা কিছু করতেই হবে। বিরাম, তুমি সত্যেশ, বারীন, নিত্যানন্দ—এদের একটু খবর দেবার ব্যবস্থা করো, বলবে রামানুজের স্ত্রী হঠাৎ প্রেসার বেড়ে হার্টফেল করেছেন। কি ব্যাপার? দাড়িয়ে রইলে যে? একা যেতে ভয় পাচ্ছো না কি? মাটি করেছে! আচ্ছা চলো, নিত্যানন্দর ওখানে পৌছে দিয়ে আসি তোমায়। রামানুজ তুমি আবার ভয় পেযে ইত্যবসরে কিছু করে বসবে না তো? বিশ্বাস করতে পারি?'

'পারো।'

গাড়ীতে বসে হতচকিত বিরাম বলে—'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না অহীন! সবই ধাঁধা লাগছে।'

অহীন কঠিন মুখে আরো কঠিন হাসি হেসে বলে—'আমার কাছে কিছুই ধাঁধা নয় বিরাম, একেবারে জলের মতো স্পষ্ট। এই রকম যে একটা ঘটতে পারে এ সন্দেহ আমার বরাবরই ছিলো। হাঁ আমি নিশ্চিত ছিলাম রামানুজের স্ত্রী একদিন অস্বাভাবিক ভাবেই মারা যাবে।'

'সত্যিই তাহলে উনি বিষ খেয়ে—'

'হা, তার চাইতেও প্রচণ্ড সত্যি, রামানুজ জেনে বুঝে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে, তখন ফোন করেছে।'

'ভাবা যায়না'—অস্ফুট স্বরে বললো বিরাম।

'সংসারে যা কিছু ঘটে, সব যদি ভাবা যেতো বিরাম! কে ভাবতে পারতো রামানুজের দাম্পত্য-জীবনটা ছিলো বিধাতার একটা নির্লজ্জ ব্যঙ্গ কে বুঝতে পারতো যে রামানুজ স্ত্রী পাছে আত্মহত্যা করে বসে এই ভয়ে বাড়ীতে কখনো বেশী করে একটু আইডিন্ পর্যন্ত রাখতে সাহস করতো না সেই রামানুজ হ্যাঁ, সেই রামানুজই অকারণ আর্সেনিকের শিশি টেবিলে রেখে ভুলতে ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ওকে সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারিনা বিরাম, ওতো মানুষ? ওকেও তো বাঁচতে হবে? দেবতা সাজবার চেষ্টা করেছিলো, শেষরক্ষে করতে পারলো না। আজীবন শুধু একটা পাগলের খেয়াল চরিতার্থ করতে বেঁচে থাকতে পারে মানুষ? পাগল, অথচ এমন পাগল নয় যে ডিভোর্স ল'য়ের আওতারে পড়বে। তবে ও কি করবে?'

'কিন্তু রামানুজের স্ত্রীর—'

'হ্যাঁ, রামানুজের স্ত্রীকে দেখলে বোঝা যেতো না ওর ওই পরীর মতন চেহারার মধ্যে একটা বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে আছে। ওদের বাহ্যিক ব্যবহার দেখলে বোঝা যেতো না রামানুজের স্ত্রী সমগ্র বিবাহিত জীবন শুধু স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে এসেছে, আর প্রতি মুহূর্তে তাকে বিষের ছোবল হেনেছে। সে বিষে শুধু তো ওকেই জর্জরিত করেনি, নিজেও জরজর হোয়েছে। যাক বিষে বিষক্ষয় হলো, কি বলো বিরাম? মুক্তি পেয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা!'

হেসে উঠলো অহীন ডাক্তার।

বোধ হয় ডাক্তার বলেই মৃত্যুকে নিয়ে হাসতে পারলো।

॥ আত্মবিস্মৃত

প্রাক্‌যুদ্ধকালের তুলনায় ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা যে অবিশ্বাস্য গুণ বেড়ে গেছে, এ কথা কে না জানে? হাড়ে হাড়েই জানে।

অসুবিধের অন্ত নেই বেচারা যাত্রীদের।

কিন্তু ট্রেনের ছায়াও যারা মাড়াচ্ছেনা, স্টেশনের ধারে কাছে পর্যন্ত ঘেঁসে না, এমন এক শ্রেণী বেচারাদেরও যে এই সংখ্যাধিক্যে কতোটা অসুবিধে হয়েছে, সেটা কি কেউ কোনোদিন লক্ষ্য করেছেন?

করেননি অবশ্যই।

করবেন এ আশা করছিও না।

একের অসুবিধের দিকে অপরের লক্ষ্য পড়বে, 'এমন দিন কি হবে মা তারা।' সে হলে তো কথাটাই পাড়তে হতো না।

দ্বিতীয় 'বেচারা' শ্রেণী হিসেবে, দুঃস্থ গল্প-লেখকদের কথা ধরছি আমি।

ট্রেনের এই কুৎসিত রকমের ভীড় বাড়ার জন্যে প্লট জগৎ কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে শুধু হতভাগ্য গল্প লিখিয়েরাই জানে।

অপরিচিত তরুণ তরুণীর মধ্যে দর্শনমাত্রে 'প্রেম সঞ্চার' করিয়ে দেবার সব চেয়ে সহজ উপায়টাই, গিয়েছে হাত ছাড়া হয়ে।

'বৃন্তহীন পুষ্পসম' নিদায় প্রেমের ছবি আঁকা, আর চলছে না।

এখন দু'টি তরুণ তরুণীকে নির্জন আলাপের সুযোগ দিতে, কতো যে কাঠখড় পোড়াতে হয়!

আজকের বাজারে—

কোন্ দুঃসাহসিক গল্প লেখক সাহস করে খাতাটি বাগিয়ে ধরেই খস্‌খস্ করে লিখে ফেলবে 'যাচ্ছিলাম দেওঘর—। নির্জন কামরায় আমি, আর এক অপরিচিতা তরুণী!'

অতঃপর সেই একাকিনীর সঙ্গে শনৈঃপন্থা প্রেমের অলৌকিক বর্ণনা। সমাজ সংসারের ধার ধারতে হয় না, অভিবাবকবর্গের রক্তচক্ষুর ভয় থাকে না, যাত্রী যুগলের হৃদয় এবং গল্প রচনার খাতা, ভরিয়ে তুলতে পারলেই হলো। কেউ বলতো না 'গাঁজা'।

কি সুখের দিনই ছিলো!

এখন?

গুছিয়ে গাছিয়ে দুজনকে ফার্ষ্টক্লাশ ট্রেনে চড়িয়ে দিলেই কি নিস্তার আছে? কিছু না হোক, দু'পাঁচজন উঠে বসে থাকবেই সেই গাড়ীতে। তবেই দেখুন সে জায়গায় প্রেমের আমদানী করতে গেলেই, কে না গাঁজার সন্দেহ তুলবে?

ট্রেনের ভীড়ের বাড়াবাড়ি হয়ে অবধি ট্রেনের রোমান্স উঠে গেছে। রোমান্স উঠে গেলে আর গল্পবৃক্ষ গজিয়ে উঠবে কোন্ কাণ্ডে ভর করে?

কিন্তু আমি আমার সদ্য অভিজ্ঞতালব্ধ একটি ট্রেনের গল্প শোনাতে পারি যেটা 'গল্প' নয়। অর্থাৎ গল্প হলেও সত্যি।

রোমান্স না থাকলেও রোমাঞ্চকর বটে!

বেশী দূর নয়—যাচ্ছিলাম কৃষ্ণনগরে।

রাণাঘাটে বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল থেকে ট্রেন যেই নড়ে উঠেছে, তখন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দরজায় ঠাসা ভীড় ঠেলে উঠে পড়লেন এক ভদ্রলোক। একহাতে দড়ি দিয়ে গলাবাঁধা দুটি ডাব, এবং অপর হাতে রুমালে বাঁধা একছড়া কলা।

বলাবাহুল্য স্থায়ী যাত্রীরা কেউই সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়ন করলেন না তাঁকে। কলার পুঁটুলিটি সযত্নে উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়েই থাকলেন ভদ্রলোক।

মনে রাখবার মতো ঘটনা নয়, এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবার মতো দৃশ্যও নয়, কাজেই চোখ আর মন দুই-ই সরিয়ে নিয়েছিলাম! হঠাৎ পাশেই একটা "আহা হা!" "ইস!" "গেলো গেলো!" শব্দে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, সেই কলারসিক ভদ্রলোক কাতর নয়নে কলার পুঁটুলিটির গায়ে হাত বুলোচ্ছেন।

কেমন যেন সন্দেহ হলো আমিই অপরাধী। অপ্রতিভ ভাবে বললাম—'কি হলো?'

ভদ্রলোক ক্ষুব্ধভাবে বলেন—'হলো আর কি! গেলো কলাটা। মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর গাছের জিনিস, তার মায়ের নাম করে দিয়েছিলো।'

আরো অপ্রতিভ হয়ে যাই। বলি—'আমার হাত লেগেই বোধ হয়—'

'তার জন্যে কি, তার জন্যে কি—' হাঁ হাঁ করে ওঠেন অমায়িক ভদ্রলোক।

অতঃপর দু' একটা কথা না কইলে ভালো দেখায় না। কইছি, ইত্যবসরে ভদ্রলোক একটি প্রকাণ্ড ডিবে বার করে দুটি পান নিয়ে দিতে আসেন। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি।

আমার সবিনয় প্রত্যাখ্যানে ভদ্রলোক সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। দরাজ গলায় বলেন—'জানি 'না' করবেন। মুখ দেখেই বুঝেছি, আপনি একেবারে গুড্ বয়। পানটি পর্যন্ত খান না। মানুষ চিনি মশাই, নইলে বেছে বেছে আপনার কাছ ঘেঁসেই বা বসলাম কেন?'

'কেন'র উত্তর ঠোঁটের আগায় এসে যাচ্ছিলো, সংবরণ করে নিই। যা মুখে আসে তাই বলবার ক্ষমতা যদি ভগবান সকলকে দিতেন!

মিনিট কয়েক জানলার বাইরে তাকিয়েছিলাম, আবার সজাগ উঠলাম কাঁধে মৃদু ধাক্কা খেয়ে! তার সঙ্গে ফিস ফিস কথা!

'দেখেছেন মশাই দেখেছেন? ওই ছোকরার রকম দেখেছেন?'

উদ্দিষ্ট ছোকরার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিই। ভয়ানক রকম কিছু চোখে পড়ে না।

ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিপথে পড়ে বোধ হয়। ফিস্‌ফিস্ নয় প্রায় স্পষ্ট ভাষায় বলে ওঠেন—'সেই থেকে লক্ষ্য করছি ছোঁড়া ওই মেয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।'

হেসে ফেলে বলি—'থাকলেই বা? ও যখন বোরকা পরে গাড়ীতে ওঠে নি, তখন ওতে আপত্তি করবার রাইট নেই ওর।'

'তা' বলে—ওই রকম গিলে খাবে?'

দুঃসাধ্য চেষ্টায় হাসি চাপতে হয়। গম্ভীর স্বরে বলি—চেষ্টা করবে হয়তো, কিন্তু পারবে কি? মনে হচ্ছে পারবে না।'

'হাসছেন আপনি? কিন্তু সেই থেকে দেখছি, আর আপাদমস্তক জ্বলে জ্বলে উঠছে।'

অর্থাৎ 'সেই থেকে' তিনিও গিলে খাচ্ছেন, একজনকে নয় দু'জনকেই।

বললাম—'অন্যদিকে তাকিয়ে থাকুন। ঠাণ্ডা বোধ করবেন।'

ভদ্রলোক হতাশ ভাবে বলেন—'এঃ আপনি দেখছি কিছুতেই সীরিয়াস হতে পারেন না। কি করবো—এক গাড়ী লোক। নিজের এক্তারে হলে,

ছোঁড়াকে চাব্‌কে লাল্‌ করে দিতাম। আর মেয়েটাকেও চৈতন্য করিয়ে দিতাম—'

মুচকে হেসে বলি—'সে চেষ্টা করতে যাবেন না সার। বড়ো সাংঘাতিক মেয়ে। চাই কি আপনাকেই—

ভদ্রলোক চমকে বলেন—'চেনেন নাকি আপনি? কী সূত্রে?'

'আমার স্ত্রী হন, এই সূত্রে।'

মিনিট খানেক একটা সকরুণ স্তব্ধতা।

তারপর? ধোঁযানো কাঠ হঠাৎ জ্বলে ওঠার ভঙ্গীতে জ্বলে ওঠেন ভদ্রলোক। 'আপনার নিজের স্ত্রী? আশ্চর্য। আমি হলে—এখনো—কশাব এই বাবট্টি বছর বয়সেও—এ অবস্থায় কি করতাম জানেন? পায়ের ট্রি..র খুলে বসিয়ে দিতাম পটাপট। মাথা ঘুরে যেতো বাছাধনের।'

'বলেন কি?'

'নিশ্চয়। বলবো না মানে? স্ত্রীকে জেনানা গাড়ী ছাড়া উঠতে দিই না তাই। আপনারা সব আধুনিক হবার ঝোঁকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বসে আছেন, দুনিয়া কি জায়গা, বোঝেন না তো। জগতের সমস্ত বেটাছেলে কিসের তালে ঘুরছে জানেন?'

অবাক বিস্ময়ে অজ্ঞতা জানাই। 'জানিনা তো।'

জগতের সমগ্র পুরুষ জাতি পয়সা রোজগারের তালে ঘোরে এই রকম একটা ধারণা ছিলো বটে, কিন্তু ওর মুখ চোখের 'জ্বলজ্বলাট' ভাব দেখে অতো তুচ্ছ কথাটা বলতে সাহস হয় না।

ভদ্রলোক বিজ্ঞ হাসি হাসেন—'জানতাম, এই উত্তর পাবো। কিসের তালে জানেন? মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেবার তালে।'

রোমাঞ্চ জাগে। পা থেকে মাথা অবধি জাগে।

'কি? বিশ্বাস করছেন না? করবেন মশাই করবেন। সাহেব মেমদের দেখে বুদ্ধি শুদ্ধি ঘোলা হয়ে রয়েছে এখনো। আর দু'দিন যাক। স্বাধীন দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্মের প্রবর্তন হোক। আমার স্ত্রীকে আমি কোথাও নেমন্তন্নে যেতে দিই না জানেন?'

'জানতাম না অবশ্য। এখন জানছি।'

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে থাকেন ভদ্রলোক—'শুধু তাই। বাড়ীতে

একটি ফেরিওয়ালা ডাকুক দিকি ? সাধ্য নেই। ধোপা গয়লা, স্যাকরা, মুটে, সব ওই গেটের বাইরে। অন্তঃপুরের পবিত্রতা রাখতে জানা চাই, বুঝলেন মশাই।

'বুঝেছি।'

'শুনুন, তাহলে একটা ওল্ড স্টোরি—আমাব তখন বয়েস কম। নতুন বিয়ের পর গিয়েছি দাদাশ্বশুরের বাড়ী। অর্থাৎ শ্বাশুড়ির বাপের বাড়ী। দাদাশ্বশুর জমিদার লোক, সত্তরের কাছাকাছি বয়েস, তবু কী চেহারা! আর সাজের চেক্‌নাইও তেমনি! সর্বদা গলায় ফুলকোচা উড়ুনি, গোঁফে আতর, চুলে কলপ, সিমলে শান্তিপুবের ধুতি পরনে। হেটে যান—বাইশ বছরের আমি লজ্জা পাই। যাই হোক—আদব খেতে গিয়েছি, স্ফূর্তির প্রাণ তখন, সাধ হলো ছিপ ফেলে মাছ ধরি একদিন। দাদাশ্বশুরের নিজের পুকুর, কেউ চোখ রাঙাবার নেই। বাড়ীর সরকারকে বলে ছিপ্ যোগাড হলো, দিদি-শ্বাশুড়ী ঠাট্টা করে বললেন ভবিষ্যতে আমি যেটাকে ছিপে তুলবো সেই আ৷মুণে মাছটার ল্যাজখানা তিনিই সদ্ব্যবহার করবেন। নাতনী ঘোমটার ভেতর থেকে কি যেন বলে উঠলো ফিস্‌ফিস্ করে।

'যাক গেলাম তো। আনাড়ি মাছধরা, সঙ্গে আর একটি আনাড়ি মামাতো শালা, কাজেই সমস্তদিন রোদে পোড়া সার। বিকেলের দিকে দিদিশ্বাশুড়ী ঘাটে এলেন কাপড কাচতে। আমরাও খালিহাতে ছিপ্ঘাড়ে বাড়ী ফিরছি। হঠাৎ পিছনে একটা তর্জন গর্জন! কী ব্যাপার। আর কিছু নয়, দাদাশ্বশুরের চোখে পড়েছে, আমরা ঘাটে থাকাকালীন গিন্নী এসেছেন। আর যায় কোথা! জেরার পর জেরা, এখুনি কি দরকারই পড়েছিলো ? বাড়ীতে একঘড়াও জল ছিলোনা কেন ? ঝিগুলো মরে গেছে কি না' ইত্যাদি। তারপর তর্জন গর্জন। ইচ্ছে করেই যে তিনি বেছে বেছে এই সময়টিতে এসেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত চোখের জলে শাড়ীর আঁচল ভিজোতে ভিজোতে বাড়ী ফিরলেন ভদ্রমহিলা। হাজার হোক তখন ইবংম্যান, বুড়োস্বুড়োদের কৃপা করে চলি, উনি চলে যেতে হেসে কর্তাকে প্রশ্ন করি—আচ্ছা দিদিমার তো শুনেছি উনষাট বছর বয়েস হয়েছে—এখনো ওঁকে সন্দেহ করেন আপনি ? বুড়ো কি বললে জানেন ? বাঁধানো দাঁতে হা হা করে হেসে বললে,—'ওহে ছোকরা শোন—'পুড়বে মেয়ে, উড়বে ছাই,

তবে মেয়ের গুণ গাই'—ওজাত বড় সর্বনেশে জাত! কখনো বিশ্বাস করবে না ওদের। এখন বুঝেছি সেকেলে লোকেরা খাঁটি কথা বলতো বটে! এই তো আমার স্ত্রীর ধরুন না—উনষাট না হোক ছাপান্ন তো হলো—এক ঘণ্টার জন্য স্বস্তিতে আছি? নো নো! বোনের বাড়ী এসেছে দুদিনের জন্যে এসেছি! সনাতন ধর্ম যে এখনো টিকে আছে সে শুধু এই আমাদের মতন দু'একটা দুঁদে লোকের জন্যে। বুঝলেন মশাই?'

নিজের বুকের ওপর রীতিমত জোর একটা থাবড়া মেরে আত্মপ্রসাদ আর বিজয়গর্ব মিশ্রিত একটা অলৌকিক হাসি হাসতে থাকেন ভদ্রলোক।

আমাকে দস্তুরমতো ঘায়েল করে ফেলেছেন—বোধকরি এই গর্ব।

যথাসম্ভব পরাজিতের ভঙ্গিতে বলি—'সেই সনাতন ধর্ম আবার ফিরে আসবে, এ বিশ্বাস আছে আপনার?'

'আলবৎ! আসতে বাধ্য। এই আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি—আবার মেয়েরা ঘোমটা টেনে রান্না ঘরে ঢুকবে। বাসে ট্রামে, ইষ্টিমারে, অফিসে, ইস্কুল কলেজ, কোথাও মেয়ে মানুষের ছায়াটি দেখতে পাবেন না। আমাদের বনেদি দেশে ঠুনকো ম্লেচ্ছাচার ক'দিন চলে মশাই?'

সভয়ে প্রশ্ন করি—'কবে নাগাদ সেটা হবে বলতে পারেন?'

'ক'দিন? জোর পঞ্চাশ ষাট বছর। আপনাদের আধুনিকদের বুড়ো হতে দি. একবার তা নাহলে ওই সব বদলোকে—' আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক খুব সম্ভব এ জন্মের মতো নিশ্চিন্ত। কিন্তু সারাজগতে কোথাও মহিলা জাতির ছায়ামাত্র দেখা না গেলে এঁদের কি হবে? কাদের সামলাবেন?

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে বোধ হয় দম নেবার প্রয়োজন হয় ভদ্রলোকের।

পানের ডিবের চাইতে সামান্য ছোট সাইজের আর একটা ডিবে বার করে একমুঠো নস্যি নাকে গুঁজে, ভদ্রলোক আত্মস্থ হয়ে বলেন—'আপনি দেখেননি, আমি দেখছি তো। রাস্কেল ছোকরা সেই ইস্তক ঠায় একভাবে বসে আপনার স্ত্রীর দিকে প্যাট্ প্যাট্ করে তাকাচ্ছে! কথা কইছি বটে আপনার সঙ্গে, চোখ আমার কোনোদিকে যায়নি—'

॥ চিঠিখানি

খানিকক্ষণ আগে চিঠিখানা দিয়ে গেছে পিয়ন, আরও অন্য সব চিঠির সঙ্গে, অন্য সব চিঠির মত। যেন কিছুই না, যেন একেবারে সাধারণ।

তা' পিয়নটা কি আর স্বপ্নেও জেনে গেছে ওই শাদাশিধে খামটায় ভরে তিলকের জন্যে বহন করে দিয়ে গেলো সে কোন অমরার বাণী।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঠিক ওই পিয়ন আসার সময়টা তিলক কোথাও বেরিয়ে যায় নি। তিলক বাড়ী না থাকলে নিশ্চয় চিঠিখানা অন্য সব চিঠির সঙ্গে গিয়ে পড়তো। তিলকের পিঠো অবতার বোন বুবুর হাতে। আর বুবু বাড়ীময় রাষ্ট্র করে বেড়াতো তিলকের নামে একখানা খামের চিঠি এসেছে।

খামের ওপরকার ঠিকানাটা যে হাতে লেখা নয় টাইপ করা, এটা নিয়েও হয়তো রহস্যের সৌরভ আবিষ্কার করে বসতো বুবু। কে না জানে, হাতের লেখা গোপন করবার ইচ্ছে হলেই লোকে— .টা!

যাক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, চিঠিটা একেবারে টাটকা তাজা তিলকের হাতে এসে পড়েছে।

হাতে নিয়ে তিলকের বুক বেপে উঠেছিল, খ া ছিঁড়তে হাত কেঁপেছিল। একখানা পুরনো ব্লেড নিয়ে আস্তে আস্তে খামের একটা কিনারা কেটে খুলেছিল পাছে ভিতরের চিঠি ছিঁড়ে যায়।

তারপর থেকে চিঠিটা বোধ হয় বার কুড়ি পড়া হয়ে গেছে। খামে পুরে বালিশের তলায় রাখা হয়ে গেছল, আবার টেনে বার করে চোখের সামনে মেলে ধরল তিলক।

যেন প্রত্যেকটি অক্ষরকে একেবারে প্রাণের মধ্যে ভরে নিতে চায়।

কয়েকটি চির পরিচিত অক্ষর দিয়ে গড়া কয়েকটি শব্দ মাত্র, কিন্তু কী অপূর্ব অর্থ ই না বহন করে এনেছে সেই শব্দ ক'টা তিলকের কাছে!

ওই শব্দ ক'টির মাঝে স্পন্দিত হয়ে আছে পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত কাব্য। সমস্ত সুষমা।

ওই শব্দ ক'টি যেন তিলককে বলছে, সূর্য্যে রং আছে, পৃথিবীতে হাওয়া আছে। জীবনের মানে আছে।

মা এসে বেজার মুখে বললেন, 'কি আজ আর খাওযা দাওয়া হবে না কি? ঘর থেকে যে বেরোচ্ছিসই না!'

তিলক তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বালিশেব তলায গুঁজে ফেলল।

কেন ফেলল তা' জানে না। ওতো জানে মাব এত বেশী কৌতূহল নেই যে ছেলে একখানা কাগজ হাতে করে নাড়ছে বলে উঁকি দিতে আসবেন।

তিনি তিলকের সাবধানতা তাকিযেও দেখলেন না। তেমনি বেজার মুখে বললেন, 'শুনতে পেলি?'

অন্যদিন হলে হয় তো মার কথার সঙ্গে সঙ্গে তিলকও ডবল বেজার হযে বলে উঠতো, 'আমার জন্যে কারো হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবার দরকার নেই। ঢাকা দিযে ফেলে রেখে দাও গে, যখন হোক খাবো।'

কিন্তু আজ আব সে মেজাজ নেই তিলকের। আজ তিলক হাওয়ায় ভাসছে। 'বিরক্তি' বলে যে বাংলা ভাযায় একটা কথা আছে। সে কথাই ভুলে গেছে তিলক।

তাই পুলক গোপন কবা মুখে বলে ওঠে, 'যাচ্ছি যাচ্ছি। বল কি কি রেঁধেছ আজ।'

মা কিন্তু এই উৎসাহের মান্য রাখলেন না। আগের থেকেও নীরস স্বরে বললেন, 'কত যে হাতী ঘোড়া মজুত রয়েছে রাঁধবার জন্যে, তাই ঘটা করে বলব।'

'ওরে ব্যস, হাতী ঘোড়া!'

বেখাপ্পা খানিকটা হেসে নেয় তিলক। কি করবে, রাগতে যে সে আজ পারবেই না।

মা তথাপি বিরস মুখেই চলে গেলেন। ওই বিরস-নীরস ছাড়া—আর যেন কোন ভাব নেই মার। যেন পৃথিবীতে যে হাসি আছে, কথা আছে, আড্ডা আছে, এ কথাটা আমলে আনতেই আর রাজী নয় তিনি।

মার এই ভাবটাই তিলককে যেন বেঁধে মারে। কিন্তু আজ আর তা' হল

না তিলকের। আজ বরং ভাবল—একা একা সংসারের যাবতীয় খাটুনি খেটে খেটে মা বড বেশী ক্লান্ত হয়ে গেছেন! এইবার তিলক মার জন্যে একখানি হাত এনে দিতে পারবে। যত শীঘ্র পারে তা' করবে।

গুনগুন করে একটা গানের লাইন ভাঁজতে ভাঁজতে খেতে গেল তিলক।

দেখল বুবু তার ভাত আগলে বসে আছে, আর মা দালানে পা ছড়িয়ে বসে হাই তুলছেন। নিজের জন্যে লজ্জা হ'ল তিলকের, সত্যি বড্ড দেরী করে ফেলেছে সে।

কিন্তু অন্যদিন এ দৃশ্য দেখলে রাগ হতো তিলকের। মনে হত বাড়ী সুদ্ধ সব শিশু নাকি। ন'টা না বাজতেই ঘুম পায়? আজ রাগ হ'ল না।

আজ তিলককে পৃথিবী অনেক দিয়েছে, তাই সে অনেক উদার হতে পারছে।

কিন্তু বুবুর মনে তো আর নতুন কোন হাওয়া বইছে না, তাই সে পুরানো পদ্ধতিতেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কি দাদা, এতক্ষণে খাবার সময় হ'ল? হচ্ছিল কি এতক্ষণ?'

কী যে হচ্ছিল, এই সুযোগে বলে নিতে পারতো তিলক। বলতে পারতো ওর সেই অমরার বাণী বহন করে আনা চিঠিখানার কথা, বলতে তো হবেই সবাইকে। কিন্তু এমন, চট করে বলে ফেলতে ইচ্ছে হ'ল না। পরিবেশটা একটু মনোরম হোক। তা'র বদলে বলে উঠল, 'নাঃ রাক্ষুসীটা খালি চেঁচাতে ওস্তাদ! এবার একটা বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া দরকার।'

সত্যি এই মুহূর্তে তিলক তার ছোট বোনটার বিয়ের প্রয়োজনীয়তাটা যেন সঠিক অনুধাবন করছে। চেষ্টা করবে! এবার ছোট বোনটার বিয়ের চেষ্টা করবে তিলক।

'বাবা কোথায় রে?'

বলল তিলক।

'বাবা!' বুবু আর একবার ঝঙ্কার দিল, 'বাবা আবার কোথায়! বিছানায়! এক ঘণ্টা আগে খেয়ে নিয়ে চলে গেছেন। তোমার মতন তো নয়!'

'আমার জন্যে তোদের আর এত ভুগতে হবে না।'

বলল তিলক। একটু নরম হাসি হেসে. হয় তো সে হাসিতে একটু রহস্যও মেশানো ছিল।

বুবু অবশ্য নরম এবং রহস্য কোনদিক দিয়েই গেল না, অবজ্ঞা ভরে বলল, 'কেন, বৌ আসছে বুঝি? সে এসে তোমার ভার নেবে?'

বোনের এই মুখরতায় কি প্রখরতায় বিরক্ত হ'ল না তিলক, শুধু এবার খোলা গলায় হেসে উঠল। আব শুনে বাড়ীর আর তিনজন সদস্য চমকে উঠল। তিলকের খোলা গলার হাসি।

এ যেন ভুলেই গেছে বাড়ীর লোক।

সর্বদাই তো মনের আগুনে তুঁষ হচ্ছেন ছেলে।

'মা হাই তোলা ভুলে, চোখ বগড়ে এদিকে সরে এলেন, বুবু সন্দেহ সঙ্কুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল, 'হঠাৎ দাদার এত স্ফূর্তি কেন। নেশা-টেশা করে নি তো!'

আর ঘরের মধ্যে থেকে তিলকের বাবা বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন একটা ছুতো করে। বললেন, 'ঘরে জলের গেলাসে কি যেন পড়েছে, একটু জল দেতো বুবু!'

ছেলের সঙ্গে কথা বললেন না, সবাসরি তাকালেনও না তার দিকে, শুধু বাঁকা কটাক্ষে দেখলেন, কিসের এত হাসি। তিলকের মুখে হাসি এনে দিতে পারে এমন কি ঘটল। আর এতো শুধু হাসি নয়, এ যেন ভিতরের পুলকেব প্রকাশ্য উল্লাস!

কিন্তু মন্তব্য কিছু করলেন না, জল খেয়ে চটি জুতোর শব্দ তুলে ঘবেব দিকে যেতে উদ্যত হলেন।

ঠিক সেই সময়, হ্যাঁ ঠিক সেই সময় আসন ছেড়ে উঠে পড়ল তিলক।

না, এতক্ষণ খাওয়া সুরু করে নি সে। বুবুর সঙ্গে বাক্য বিন্যাস চালাচ্ছিল।

কিন্তু বাবা গিয়ে শুয়ে পড়লে, গিয়ে বলা দুরূহ হবে। বাবার সঙ্গে কথা কওয়াই তো দুরূহ হয়ে উঠেছে ইদানীং। রাশ ভারী মানুষ। ডেকে কথা সহজে কন না। তাছাড়া ক্রমশঃই তো ছেলের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন।

আর তিলকও তেমনি অভিমানী।

'বাবা' বলে ডেকে শেষ কবে কথা কয়েছে তিলক, মনে করতে পারল না। কিন্তু আজ তো বলতেই হবে। আজ তো ডাকতেই হবে। ডেকে

উঠল 'বাবা!'

গলা একটু কেঁপে গেল হয়তো বা।

তা' যাক।

তবু বাবার খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেল তিলক।

নীচু হয়ে বাবাকে একটু প্রণামের মত করল, তারপর শান্ত পরিষ্কার গলায় বলল, 'আসানসোলের যে কাজটার জন্যে ইণ্টারভ্যু দিয়ে এলাম সেদিন, তারা এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাঠিয়েছে, পরশু থেকে জয়েন করতে হবে।'

॥ ব্যর্থ নমস্কারে

আবার।

আবার সেই একই কাণ্ড।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যায় সুলতার, শ্বশুরের কীর্ত্তি দেখে। পরশু অত কাণ্ডর পর আবার যে তিনি আজ সেই একই কাজ করবেন, এ কথা সুলতার ধারণার অতীত ছিল।

ছিঃ ছিঃ। মানুষ যদি নিজে এইভাবে নিজের মান মর্যাদা খোয়ায়, কে তাঁকে সম্মান দিয়ে চলতে পারে?

স্বামীর কাছে এসে যখন তখন সেই কথাই বলে সুলতা, 'আর কেউ পারে তো পারুক, আমি আর পারব না তা' বলে দিচ্ছি।'

নির্মল কথাগুলো শুনেছে কি শোনেনি বোঝা যায় না, তা'র মুখে শুধু এই উদ্বেগের ছবিই ফুটে ওঠে, সুলতার মাজা ঘসা কণ্ঠস্বরটি নীচে বৈঠকখানা ঘরে বাবার কান পর্যন্ত পৌচচ্ছে না তো।

হতে পারেন তিনি অবুঝ, তবু বুড়ো হয়েছেন তো। এই কটু ভাষায় লবণাক্ত কথাগুলি যদি কানে যায়, কত না জানি মর্মাহত হবেন তিনি।

অথচ সুলতা এখন যে টেম্পারে রয়েছে, বাবার মর্মাহত হবার আশঙ্কার কথা ওকে বলতে যাওয়া মানেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া। বুঝিয়ে বলবার অবস্থা এখন নয়।

কিন্তু কখনই বা সে অবস্থা আসে?

একবার ভাবল নির্মল, 'অবুঝ' কি শুধু বয়েস হলেই হয় লোকে?

কতদিন কত সুন্দর শান্ত সময়, হয়তো সিনেমা দেখে ফিরছে দু'জনে, হয়তো বা বাবা বাড়ী নেই, তার ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে গেছেন। এমন সময় নরম করে কথাটা তুলেছে নির্মল, বলেছে, 'বুড়ো হলে অমন এটা সেটা

আজে বাজে জিনিষ খাবার ইচ্ছে হয়, তা' ছাড়া চিরটা জীবন পাড়াগাঁয়ে কাটিয়ে এসেছেন—'

কথা শেষ করতে হয়নি, ক্ষেপে উঠেছে সুলতা। ফেটে পড়েছে অনুযোগে আর অভিযোগে। সে অভিযোগের ভাব অনেকটা এই—কেন, শ্বশুরকে কি সে প্রাণ ভরে খেতে দেয় না? যত্নের ত্রুটি করে কিছু? চিরকাল পাড়াগাঁযে কাটিয়েছেন বলে, মমতা করে করুণা করে বহুবিধ সৌখিন আর শহুরে রান্না-বান্না করে করে খাওয়াতে চেষ্টা করে না তাঁকে? বয়েস হয়েছে শ্বশুরের বলে অবস্থার অতিরিক্ত যত্ন করতে যায়নি? নিজের বাচ্চা ছেলেদের নিযমিত একটু ফল মিষ্টি ছানা দিয়ে উঠতে পারে না, তবু—শ্বশুরকে দেয়নি সে সব? কিন্তু ব্রজনাথ তার মর্ম বুঝেছেন? মর্যাদা রেখেছেন সে যত্নের? ভাল ভাল জিনিষ সরিয়ে রেখে নিজে বাজার থেকে সস্তা দরে পাকা ফুটি, পচাটে বেল, দাগী কলা কিনে এনে গাঁউ গাঁউ করে খেতে সুরু করেছেন। আবার আদর করে তার থেকে নাতিদের ভাগ দেওযার সখ। চাকরটা সুদ্ধ দেখে হাসে। মাথা কাটা যায়।

এদিকে শুনতে পাওযা যায় আমাশার ধাত, অথচ খাওযার পদ্ধতিটি কি চমৎকার! রাতে সুলতা হালকা ফুড্ দেবে বলে, টু রেঁধে, সুজির রুটি করে সামনে ধরে দিযেছে, উনি ব্যঙ্গ হাসি হেসে সে খাবার ঠেলে রেখে ঠাকুরের কাছে ভাত আর চচ্চড়ি চেয়ে খেযেছেন। তাও সেই ঠাকুর চাকরের মোটা চালের ভাত। সুলতারা তো রাতে ভাত খায় না। ষাটের ওপর বয়েস হলো, এখনো রাত্তিরে এক থালা ভাত খাওয়া চাই। অতটা পাওয়াই যে সহ্য করেন কি করে সুলতা তো ভেবেই পায় না। সুলতাদের তো সকালে চায়ের সঙ্গে দু'খানা বিস্কিট খেযেই বেলা বারোটা অবধি গলা পর্যন্ত বুজে থাকে, আর উনি—যাক, ওসব কথা বলতে চায় না সুলতা, বলতে চায় সুধু শ্বশুরের গ্রাম্য বেয়াড়াপনার কথা। কালিয়া ফেলে চচ্চড়ি খাওয়া দেখে সেই ব্যবস্থা করল সুলতা, চাকরকে দিয়ে বাজার থেকে শাক পাতা ডাঁটা মোচা থোড ইত্যাদি আনিয়ে আনিয়ে লঙ্কা বাটা সরষে বাটা দিয়ে পাড়াগেঁয়ে ধরনে, রাঁধিয়ে ওঁর মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতেও হবে না। নিজে একবার করে বাজারে যাওয়া চাই-ই চাই। দশ রকম রাঁধা হয়েছে, তার ওপর কোথায় ওলের শাক, কোথায় কচুর ডাঁটা, কোথায় ছাঁচি কুমড়ো,

কোথায় পাকা চালতা এনে হাজির করবেন। আর অমায়িক ভাবে চোখ টেনে টেনে বলবেন, 'সুবিধে হয় তো এগুলো একটু রাঁধবার ব্যবস্থা করে দিও তো বৌমা! জিনিষগুলো আমি একটু ভালবাসি।'

কী রকম রাগ হয় তখন মানুষের!

তবু মনের রাগ মনে চেপে. বেলা দু'টো পর্যন্ত সেই সব জিনিষ রাঁধিয়ে শ্বশুরকে খেতে দিয়েছে, কিন্তু মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে? রোজ ভাল লাগে এই রকম আদিখ্যেতা? এই রকম ইল্লুতে লোভ? বামুন ঠাকুরটাও তো কম গজ্ গজ্ করে না।

পরশু তাই বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল সুলতার। তবু নিজের কথা বলেনি, ওই বামুন ঠাকুরের কথাই বলেছিল।

বলেছিল, 'আপনি কেবল অসময়ে এমনি করে রাজ্যের ছাই জঞ্জাল এনে জড় করবেন বাবা, লোকজনকে তো আর আমি টেঁকাতে পারছি না।'

ব্যস! শ্বশুরের একেবারে মানের কানা খসে গেল। সেই এক রাশ কুচো চিংড়ি আর পচা মৌরলা একেবারে টান মেরে উঠোনে ফেলে দিলেন। বললেন 'কি জানি বৌমা, মুখের রুচি মতন দু' চার পয়সার জিনিষ এনে খাই, ভাবি তোমাদের এই নবাবীর সংসারে ওতে আর কতটুকু তেল মশলা খরচ হবে! সেটা যে এত বড একটা অপরাধ তা ভেবে দেখিনি।'

এর পরেও মেজাজ ঠিক রাখতে পারে কোনও মেয়ে?

অথচ ওই শ্বশুর নাকি চিরদিন শিক্ষকতা করে এসেছেন। স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন। হোক গাঁয়ের স্কুল, তবু হেড মাষ্টার বলে কথা! তা হতভাগা ইস্কুলের আবার কী এক নতুন নিয়ম হ'ল যে গ্রাজুয়েট না হলে হেড মাষ্টার হবে না, ষাট বছরের বেশী বয়েস হলে কাজ ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। দিল ছাড়িয়ে ব্রজনাথকে।

ইস্কুলের তো ভারী উন্নতি হ'ল নতুন নিয়মে, সুলতারই জীবন সংশয়! তবু তখন সুলতা হাস্যমুখেই এ দায় মাথায় তুলে নিয়েছিল। বরং ভেবেছিল —আহা, মানুষটা বরাবরই গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত, বাড়ীর লোকের সেবা যত্নের আস্বাদ কখনো পাননি, সুলতা ওঁর শেষ জীবনটায় শান্তি এবং স্বস্তি দেবে।

শাশুড়ীকে সুলতা চোখে দেখেনি। বহুকাল আগেই তিনি সংসারের মায়া কাটিয়ে সরে পড়েছেন! ব্রজনাথের জীবন কেটে গেছে এক জ্ঞাতির বাড়ীতে

খরচা দিয়ে খেয়ে।

নির্মল কলকাতায় মামার বাড়ী থেকে মানুষ হয়েছে। লেখাপড়া সাঙ্গ করে কলকাতাতেই চাকরী নিয়েছে। এবং কলকাতার মেয়েই বিয়ে করেছে। কাজেই বাপের সঙ্গে সম্পর্ক তার ছুটি-ছাটায় মাত্র। বাপ বুড়ো হয়ে পর্যন্ত মনের মধ্যে একটা অকর্তব্যের গ্লানি অনুভব করছিল সে, পরম স্বস্তি পেল, যখন বাবা দাসত্বের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়ে তার কাছে এসে পড়লেন।

আরো স্বস্তি পেয়েছিল, যখন দেখল সুলতা সেই আসাটাকে ভাল মনে নিচ্ছে। কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল! এখন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত যেন একটা দারুণ যন্ত্রণা।

আর বেচারা নির্মল যেন সর্বদা চোর। বাবার সঙ্গে যদি দু'টো কথা কইতে বসে, বাবা কেবল আক্ষেপ জানাবেন, আর দেশে চলে যাবেন বলে হুমকি দেবেন।

বৌয়ের কাছাকাছি বসলেই, ঘুরে ফিরে সেই বাবার অবুঝপনার কথাই এসে পড়বে।

অথচ সেই 'কথা'টা কি তুচ্ছ হাস্যকর!

ব্রজনাথ বাজার যেতে ভালবাসেন, হাতে করে কিছু কিনতে-কাটতে ভালবাসেন, ভালবাসেন সস্তার জিনিষ খেতে! এই কথা, এই কারণ।

এদিকে সুলতা চায় সভ্য ভদ্র আধুনিক মেয়েরা যেভাবে সম্মানীয় গুরুজনকে যত্ন সমাদর করে, সেই ভাবে শ্বশুরকে যত্ন করতে।

একান্ত বাসনা তাঁর বিছানাটি ফর্সা রাখবে, ঘরটি পরিপাটী করে সাজিয়ে রাখবে, হাসি গল্পে আব্দারে তাঁর কন্যার অভাব দূর করে দেবে। সেই সঙ্গে দূর করবে নিজেদের এতদিনকার অপরাধ-বোধের গ্লানি।

হিসেব-মত একে খুব একটা অন্যায় চাওয়া বলে না। অন্ততঃ নির্মল তা বলতে পারে না। স্ত্রৈণ পুরুষ হিসেবে নয়, নিরপেক্ষ সুবিচারক মানুষ হিসেবেই পারে না।

কিন্তু ব্রজনাথের চাওয়ার সঙ্গে সুলতার এই চাওয়ার ঘোর বিরোধ।

ব্রজনাথ চান তাঁর চিরদিনের অভ্যস্ত চালচলনে থাকতে। যেখানের দৃষ্টিভঙ্গী এখানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রজনাথ সপ্তাহে সপ্তাহে ময়লা জামা চাদর ধোপা বাড়ী দেওয়াকে বাড়াবাড়ি বাবুয়ানা বলেন, বিছানাটা রোজ একবার

করে ঝাড়াকে ফ্যাসান বলেন, ঘরে ফুলদানীতে একটু ফুল সাজালে কি একটু ধূপ জ্বালালে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেন, 'ওসব আমার অভ্যাস নেই বৌমা, তুমি নিয়ে যাও।'

নির্মল ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবে, এইটুকু কি বাবা অভ্যাস করে নিতে পারতেন না। দারিদ্র্যের অভ্যাস নয়, ভোগের অভ্যাস। এটুকু দিতে কষ্ট কি? কিন্তু মুখ ফুটে বাবাকে কিছু বলতে সঙ্কোচ হয়।

বাবা কি ভাববেন।

বাবা হয়তো মনে করবেন ছেলে তার বৌয়ের হয়ে ওকালতি করতে এসেছে।

যাক, তবু এগুলো নিয়ে প্রকাশ্যে বিরোধ কিছু হচ্ছিল না। সুলতা মাত্র আড়ালে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, এবং ক্রমশঃ 'কলিতে কারো ভাল করতে নেই' বলে শ্বশুরের ভালো করা থেকে বিরত হয়েছে।

কিন্তু গোল বাধল ওই বাজার করায়।

কী তুচ্ছ, কী হাস্যকর এই ঘাতপ্রতিঘাতের কারণটা।

প্রতিদিন এই হয়—যেই নির্মল অফিস বেরিয়ে গেল অমনি ব্রজনাথ ফতুয়ার ওপর বে সেই খাটো খাটো আর ময়লা পাঞ্জাবটা গায়ে চড়িয়ে ছাতাটি মাথায় দিয়ে চললেন টুকটুকিয়ে বাজারের দিকে।

দেখলেই বিষ লাগে সুলতার।

রান্না-বান্না সব শেষ হয়ে গেছে, আর একটু পরেই স্নানাহার করে নিলে বেলা বারোটার মধ্যে সকলেরই পূর্ণ বিশ্রাম লাভ ঘটে। সে বিশ্রাম শ্বশুরের তো বটেই, বৌমার ও বামুন চাকরেরও। বাড়ী শান্ত হতে পায় কিছুক্ষণের জন্যে। আবার তো তিনটে বাজলেই ছেলেরা স্কুল থেকে এসে হাজির হবে, হৈ চৈ বেঁধে যাবে।

তাছাড়া সময়ে খেলে দুপুরে একটু ফল মিষ্টি শরবৎ খাবার অবকাশও তো মেলে। সেভাবে শরীরের যত্ন করলে ওই হাড়সার দেহে একটু মাংস লাগে।

আর তা'তে লোকেও বলে, 'হ্যাঁ সুলতার হাতের গুণ আছে।'

তা' হবে না।

এসবের কিছু হবে না।

বেলা দুপুরে বাজার থেকে ফিরবেন ব্রজনাথ এবং সেগুলির সুব্যবস্থা করে,

খেতে দুপুরটা বিকেলে পৌছবে। আর অতখানি বেলায় লঙ্কা-সরষে-তেল-ঝালের রান্না ব্যঞ্জন খেয়ে রাত পর্য্যন্ত 'বাপ-রে মা-রে' করবেন।

অথচ যুক্তি কি?

না, 'চিরকাল পরের দাসত্বের দায়ে সাত সকালে ভাত খেয়ে ছুটতে হয়েছে, তাড়া হুড়ো আর ভাল লাগে না বৌমা!'

বেলায় খেয়ে শরীর নষ্ট করা ছাড়া ছুটির জীবনের আর কোন উপভোগ্য সদ্ব্যবহার এঁদের মাথায় আসে না।

কিন্তু সুলতাকে তো সংসার চালিয়ে নিতে হবে।

খুব কি একটা অন্যায় বলেছিল সুলতা, যদি বলে থাকে, বামুন, চাকর টিকিয়ে রাখা শক্ত হচ্ছে।

হচ্ছেই তো।

তাদের বুঝিয়ে-বাঝিয়ে, লুকিয়ে বখশিস দিয়ে, চলছে যা হোক করে।

কিন্তু কথাটি শুনেই ব্রজনাথ একেবারে এমন অভিমানে ভেঙে পড়লেন যে মনে হতে পারে, খুবই একটা অবমাননা-করা কথা সুলতা বলেছে তার পূজনীয় গুরুজনকে।

মাছগুলো উঠোনে ফেলে দেওয়ামাত্র কাকেদের মহোৎসব লেগে গেল; বিশ্রী একটা কা' কা' শব্দে যেন পাড়া তোলপাড় হয়ে উঠল।

আর তোলপাড় করে উঠল সুলতার মন। সহ্যের বাঁধ ভাঙল। সে বলে উঠল; 'এটা না করে আপনি আমার গালে একটা চড় মারতে পারতেন বাবা! সেটা বরং আর একটু সভ্য হতো।'

ব্রজনাথ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আমাকে সভ্যতা শেখাতে এলে বৌমা?'

'আপনাকে আমি কিছু শেখাতে যাই, এমন আমার—কী ধৃষ্টতা বাবা! তবে শোভন-অশোভনতা বজায় রাখবার দায় একা শুধু ছোটদেরই নয়, এটুকু মনে রাখতে চেষ্টা করবেন।'

'তাই চেষ্টা করবো বৌমা!'

বলে সারাদিন গুম্ হয়ে পড়ে থাকলেন ব্রজনাথ। এবং ছেলে ফিরতেই গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমাকে এবার ছুটি দাও বাবা, গাঁইয়া ভূত গাঁয়েই ফিরে যাই।'

প্রমাদ গণল নির্মল।

বুঝল বাড়ীতে আজ বেশ একখানি পালা হয়ে গেছে নিশ্চয়।

বেচারা পুরুষের পক্ষে এ রকম ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা নির্বাচন করাব মত দুরূহ কাজ আর কি আছে? একদিকে গুরুজনের সম্মান রক্ষা, আবাব অপর দিকে একান্ত প্রিয়া—জায়ার অভিমান রক্ষা।

কাকে কি বলবে?

দু'জনেরই নিজের দিকে যুক্তি প্রবল।

তবু!

হাতে পায়ে ধরার সেকেলে কৃত্রিম পদ্ধতিটা ছেড়ে কেবলমাত্র কথাব কৌশলে স্ত্রীকে আর বাপকে নিবৃত্ত করেছিল সেদিন নির্মল।

এমন কি মনে হযেছিল পবস্পব পবস্পবকে বুঝতেই চেষ্টা করছে বুঝি বা; নির্মলের বোঝা নয়।

এই পরশুর কথা সেটা।

কালকের দিনটা একটু নিরুপদ্রব কেটেছিল।

কিন্তু আজই সে সব অনুতাপ খতম ব্রজনাথেব!

আজ আবার নির্মল বাড়ী থেকে বার হতেই ছাতাটি নিযে হঁকহাঁকযে বেরিয়ে গিয়ে, নিযে এলেন এই—চার রকম চুনো মাছ, তিন বকম শাক, পাঁচ রকম তরকারি।

তাই কি বেশী?

দু' পয়সা, চার পয়সা কবে।

যা দেখলে চাকর বামুনের পর্যন্ত হাসি পায।

আপাদমস্তক জ্বলে-যাওয়া রাগ কষ্টে সংবরণ করে সুলতা সেই জিনিসগুলো তুলে নিয়ে গেল, এবং অতখানি বেলায় সবগুলি রাঁধাল।

মায় হিঞ্চে শাক, গিমে শাক, সুষণি শাক।

তার পর সব কিছু আলাদা একটি থালায ধবে দিল ব্রজনাথেব পাতেব সামনে! যাবতীয় যা।

ব্রজনাথ একবার ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, 'এটা কি হল বৌমা?'

সুলতা শান্ত নরম গলায় উত্তর দিল, 'আর তো কিছু নয বাবা। এখানে আপনার খাওয়া দাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধে হচ্ছে। দেখতেই তো পাচ্ছি

সামনে। তাই ভাবলাম সব রকমই থাক পাতের কাছে, যেটা মুখরোচক হয়—খাবেন প্রাণ ভ'রে।'

সঙ্গে সঙ্গে বাড়াভাতের থালাটা ঠেলে ফেলে দিয়ে ব্রজনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'প্রাণভরে ভালমন্দ খেতে আমি এখানে আসি নি বৌমা। তা নেহাৎ নাকি ভগবান চিরকালের দাসত্ব থেকে একটু ছুটি করিয়ে দিয়েছিলেন, তাই একবার নির্মলকে একটু দেখতে পারো বলে—' গলাটা ধরে গেল ব্রজনাথের। একটু থেমে বললেন, 'গরীবের ছেলে, চিরটা কাল গরিবীয়ানাতেই জীবন গেছে। বুড়ো বয়সে আর বিলাসিতার অভ্যাস করবার বাসনা ছিল না মা! মনও তা চায় না, জিভও তা চায় না, তাই যাক সে কথা। নির্মল এসে পড়লে আমি আবার আটকে পড়বো, তার কথা এড়াতে পারব না। আমি এই তিনটের ট্রেনেই—'

বাকীটা শেষ না করেই ধীরে ধীরে সরে গেলেন ব্রজনাথ।

ঘরে গিয়ে চৌকার তলা থেকে টেনে বার করলেন, নিজের সেই পুরনো টিনের স্যুটকেসটা যেটা হাতে করে এই কিছুদিন আগে হাস্যোজ্জ্বল মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ছেলের বাড়ীর দালানে।

প্রসন্ন স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এসে গেলাম তোমাদের কাছে। এইবার এই বুড়ো ছেলেটার ভারও ঘাড়ে চাপল তোমাদের। বুঝলে নির্মল, চলেই এলাম। স্কুলে যখন প্রস্তাব করল, যদি নীচু ক্লাসে বাংলা পড়াতে চাই তো, থাকতে পারি আমি। মনে বড় বিক্কার এল। চলেই এলাম। ওই ইস্কুলে আমার নাতির বয়সী একটা ছেলে হেডমাষ্টারী করবে আর আমি—'

নির্মল তাড়াতাড়ি বাবাকে প্রণাম করে দরাজ আনন্দে ল গলায় বলে উঠেছিল, 'পাগল হয়েছেন, তাই থাকে মানুষ? বেশ করেছেন চলে এসেছেন। আমিও বাঁচলাম। এবার আপনার এই স্কুলে ছাত্রের তিনটির ভার নিন।'

ছেলেদের ঠেলে এগিয়ে দিয়েছিল নির্মল, চোখের ইসারায় প্রণাম করবার আদেশ দিয়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সুলতাও প্রণাম করে এক গাল হেসে বলেছিল, 'দেখবেন বাবা, ক্রমশঃ টের পাবেন এ তিনটি কী নিধি। এতকাল যত ছাত্র চরিয়েছেন, তাদের ওপরে যাবে।'

ব্রজনাথ সেই প্রথম দিনটার কথা ভেবে গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর আস্তে আস্তে নিজের স্বল্পসংখ্যক জামা কাপড় ক'খানি গুছিয়ে নিলেন সেই রং-চটা সুটকেসটায়।

আর যখন সেটা চেপে বন্ধ করলেন, চোখ দিযে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারলেন না। কাব্যবোধহীন ব্রজনাথের হঠাৎ মনে হল, এই বাক্সটার ডালাটা চেপে বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন বন্ধ হয়ে গেল তাঁর বাকী জীবনের সমস্ত আশার আর ভরসার খোলা জানালাগুলি।

এযাবৎ বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত খেটেছেন, আর—ভেবেছেন, 'আমার আবার ভাবনা! খাটতে পারছি খাটছি। যেই পারবো না, চলে যাবো নির্মলের কাছে।'

সেই ভাবনার জানলাটি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

একটি গ্রাম্য স্কুলের হেড্ মাষ্টার! সেই গ্রামটির বাইরের পৃথিবীকে কখনো দেখেন নি। তাই সেই গ্রামেই ফিরে যাওযার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারলেন না ব্রজনাথ। ট্রেনে উঠে পড়লেন বর্ধমান জেলায় একটি গ্রামের উদ্দেশে থার্ড ক্লাশের একখানি টিকিট কেটে।

বারে বারেই চোখের কোণ ভিজে উঠছে, জোর করে সে চোখকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন বাইরের প্রকৃতির দিকে। বারে বারেই ভাবছেন, দেশ থেকে চাটিবাটি তুলে চলে যাওযাটা কী ভুলই হযেছিল, আবার কোন মুখে সেখানে গিয়ে—

হ্যাঁ—বারে বারেই তাই মনে হচ্ছে।

শুধু একবারও মনে আসছে না, ভুল হয়তো আরও কোথাও ঘটেছে। হয়তো সেই ভুলটুকু সংশোধন করে নিতে পারলে, জীবনের কারবারে সহসা এমন দেউলে হয়ে বসতে হত না তাঁকে।

আর সুলতা?

সেও সেই অভুক্ত অস্পর্শিত অন্নব্যঞ্জন সাজানো থালাটার দিকে তাকিয়ে কাঠের মত বসে থাকতে থাকতে সহসা চাপা কান্না রোধ করতে বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে।

মমতাহীন হৃদয় তার নয়।

সমস্ত ঘটনাগুলোকে মন্ত্রবলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হলে হয়তো সে তা'

করতে চাইত। নির্মল ফিরে এলে কোন মুখ নিযে সে দাঁড়াবে তার সামনে. তা' ভেবে আকুল হচ্ছিল, আকুল হচ্ছিল নির্মলের মর্মাহত মুখচ্ছবি কল্পনা করে। তবু একেবারে অন্তরের অন্তরালে নিজেকে দোষী বলে ভাবতে কিছুতেই পারছিল না।

ভাবতে পারছিল না সম্পূর্ণ আস্ত একটা মানুষকে যদি গ্রহণ করবার সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করতেই হয় তো, শুধু গ্রহণই নয়, তাকে বহনও করতে হবে, এ বোধটা রাখতে হয়। বহন করতে হবে তার রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, বদভ্যাস সব কিছু সমেত।

যাকে গ্রহণ করব, তাকে ভেঙে চুরে নিজের ছাঁচে গড়ে নিযে তবে গ্রহণ করব, এ কল্পনা যেমন অবাস্তব তেমনি অসার্থক।

নির্মল এসে একটিও মন্তব্য করল না। করল না এতটুকু তর্কাতর্কি। কারণ স্নুলতাকে সে বোঝে, ব্রজনাথকেও সে বোঝে। শুধু এইটুকু বোঝে না যে ওরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারল না কেন? কেন এমন করে ব্যর্থ হ'ল? অথচ দু'জনের মধ্যেই আগ্রহ ছিল, প্রীতি ছিল। সব বৃথা হয়ে গেল।

কারণটা ভাবতে গেলে কী তুচ্ছ, কী হাস্যকর!

অথচ এমনই হয়।

এমনি তুচ্ছ একটু ইচ্ছা অনিচ্ছা, তুচ্ছ একটু পছন্দ অপছন্দ, হাস্যকর একটু অভ্যাসের দাসত্বের বিনিময়ে জীবনটা বিকিয়ে দেয় মানুষ, বিলিযে দেয় জীবনের সব শোভা, সব রং সব গান। আর রিক্ত মূর্তি নিযে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর হাটে।

॥ তপঃসিদ্ধা

স্তবস্তোত্রের পালা শেষ করে সবে জপের মালাটি ধরেছেন নিরুপমা, হঠাৎ মনের সঙ্গে সঙ্গে হাতটা কেঁপে উঠল। নীচের তলা থেকে একটা হাউমাউ কান্নার শব্দ তিনতলায় পূজোর ঘরের বন্ধ দরজা ভেদ করে যেন নিরুপমার কানের উপর আছড়ে এসে পড়ল!

চমকে ওঠাটা আটকান যায় না। ঘরের দরজা বন্ধ করা যত সহজ, ইন্দ্রিয়ের দরজা বন্ধ করা তত সহজ নয়। জপের মালা হাতে আটকান থাকলেও, মনটা ছেড়ে গেল।

কী হল? হঠাৎ কেউ পড়ে গেল কি? না আগুনে পুড়েই গেল? নিরুপমা কি উঠে পড়বেন?

কিন্তু ঠিক পড়ে যাওয়া কি? তা মনে হচ্ছে না ত। এ অন্য ব্যাপার। ক্রমশ.বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হঠাৎ ধরা-পড়ে-যাওয়া কোন অপরাধীর উপর শাসনকার্য চলছে। কারণ একটা অসহায় আর্ত কান্নার উপর একাধিক কণ্ঠের তর্জন-গর্জন যেন ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাড়ির চাকরটার গলার শব্দ আছে, আছে বাড়ির কর্তা সুরেশ্বরের, আর সে দুটো শব্দই ছাপিয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে বাড়ির গিন্নী কাবেরীর।

কর্তা, গিন্নী। নিরুপমার পুত্র আর পুত্রবধূ।

না, নিরুপমা আর এ-সংসারের গৃহিণী পদটা আগলে নেই। ছেড়ে দিয়েছেন, অনেক দিন। ওদের সংসার ওরাই করুক। ওদের সংসার করার পদ্ধতি আলাদা, নিরুপমার পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না। দুটো পদ্ধতিকে খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে একটা বেখাপ্পা অবস্থার সৃষ্টি করে লাভ কী? তার চেয়ে অনেক শান্তি সংসার থেকে অনেকটা উঁচুতে উঠে এসে সত্যবস্তুর আরাধনা করা!

সংসারে বাস করেও নিরুপমা আধাসন্ন্যাসিনী! ঈশ্বর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার বাসনা ছাড়া আর কোন বাসনা তাঁর নেই।

চঞ্চল-হয়ে-ওঠা মনটাকে ফের জপের মালার গ্রন্থিতে বন্ধ করে পূজোর আসনে অবিচল হয়ে বসে থাকলেন নিরুপমা। যা হচ্ছে হ'ক, যে যা করছে করুক। জগতের সমস্ত 'অন্যায়' কি বন্ধ করতে পারবেন নিরুপমা? এই সংসারটাকেও জগতের একাংশ মনে করলেই মিটে যায় সব যন্ত্রণা। "আমার বাড়ি", "আমার ছেলে" এই চিন্তাটাই ত দুঃখের সৃষ্টিকারক। নিরুপমা নির্লিপ্তির সাধনা করবেন।

নীচের তলায় তখন সংসারের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী বিপুলবিক্রমে অপরাধীর শাসনকার্য চলছিল। অপরাধী নয়, অপরাধিণী, এবং অপরাধ অস্বীকার করবার উপায়ও তার নেই কারণ অপরাধটা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে লেপটে বসে আছে। আর কিছু নয়, একখানি ফিকে হলুদ রঙের শৌখিন মিহি রেশমী শাড়ি! হয়ত শিফন, হয়ত নাইলন, অথবা অমনি আর কিছু। যদিও শাড়িখানা জীর্ণ দশাগ্রস্ত, তবু বাসন-মাজা ঝিয়ের পক্ষে বেশী বৈকী। ওর চার মাসের মাইনে না জমালে এ-শাড়ি কেনা সম্ভব হত না। অতএব হয় ভিক্ষা লব্ধ. নয়—চোরাই মাল।

কিন্তু ভিক্ষা কে দেবে। কাবেরী! ভুতে পায়নি ত তাঁকে।

আর কাবেরী ছাড়া অন্য কার অধিকার আছে দেবার? শাড়িটা যে কাবেরীর মেয়ে ছন্দার। কাবেরী দেয়নি. কাজেই "চোরাইমাল" ধরা পড়ার শাস্তিই চলছিল।

চাকর জয়রামের উৎসাহটাই বেশী। কারণ আজ কর নাটকের প্রধান নায়ক সে নিজে। বামাল ধরেছে জয়রামই। সে সেই কথাই এই নিয়েনকই বারের পর আর একবার সংযোজনা করে, "ইলেকটিক্, সারানোর দোকানে খবরটা নিয়ে সবে রাস্তায় পা দিয়েছি, আর দেখি না ইনি পান গালে দিয়ে আহ্লাদে ডগমগ করতে করতে এই কাপড় পরে সিনেমার হল থেকে বেরোচ্ছেন! ধাঁ করে চিনে ফেললাম, দিদিমণির সেই কাপড়খানা, যা নিয়ে সেদিন গরুখোঁজা হল!"

ছন্দা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "যার জন্যে আমিই—শুধু শুধু ক- বকুনি খেলাম। মা ত স্রেফ্ বলে দিলেন, আমি নাকি রাস্তার ধারের বারান্দায় ঝুলিয়ে রেখে-

ছিলাম, হাওয়ায় উড়ে গেছে।"

"পুলিশে দেওয়া হবে তোমাকে, বুঝলে? চল তুমি থানায় --" আর এক-বার ধমক দেন সুরেশ্বর, "চুরি করে পার পেয়ে যাবে তা ভেবো না।"

কাবেরীর গলাটা আর একটু চড়ে, "তুই ওর ঘাড় ধরে ওর বাসায় নিয়ে গিয়ে সার্চ করগে যা জয়রাম, দেখগে যা, আরও কী কী চুরি করেছে ও। সব কিছুর কি হিসেব থাকে? ছন্দাতে আমাতে ব্লাউজ-ই ত পরি দু'শ বাইশটা, কোন ফাঁকে দু একটা সরিয়ে ফেললে কি খেয়াল হবে আমার? আস্পদ্দাকে বলিহারী যাই, এই পাড়ার বুকের ওপর ওই চোরাইমালের বাহার দিয়ে নেমন্তন্নে যাওয়া হয়েছে। কী বলব, খুন করলে ফাঁসি যেতে হয়, তাই, নইলে ওকে কেটে দু টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।"

কাটলেও কাটতে পারতেন কাবেরী কারণ অপরাধিনীর পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার উপায় ছিল না। একটা হাত তার কড়া করে ধরে রেখেছিল, জয়রাম।

আর সে-বেচারা হাত-ছাড়িয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে থেকে থেকে ডুকরে উঠছিল, "মোরে ছাড়ি দাও মা, মোরে ছাড়ি দাও।"

"ছাড়ি দিবে বৈ কি"—জয়রাম প্রবল উৎসাহে বলে ওঠে। "আবার চালাকি কত! বাসার লোককে বলেছে 'কাপড় মনিব-বাড়ি থেকে দিয়েছে'। সঙ্গের মেয়েছেলেগুলো আমার ওপর কী চোখ গরম করছিল, 'তুই কে রে ছোঁড়া, মেয়েছেলের হাত ধরে টেনে নে যেতে চাস? কাপড় ওকে ওর মনিব-গিন্নী দিয়েছে'—আমিও বললাম, 'যে দিয়েছে—তার কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি। শুধু কাপড় দিয়েছিল, এবার জুতো দেবে'।"

"শুধু চুরি নয়, আবার মিথ্যে কথা?" কাবেরী তীব্র চিৎকার করে ওঠেন "আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তোকে সিল্কের শাড়ি দিতে গেছি।"

"ঠাকুমা দিয়েছে গো মা।" সুখমণি আবার ডুকরে ওঠে "মোরে ছাড়ি দাও।"

"দেখছ মা, দেখছ কী সাহস।" ছন্দা ঝেঁকে ওঠে "আবার বলে কি না 'ঠাকুমা দিয়েছে'!"

"গোড়া থেকে ত সেই কথাই বলছে"—জয়রাম বলে, "আবার লোকের কাছে মুখ থাকা চাই ত।"

"মা গঙ্গারে সাক্ষী রেখে বলছি মা, ঠাকুমা দিয়েছে"—

"বটে, চল ত দেখি ঠাকুমার কাছে"—ছন্দা তেড়ে উঠেই থেমে যায়। পিছনে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে নিরুপমা। চোখে সোনার চশমা, পরনে দুধ-গরদ থান, হাতে হরিনামের মালা। চিরপরিচিত মূর্তি।

জয়রাম সুখমণির হাত ছেড়ে দিযে সরে দাঁড়ায়। কাবেরী গুম্ হয়ে যান। সুরেশ্বর অস্বস্তি অনুভব করেন।

"কী নিয়ে এত গোলমাল হচ্ছে বৌমা?"

কাবেরী কথার উত্তর দেন না, দেন সুরেশ্বর, "তুমি আবার পূজোর ঘর থেকে নেমে এলে? এই দেখ না ব্যাপার, ঝিটা ছন্দার শাড়িখানা চুরি করেছে আবার বলছে কি না 'ঠাকুমা দিয়েছে'। জেলে দেওয়া উচিত ওকে।"

"আবার বাহার দিযে সিনেমায যাওয়া হয়েছিল! সাজ দেখ না"—ছন্দা হেসে ওঠে হি-হি করে।

নিরুপমা সমস্ত দৃশ্যটার উপর একবার চোখ ফেলেন, চোখ ফেলেন সুখ-মণির উপর। হ্যা সাজটা দেখবার মত। সেই ফিকে হলুদ শাড়িখানার সঙ্গে একটা কড়ালাল রঙের শাটিনের ব্লাউজ, পায় একজোড়া ফিতেবাঁধা সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। অশ্রুজল আর ঘর্মজলের সংমিশ্রণে নিকষকৃষ্ণ মুখচন্দ্র একটা বীভৎস মূর্তি ধারণ করেছে।

না, ছন্দার মত তবু হাসি এল না নিরুপমার, শুধু সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল একটা উপচে-ওঠা রক্তোচ্ছ্বাসে। অবশ্য কথা বললেন স্বভাবসিদ্ধ ধীর-ভাবেই "এত বকাবকির আগে আমায একবার জিজ্ঞেস করলেও পারতে সুরেশ।"

"তোমায়? তোমায কী জিজ্ঞেস করব?"

সুরেশ্বর হতবুদ্ধি।

"জিজ্ঞেস করে দেখতে পারতে, ওর কথাটা সত্যি কি না।"

এবার কথা কন কাবেরী। বলে ওঠেন, "আপনি হঠাৎ ঝিকে ছন্দার শাড়িখানা দিয়ে দিতে যাবেন, এমন অসম্ভব কথা জিজ্ঞেস করতেই বা যাব কেন মা?"

নিরুপমা হাসলেন, "অসম্ভব কথাও অনেক সময় সম্ভব হয় বৈ কি বৌমা। আর আমার নাতনির একখানা পুরনো শাড়ি আমি যদি হাত তুলে কাউকে

দিয়েই থাকি, সেটা কি খুব অসম্ভব ?”

ছন্দা বলে ওঠে, “বাঃ তুমি কিছুই কর না, কিছুই দেখ না, মাঝখান থেকে সুখমণিকে আমার শাড়ি দেবে—”

“দিয়েছি তোর ওপর রাগ করে”—হাতের মালাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন নিরুপমা, “দু'শ খানা শাড়ি পরিস, যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস, ভাবলাম এবার চাট্টি বিলিয়েই দেব। দেখ দিকি ও ছুঁড়ির কী খোয়ার।”

‘ও-ছুঁড়ি’ হাঁ হয়ে তাকিয়েছিল এতক্ষণ, এবার আর একবার একরাশ কথা বলে হাউমাউ করে ওঠে এবং সেই বাক্যমালার নির্গলিতার্থ বোধ করি এই,—‘দেখুক, দেখুক এবার সবাই, সুখমণির কথা সত্যি কি না।’

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলেন, “বাড়ির জিনিস একটা কেন, এক শ খানাও তুমি বিলিয়ে দিতে পার মা, সে-অধিকার তোমার অবশ্যই আছে। কিন্তু একটু যদি জানিয়ে রাখতে, তা হলে এমন ব্যাপারটা ঘটত না।”

“তুচ্ছ ব্যাপারটা যে এমন ‘ব্যাপার’ হয়ে উঠবে, সেটা আগে বুঝতে পারিনি বাবা। সুখী, তুই বাড়ি যা।”

হঠাৎ সুখমণি সেই অশ্রু এবং ঘর্মকলঙ্কিত মুখে ফিক্‌ করে একটু হেসে জয়রামের দিকে সগর্ব-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ফিতে-বাঁধা জুতোপরা পা দুখানা টানতে টানতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

হাসিটুকু কাবেরীর চোখ এড়ায়নি।

আর সমস্ত শরীরে আগুন ধরিয়ে দেবার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। সংসার-নির্লিপ্তা আধা-সন্ন্যাসিনী শাশুড়ির সম্মান রেখে চলা আর সম্ভব হয় না তাঁর, একেবারে ফেটে পড়েন “শাড়ি আপনি ওকে কক্ষনো দেননি, ওকে বাঁচাবার জন্যে মিছিমিছি এখন—”

এক মুহূর্ত কেঁপে উঠলেন নিরুপমা, একমুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল দুই চোখের তারা। মনে হল ফেটে পড়বেন তিনিও। তবুও জপের থলির মধ্যে হাতটা চেপে ধরে রেখে স্বভাবসিদ্ধ স্থির স্বরেই বললেন, “কথা বলবার সময় একটু ভেবে-চিন্তে বলতে হয় বৌমা। গুরু লঘু জ্ঞান রাখতে হয়। দেখেছ আমার হাতে জপের মালা! শাড়ি আমি সুখীকে দিয়েছি।”

নাট্য-মঞ্চ শূন্য হয়ে গেল।

আবার নিজের আশ্রয়ে ফিরে এলেন নিরুপমা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে

ফের বসলেন পুজোর আসনে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। অদ্ভুত অন্যমনস্কের মত। দেখে মনে হয়, নিরুপমা বুঝি ভুলে গিয়েছেন কী করছিলেন সন্ধ্যে থেকে। কী করবেন এবার।

অনেকক্ষণ পরে গলায় ঝোলানো জপের থলি থেকে মালাটা আস্তে আস্তে বার করে একবার সিংহাসনে বসান গুরুদেবের ছবির পায়ে ছুঁইয়ে নিজে আবার জপতে শুরু করলেন।

॥ এত কম

আশেপাশে বাহাত্তরখানা বই ছড়িয়ে, আর বুকে পিঠে থোলো থোলো এলোচুলের রাশ ছড়িয়ে হতাশ মুখে চৌকিতে বসে আছেন ইরা বৌদি

পাচ্ছেন না, প্রার্থিত বস্তু পাচ্ছেন না।

অথচ এ যাবৎকাল ধারণা ছিল ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। যত ইচ্ছে পাওয়া যায়। অগাধ আছে, অঢেল আছে, শুধু হাত বাড়িয়ে মনের মতনটি তুলে নিতে যা দেরী। কিন্তু নিতে এসে দেখা যাচ্ছে কিচ্ছু নেই।

যা ছিল সবই, ইতিপূর্বে, আর সবাই নিয়ে নিয়েছে।

হতাশায় আর দুশ্চিন্তায় ইরা বৌদির মুখে ঘাম, ঠোঁটে দাঁত, গালে আঙুল। হয়তো ছবি সম্পূর্ণ করতে, থাকতো কপালে দু'একটি রেখা, যদি না ইরা বৌদির মুখটা ডাঁসা পেয়ারার মত অমন টান টান মাজা মাজা হ'ত। কিন্তু ইরা বৌদির মুখ ডাঁসা পেয়ারার মত, ইরা বৌদির কপাল চকচকে আর্শির মত। সেই আর্শীতে চোখ ফেলে সামনে বেঞ্চ চেয়ার টুল ট্রাঙ্ক নানাখানায় বসে আছে গৌতম, অনিরুদ্ধ, পার্থ, সুকান্ত, টিপু, নীতু এবং আরও অনেকে।

সকলের মুখেই ইরা বৌদির মুখের হতাশার ছায়া।

অনেকক্ষণ চুপচাপের পর পার্থ বলে ওঠে, "তাহলে উপায় ?"

"উপায় নিরুপায়।" ইরা বৌদি হাত উল্টে নিরুপায়ের চরমভঙ্গী প্রকাশ করেন।

"কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে।" বললো টুল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কিছু তো করতেই হবে!" বললো চেয়ার আর বেঞ্চ।

"তা'হলে প্রবন্ধ সাহিত্য দেখা হোক ?" বললেন ইরা বৌদি গাল থেকে আঙুল নামিয়ে।

"প্রবন্ধ সাহিত্য!"

এত কম

সমবেত কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ ধ্বনি উঠল।

"কি আর করা! কিছুতেই পুরনো কিছু করাব না আমি!"

ইরা বৌদির কণ্ঠ অনমনীয়।

"তা'হলে কী হবে?"

আকুল প্রশ্ন এসে আছড়ে পড়ে টুল থেকে, ট্রাঙ্ক থেকে। সবদিক থেকে।

"পত্রসাহিত্য থেকে দেখব?" বললেন ইরা বৌদি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। আর পরক্ষণেই বেঞ্চ চেয়ার টুল ট্রাঙ্ক একযোগে সবাই মুখর হয়ে উঠল, "ইরা বৌদি, আপনি ঠাট্টা করছেন!"

ঠাট্টাই বটে! ইরা বৌদি মুখের ঘাম মুছলেন আঁচলের কোণ তুলে, "মরছি জীবন মরণ সমস্যায়, বলে কিনা ঠাট্টা করছি! বেশ তো, তোরাই বল কি করবো?"

হ্যাঁ, এই তরুণগোষ্ঠিকে 'তুই' সম্বোধনই করে থাকেন ইরা বৌদি। যার গোঁফ গজায়নি তাকেও, যার গোঁফ গজিয়ে কামিয়ে খর খরে হয়ে গেছে তাকেও। 'তুই' না বললে এতগুলো তরুণকে বশে রাখবেন কি করে, বাগ মানাবেন কি করে? তাছাড়া বয়সের হিসেবে তো এদের দলে ইরা বৌদির উপস্থিতি নিতান্তই 'শিও ভাঙা'র পদ্ধতিতে, সেটা ওঁকে দেখে ধরা পড়ে না এই যা। তা'-দেখে ধরা পড়ে না বলেই তো! দেখে বয়েস ধরা পড়লে, কে চায় সেই রহস্যহীনাকে?

বয়েস যাই হোক, ইরা বৌদির চেহারায় এখনো তাজা ফলের লাবণ্য; ভুরুতে এখনো কিশোরীর চাপল্য! ছোট খাট আঁটসাঁট গোরাট গঠনভঙ্গীর মধ্যে যেমন আস্থার আশ্রয়, তেমনি সখ্যতার প্রশ্রয়!

সাদা শাড়ি ইরা বৌদি দৈবাৎ পরেন, ব্লাউসটা সচরাচর লাল, লালচে, লালাভ। কপালে মস্ত একটি সিঁদুরের টিপ যেটা ঘামে ঘামে ঝাপসা, সিঁথির সিঁদুরটি ডগডগে লাল। নিটোল হাতে একগাছি করে মোটা সোনার বালা। গলায়—

কিন্তু দূর ছাই ইরা বৌদির বর্ণনায় এত কথা বলার দরকারই বা কি? ইরা বৌদিকে কে না দেখেছেন? এই "ফ্যাশান অধ্যুষিত" দেশে ইরা বৌদিকে না দেখে চলছেই বা কার?

ইরা বৌদি, মীরা বৌদি, বেলা বৌদি, রেখা বৌদি, বাবলিদি, বাচ্চুদি, ছোড়দি, রাঙাদি, নানাবিধ নামে বিরাজ করছেন তো ইরা বৌদি এক একটি ফাংশান কেন্দ্রের মধ্যমণি হয়ে!

বিরাজ না করলে কে ম্যানেজ করতো এত বড কর্মযজ্ঞ?

শুধু তাজা তরুণদের পক্ষে দক্ষযজ্ঞ ঘটানো ছাড়া আর কি ক্ষমতা আছে? ওদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন শুধু ইরা বৌদিরাই। ইরা বৌদিরাই বল বুদ্ধি ভরসা। ইরা বৌদিরাই শক্তির উৎস, কর্মের প্রেরণা, ফাংশানের আনন্দ। ইরা বৌদিরা না থাকলে কে উৎসাহী হত ঘোড়ার ডিমের এত ঝামেলায়!

ঝামেলা তো সোজা নয়!

যেমন একা নদী বিশক্রোশ, তেমনি একা ফাংশান একশো কন্যাদায়! ভুক্ত-ভোগীমাত্রেই জানে একথা। আর এই শতবার্ষিকীর বচ্ছরে ভুক্তভোগী নয় কে? কে আজও আছে অভুক্ত? বোধ কবি কেউই নেই, শুধু ছিল এই "তারুণ্যের জয়গান সঙ্ঘ"। চুপ করে বসেছিল এতদিন ভিড মেটাবার আশায়। পঁচিশে বোশেখে, পঁচিশে বৈশাখ পালন তো অসম্ভব; তাছাড়া ওটা ক্রমশ সেকেলেও হযে যাচ্ছে! জন্মদিনেই জন্মদিন করা তো একটা গতানুগতিক সেকেলে জিনিস! তাছাডা উপায? সবই যে যাচ্ছে হাত ফস্কে!

পঁচিশে বৈশাখ, বা তার কাছেপিঠের তারিখে জয়ন্তী করতে গেলে সভাপতি পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে প্রধান অতিথি আর উদ্বোধক? সব তো এনগেজড্! আর্টিস্টরা? ডুমুরের ফুল!

কী অহঙ্কার ডেকরেটারদের, কী অহঙ্কার মাইক ভাডাওলাদের! আব দামই বা কী! মুহুর্মুহু শাঁখ বাজানো মাইক, তারই ভাডা কি না—"দুব দূর" ইরা বৌদি বলেছেন তখন, "এখন আবার মানুষে কিছু করে? চেপে বসে থাক এখন। বর্ষা পড়ুক, পৃথিবী ঠাণ্ডা হোক, তখন হবে জয়ন্তী! বর্ষার কবির জয়ন্তী তো বর্ষাকালেই হওয়া উচিত।"

ইরা বৌদির এই কাব্যিক রুচি আরও মুগ্ধ করেছিল "তারুণ্যের জয়গান সঙ্ঘকে"।

এখন এসেছে বর্ষা!

'আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে।'

আয়োজনও হচ্ছে মহোৎসাহে। মানে আর কি, হচ্ছিল কাল পর্যন্ত! মঞ্চ মাইক, রূপসজ্জা আলোকসজ্জা, সভাপতি প্রধান অতিথি, সব কিছুর বায়না দেওয়া হয়ে গেছে।

হয়েছে একেবারে আটঘাট বেঁধে। তারা আর নতুন কোনও বায়না করবে এমন ফাঁক নেই!

কিন্তু এখন? এখন যে সারা জগৎটাই বেবাক ফাঁক!

রবীন্দ্রনাথ যে দেশকে এত বড় ফাঁকি দিয়ে গেছেন একথা কে জানতো! আবিষ্কার করেছেন ইরা বৌদি—অভিনয় করতে একটাও নাটক নেই!

"ইরা বৌদি!" কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছে ওরা। হাত পা ছেড়ে যাচ্ছে শুনে অবধি। "ইরা বৌদি!"

"কি বল?"

"বলছি নতুন নাটক তো হচ্ছে না, পুরনো থেকেই না হয়–

"পুরনো মানে? বল ঘসা পুরনো—" ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন ইরা বৌদি, "এই যে বইগুলো নিয়ে বসেছি, এর কোন্‌খানা অন্তত দুশোবার না দেখেছিস তোরা, বল তো? আর এই গত ক'মাসে তো এদেশের যে যেখানে ছিল এগুলোর হাড়মাস সব খেয়ে চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়েছে! আর এখনো করতে ইচ্ছে হচ্ছে তোদের—গোড়ায় গলদ, শেষরক্ষা, চিরকুমার সভা, শোধবোধ—"

"না না, ও সব বড্ড পুরনো, বড্ড পুরনো।"

ঐক্যতান রবে বাধা ওঠে।

"কোনটা তা নয় বল?" ইরা বৌদি চাঁপার কলির মত আঙুল কটি উল্টে সেই তাঁর বিশেষ ভঙ্গীটি করেন, "বিসর্জন, রাজা ও রানী, গোরা, নৌকাডুবি, চোখের বালি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়, কালের যাত্রা, দুই বোন—

শুনে যা একধার থেকে! বল কোনটা লোকে একটু নতুন রেখেছে?"

বলতে পারে না কেউ। তবু ভেবে চিন্তে বলে একজন, "তাহলে নয় ওই ধোঁয়া ধোঁয়া ঝাপসা ঝাপসা নাটকই একটা—"

আগে ধোঁয়া আর ঝাপসায় আপত্তি ছিল এর।

"ধোঁয়া!" ইরা বৌদি মনঃক্ষোভ ভুলে হেসে উঠেন, "তুই কোন যুগে রয়েছিস পার্থ? ধোঁযাগুলো কি এখনো ধোঁয়া আছে? দিনের আলোব মতন পরিষ্কার করে ছাড়েনি লোক? মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের ঘর, মালিনী, অচলাযতন, এই সবেব কথা বলছিস তো? কোনটা নতুন?"

"ও তো হাজারবার হচ্ছে।" বলল সুকান্ত।

"অতএব অভিনয় হবে না!" বললেন ইরা বৌদি। বললেন নয, যেন ঘরের মধ্যে বাজ ফেললেন! "অভিনয বাদ যাক!"

ফাংশান থেকে অভিনয বাদ! মানে ধড থেকে মুণ্ডুটা বাদ! আবার সমস্বর আর্তনাদ—"ইরা বৌদি! তার চেয়ে বলুন না কেন সব ফেলে রেখে আমরা রেল লাইনে গলা পেতে পড়ে থাকিগে?"

"নাঃ এতো ভাবী মুস্কিল! তোবাই বল তবে, বল কোনটায হাত দেব?"

"কি আর কব।"—বললো বেঞ্চ চেযার টুল ট্রাঙ্ক।

"ভেবেছিলাম সবাই মিলে—যাক না হয সবাইকে—নেওয়া যাবে না, শুধু বাছাই ক'জনকে নিয়ে গীতি নাট্য টাট্য—"

"সেখানেই বা কি একেবারে নতুনেব পশরা সাজানো রয়েছে?" ঝিকিয়ে উঠেন ইরা বৌদি, "দেখিসনি বুঝি কখনো, বাল্মীকি প্রতিভা, মাযার খেলা, মালঞ্চ, কালমৃগয়া—"

"থাক্ থাক্ আর বলে কি হবে, ও সবই সকলেব মুখস্থ।"

"তবে? বলছি কি আর সাধে?" ইরা বৌদি বলেন, "সব ভেবেছি, এমন কি তোদের একেবারে নির্মূলে বাদ দিযে শুধু মেয়ে কটাকে নিযে নৃত্য-নাট্যের কথাও ভাবছি। কিন্তু সেও তো সেই ঘুরে ফিরে নটির পূজা, চণ্ডালিকা, অভিসার, শ্যামা—"

"ইউরেকা!" চেঁচিযে ওঠে ট্রাঙ্ক, "একটা দিকে তো আমাদের তাকানোই হয়নি ইরা বৌদি! গল্পগুচ্ছ থেকে—"

খিল খিল খিল, ঝলকে ঝলকে হেসে ওঠেন ইরা বৌদি, হাসির ধমকে ভেঙে ভেঙে পড়েন! "ওরে শোন শোন তোরা, টিপু আমাদের নতুন আলো দেখাচ্ছে! গল্পগুচ্ছ নিয়ে গুচ্ছের কথা যেদিন হযে গেছে, টিপু বুঝি ছিল না সেদিন? ওরে টিপু বল কোন নতুনটা নেব? নষ্টনীড়? দৃষ্টিদান? দালিয়া?

মুক্তির উপায়? সম্পত্তি সমর্পণ? দেনা পাওনা?" ঝেঁকে ঝেঁকে ওঠেন ইরা বৌদি, "ছুটি? পোষ্টমাষ্টার? ক্ষুধিত পাষাণ? কাবুলিওলা? কঙ্কাল? মণিহারা? সমাপ্তি? ওরে বল না রে বাপু—"

"আঃ ইরা বৌদি এ আলোচনা তো সেদিন হয়ে গেছে, আপনার তো কোনটাই—মানে কোনটাই তো আপনি তেমন পছন্দ করতে পারলেন না!"

"কি করে পারবো?" ইরা বৌদি ম্লানস্বরে বলেন, "তোরা তো আমায় দোষ দিচ্ছিস, কিন্তু বল, এ সবের মধ্যে আমি আর মৌলিকত্ব কি দেখাব? আর তাই যদি দেখাতে না পারলাম তো মিথ্যে খেটে লাভ? একশোবার দেখা অভিনয় তুলনামূলক সমালোচনা করে খালি ত্রুটিগুলোই দেখে, অভিনয়ের বাহাদুরীর দিকটা দেখে না। সেইজন্যেই তো 'নতুন নতুন' বলে ঝোঁক করছি। আর তোরা আমাকে দোষ দিচ্ছিস!"

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ইরা বৌদির। ছলছলে হয়ে ওঠে চোখ।

আর কে কি বলবে?

কি বলবার আছে?

নির্বাক সে ক্লাব ঘরে, এদের মুখের পরে বৌদির হতাশ আঁখি দুটি নীল বালির সম বহে ছুটি!

তারপর?

তারপর ওঠে ধীরে ধীরে

বক্তমুখ লাজ নম্র শিরে,

এতক্ষণ অন্য মনে যে ছিল জানলার কোণে

সে তাপস এল কাছে সরে।

কহিল সে মৃদু, তবু জোরে।

"তৈরী করুন তৈরী করুন"। তাপস সেন জানলার কাছ থেকে সরে এসে বলে, "মৌলিকত্ব দেখাতে চান তো নাটক গড়ে নিন। হাজার হাজার কবিতা আছে রবীন্দ্রনাথের তা থেকে বাছুন!"

তাপস ওই রকমই। কথা বলে না তো বলে না, লাজুক মুখচোরা। বলে যখন যেন মুরুব্বি।

ইরা বৌদি তাপসকে সমীহ করেন, তবু ভাঙা ভাঙা অভিমান অভিমান গলায় বলেন, "তাই বা কে বাকী রাখছে তাপস? কে কবে ভেবেছিল

"সামান্য ক্ষতি" এমন অসামান্য হয়ে উঠবে? কে ভেবেছিল পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, নকল গড, পরশ পাথর, এসব আবার নৃত্যনাট্য হয়! ভাবিনি, তবু হয়েছে। বাস সব শেষ! সর্বভুক্ নাটকবাজরা যার মধ্যে কোথাও কোনখানে এককুচিও নাট্যরসের 'না' পেয়েছে তা'কে টেনে বার করে কবে পুরনো করে ফেলেছে! আর কোথায কি? বল আর কিসে কি আছে? এই তো ফুরিয়ে গেল সব! কে জানতো রবীন্দ্রনাথ এমন করে ডোবাবেন আমাদের! এতদিন ধরে লিখলেন, অথচ এত কম লিখলেন!"

"তা'হলে?"

"ফাংশান হবে না!"

"ফাংশান হবে না?"

"হবে না!"

"তাহ'লে রেলের লাইন?"

"যাস, তার আগে চা খেয়ে যা!"

"চা! থাক ভাল লাগছে না!"

"পাগল! মবার আগে একবার চা ডালমুট খেয়ে মরবি না?...ঠাকুর, চায়ের জল চড়াও।"

ইরা বৌদির অবদান ক্লাব ঘরে, ইরা বৌদির বামুন ঠাকুর প্রদত্ত চা ডাল-মুট খেতে খেতে ম্লান হতাশ মুখ তরুণের দল হৃদযে হৃদয়ে অনুভব করে, সব শূন্য! ফাংশান গেল, মানে সমস্তই গেল! কিসের উপলক্ষ্যে তবে আর অহরহ এখানে পড়ে থাকা যাবে? কোন সুবাদে খাওয়া যাবে ইরা বৌদিব বামুন ঠাকুরের হাতের চা, আর ইরা বৌদির মুখেব বকুনি?

যাবে না!

কাজেই সব যাবে। জীবনের স্বাদ যাবে, রং যাবে, উৎসাহ যাবে, উল্লাস যাবে। বিষণ্ণ মুখে ডালমুট চিবোতে চিবোতে ওরা সামনের দেয়ালে ঝোলানো রবীন্দ্র প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বলে, "সত্যি বটে, আশীটি বছর ধরে কি তবে তুমি করলে ঠাকুর, যদি এত কম লিখলে!"

॥ ভাল মানুষ

কিছুদিন থেকে দেখছি চেনা পরিচিতরা সবাই আমাকে 'বিশ্বনিন্দুক' বলতে শুরু করেছে। ঈশ্বর জানেন কেন করেছে। নিন্দুক আমি তো মোটেই নই। বিশ্বাস করুন—

'আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শী' নামক যে সম্প্রদায় আমার ধারে কাছে চরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের 'ভাল' বলতে ভারী ভালোবাসি আমি। 'বাঃ বাঃ বেশ খাসা' বলতেই চাই।

কিন্তু কি বলবো, এমনি আমাব কপাল, ওদেব সম্পর্কে 'ছি-ছি' ছাডা কখনো কিছু বলতেই পেলাম না।

বলুন তো কম দুঃখের কথা ?

তবু বারবার চেষ্টা করি, কিন্তু পেরে উঠিনা। হাল ছেড়ে দিয়ে ওই ছি-ছিই করি। দেখতে পাচ্ছি, শুনে আপনারা মিটি মিটি হাসছেন। ভাবছেন, এনার মতো বিশ্বনিন্দুক আর কি বলবে! কিন্তু সবটা যদি শুনতেন।

এই তো সম্প্রতিকার একটা ঘটনাই শুনুন বলছি।

ঘটনাটা হচ্ছে সামনেব বাড়ির ওই ছেলেটা, আর পা শ বাড়ির ওই মেয়েটার। নাঃ নামটাম আমি ফাঁস করবো না, তাতে অনেক ঝক্কি। কে কোথা থেকে ফোঁস করে উঠবে। ও যে বোঝবার সে বুঝে নেবে।

সত্তি বলবো, ওই মেয়েটাকে আর ছেলেটাকে আগে আমি ভালই বলতাম। এমনকি রীতিমত ভালবাসতামও। সেই জাঙিয়া পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বয়েস থেকেই তো দেখছি।

কিন্তু সে ভালবাসা কি ওরা বজায় রাখতে দিল ? দিল না। বলুন তো কি করে আমার ভালবাসা বজায় রাখি, যদি হঠাৎ দেখি দুটো দিব্য লায়েক হয়ে নিজেরাই ভালবাসাবাসি শুরু করেছে!

আপনারা পারেন কিনা জানি না, আমি তো পারলাম না। হাড়ে চটে গেলাম, পাড়ার ওই মেয়ে ছেলে দুটোর ওপর। কাজেই এপাশের ওপাশের আরও সব পড়শীদের ডেকে ডেকে ওদের নামে ছিছিক্কার করে শোনাতে লাগলাম!

সত্যি বলুন, কি বা বয়েস ওদের, এখুনি এত পাকামী কেন! তুই ছেলেটা তো বাপু মাত্তর এই ক'টা বছর ইঞ্জিনীয়ারিং না কি পড়তে ঢুকেছিস, এখনো ছাপ মেরে বেরোসনি, আর তুই মেয়েটা, সবে বি-এ একজামিন দিয়ে এসে বসেছিস, ভগবান জানেন লাড্ডু পাবি না গাড্ডু খাবি। এই পরিস্থিতিতে তোদের প্রেমে পড়বার কি দরকার হ'ল?

লেখাপড়া শেষ কর, আয়-উন্নতি করে সংসার করবার রসদ গুছিয়ে নে, একটু ভার-ভারিক্কী হয়ে ঘরকন্নার সব শেখ, তবে না? তা নয়, আর তর সইল না।

ছি-ছি!

ছি-ছি করি ওদের মা-বাপকেও।

একটু আঁটবাঁধ নেই, একটু শাসন নেই! মা-বাপের সামনে দিয়ে চললো দুজনে একলা সিনেমা দেখতে!

আর তোরা চার-চারটে মা-বাপ আটটা চোখ মেলে ফ্যালফেলিয়ে দেখলি বসে বসে! ধরতে পারলি না? মারতে পারলি না? ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে পারলি না? একেও ছি-ছি বলবো না?

তা শুধু কি আজ?

রোজই যাচ্ছে, আর কোথায় না যাচ্ছে! ওই সিনেমাগুলোর নায়ক-নায়িকার বেড়াতে যাবার মত যত যত জায়গা আবিষ্কার করে এইসব তরুণ-তরুণীদের চোখের সামনে মেলে ধরছে, তার সব জায়গাগুলোতেই যাচ্ছে।

এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসে একটু গম্ভীর হয়ে ভালবাসবে, সে, এযুগের কুষ্ঠিতে নেই। খালি ছুটোছুটি। ছিঃ!

তা আমার ছিঃতে তো ওদের বয়েই গেছে! গ্রাহ্যই করছে না। আবার বাড়ি গিয়েও আড্ডা জমাচ্ছে। বলে নাকি মেয়েটা বাংলায় এম-এ পড়ছে, আর ছেলেটা তাই পড়াচ্ছে। বললেই আমি বিশ্বাস করবো? তুই ছেলেটা নিজে পড়ছিস ইঞ্জিনীয়ারিং, তুই বাংলার কি জানিস?

কেন, ওই বেহায়া মেযেটা আমাদের মত বিজ্ঞ পড়শীদের কাছে আসতে পাবে না বাংলা পড়তে?

তা আসবে কেন?

আসলে তো আব লেখাপড়া নয, প্রেমে পড়া!

যাক গে মরুক গে। ওদেব ব্যাপাবে হ।। ছেড়েই দিয়েছিলাম। যাক উচ্ছন্ন যাক, আমাব কি।

ওমা, হঠাৎ এক নতুন ঢেউযেব ধাক্কা খেলাম। পাশেব বাড়ির ওই মেযেটাকে নাকি 'কনে' দেখতে আসবে, তাই নিযে মাযে-বিয়ে বেদম ঝগড়া উঠেছে। মেযেও দেখা দেবে না, মাও না দেখিযে ছাড়বে না। ভাবী পাত্তর নাকি একজন দেড়হাজাবী কেষ্টবিষ্টু।

বলুন এতেও ওই মা-টাকে বাহবা দেব? ফট্ করে তুই একটা আকাশের চাঁদ পেড়ে আনলিই বা কি করে? তা যাক, হোক না কেন পাত্তব আকাশের চাঁদ। তা বলে তুই এম, এ, পোড়ো মেযেকে জোব করে বিযে দিবি তার এতদিনেব প্রেম থেকে হিঁচড়ে টেনে এনে!

ছি-ছি!

বেশ করছে ওই মেযেটা ঝগড়া করে। মেয়েটাকে বাহবা দিয়েই ফেলেছিলাম প্রায।

কিন্তু হায় আমাব চিবকেলে কপাল। দিতে দিল না।

শুনলাম মেয়েটা না কি ঝগড়ায় হেরে গিযে 'কনে' দেখা দিযেছে, আর 'না না' করে শেষ অবধি বিয়েব মতও দিয়েছে। আর ।' নয়, স্রেফ্ ওই দেড় হাজাব!

ছি ছি! একশো ছি!

আব ওই ছেলেটা! তাকেই বা আমি কী আহা মরি করবো? বলি এতদিন এত কাণ্ডব পব, মেযেটাকে উচু আকাশের চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, দেখবি তাই প্যাটপেটিযে চেয়ে?

ছি ছি!

তবে হ্যাঁ, পাশের বাড়ির ওই মেয়েটাব বাপ মেয়ের বিয়ের ঘটাটা ভালই কবল। তিনদিন ধরে যগ্যি, তাছাড়া পড়শীদের বাড়ি বাড়ি থালা থালা মিষ্টি, তার ওপর আবার 'লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।'

বলবো কি, বাপটাকে একটু সুখ্যাতিই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মেজাজ বিগড়ে গেল দানসামগ্রী আর ফুলশয্যের তত্ত্ব দেখে।

এত বাড়াবাড়ি কেন? বলি এত বাড়াবাড়ি কেন? তোমার না হয় একটা মেয়ে, তুমি না হয় পয়সাওলা, কিন্তু সবাই তো তা নয়? এই যে তুমি মেয়েকে উনিশখানা বেনারসী দিলে, চার-পাঁচ স্যুট গয়না আর তিন সেট্ ফার্নিচার দিলে, তার ওপর রেডিও, মটরগাড়ি, ফ্রিজিডেয়ার কী না দিলে, এটা খুব ভাল করলে?

এতে দৃষ্টান্ত খারাপ হল না?

দেখে দেখে সব মেয়েই ভাবতে শুরু করবে কি না—আমার বাবাও ওই-রকম দেবে, আর সব গিন্নীগুলোই ভাববে কিনা আমার ছেলে ওইরকম পাবে!

তাহলেই বোঝো দেশের কী সর্বনাশটাই না করলে তুমি! ছি ছি!

আবার এই সেদিনে আমার পিছনের বাড়ির মেয়েটার বিয়েতে, তার বাপ! পয়সা নেই বলে মেয়েকে দু'খানা বৈ বেনারসী দিল না! শুধু একসেট্ সোনার গয়না!

তোর পয়সা নেই বলে, মেয়েটার প্রাণে সাধ-আহ্লাদ নেই? তবেই বলুন, মানুষকে 'ভাল' বলতে পাচ্ছি কবে?

আর এই আমার পাশের বাড়ির মেয়েটার কথাই বলি, মা-বাপের পীড়নে বিয়েতে না হয় মতই দিলি, তারপর তো যা হয় কিছু করতে পারতিস? লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ের রেওয়াজ তো খুব হয়েছে আজকাল!

আমি অবিশ্যি ওই মেয়েছেলেগুলোর পালানো-টালানো তেমন সুচক্ষে দেখিনে। শেষ অবধি ওতে হাড়ির হাল হয়। কিন্তু 'প্রেম' বলে কথা! তার মুখটাও তো চাইতে হবে।

কিন্তু তা তোরা চাইলি না!

কি বলবো, ওই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা, দিব্যি জড়ি-জড়োয়ায় গা মুড়ে, তার সেই দেড় হাজারি বরের পিছু পিছু বাপের দেওয়া গাড়িতে গিয়ে উঠল! একবার তাকিয়েও দেখল না সামনের বাড়ির দরজায় কিরকম সর্বহারার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোঁড়াটা! বলি খুব প্রশংসার কাজ হল সেটা!

ছি ছি! ঘোড়ার ডিমের দেড় হাজারটাই বড় হল তোর?

আর ছেলেটা !

তুই কি বলে মা-বাপের মুখের ওপর বললি জীবনে বিয়ে করবো না! মায়ের মনটা বুঝলি না ? ঘোড়ার ডিমের প্রেমটাই বড় হল তোর ?

নাঃ বাপু এতেও যদি 'ছি ছি' না করতে পাই, বনে চলে গেলেই তো হয় আমার !

তাই যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

পাড়া-পড়শীরা তো আর এর থেকে ভাল হবে না ! মাঝ থেকে আমার মতন ভাল মানুষকে বিশ্বনিন্দুক বলে নিন্দে করবে ! ছিঃ।

॥ চাকা

ঘটক সংঘেব স্থায়ী সভাপতি সাধন সামন্তব কথাটা দামী। পাকা কথা। উদাসহাসি হেসে বলেছে সাধন, 'চাকা ঘুবেছে বিশ্বনাথ বাবু, পালা বদলেছে।'

চাকা যে ঘুবেছে, সে কথা বিশ্বনাথ বাবু হাডে হাডেই টেব পেযেছেন ভাইপোর বিয়ে দিতে নেমে। তা' 'নামা'-ই বলতে হবে। গৌববেব উচ্চ মঞ্চ থেকে গৌরবহীন সমতলে নামা।

আজীবনেব সঞ্চিত ধাবণা গোলমাল হয়ে গেছে ভদ্রলোকেব।

চিবদিন জানতেন ছেলেমেযেব বিযেব ব্যাপাবে ষোলো আনা গবজই মেয়ের বাপেব। পাত্তবেব বাডি হাঁটাহাটি কবতে তাব জুতোব সোল্ ক্ষইবে, হাতে পায়ে খডি উঠবে, মুখেব বং কালো আর চুলেব বং শাদা হযে আসবে, তবে মেয়েব বিয়ে দিযে উঠতে পাববে।

কিন্তু ভদ্রলোক বঙ্গমঞ্চে প্রবেশ কবে দেখলেন, কোন ফাঁকে হঠাৎ অভিনেতাদের ভূমিকা বদল হয়ে গেছে। বাজাব পার্ট প্রজায় কবছে, কাজেই প্রজাব পার্ট বাজাব কবা ছাডা গতি নেই।

আশ্চর্য! টাকাব হিসেব বদলে 'ষোলো আনা' শব্দটা দেশ থেকে উঠে গেল বলে কি গরজটাও উঠে যাবে? না ঠিক উঠেও অবশ্য যায়নি, গবজটা বর্তেছে এখন ছেলের পক্ষে!

তাই জুতোর সোল্ না ক্ষয়ান, মনটা খোযাতে হচ্ছে বিশ্বনাথ বাবুকে। তোয়াজ করতে হচ্ছে মেয়ের বাপকে। নইলে কথা কইতে চান না ভদ্রলোকেরা।

যদিও বা কথা বলেন তো একটু উচ্চাঙ্গেব হাসি হেসে বলেন, 'মেয়ে তো মশাই বিয়েই করতে চায় না। বলে নিজেব পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করবো

নয়তো কেউ বা বলেন, 'মেয়ের বিয়ের কথা আমি চিন্তাও করি না মশাই।' কী দরকার আমার চিন্তা করবার? লেখাপড়া শিখিয়েছি, চাকরী-বাকরী করে খাক। ইচ্ছে হয় মনের মতন বর নিজে জুটিয়ে নেবে, দু'টাকা চোদ্দ আনার বিয়ে করে আসবে। আমি কেন ঘরের টাকা ভেঙে—'

হয়তো বা কেউ কেউ ওজস্বিনী-ভাষায় একটি বক্তৃতাও শুনিয়ে দেন। যার মর্মার্থ হচ্ছে—একযোগে যদি সমস্ত মেয়েরা ধর্মঘট করে বলে, 'নেহি মাংতা বিয়ে', দেখবেন পণপ্রথা চোঁ চোঁ দৌড় মারবে।

কথাটা ফেলবার নয়।

অবশ্য স্বেচ্ছায় পুরো একটা রাজার ঐশ্বর্য ছিনিমিনি খেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, এমন মহদাশয় ব্যক্তিও আছেন, কিন্তু তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের মেয়ে বিশ্বনাথের ভাইপোর জন্যে নয়।

বিশ্বনাথের ভাইপোর গুণের মধ্যে সে এম-এ ফেল্ এবং কোন সরকারী দপ্তরের উচ্চ বিভাগীয় করণিক। তবে হ্যাঁ, কানা খোঁড়া হাবা কালা নয়।

কিন্তু এইতেই ভাইপোর মা তাঁর পুত্ররত্নকে একটি শ্রেষ্ঠ পাত্র হিসেবে গণ্য করেন, এবং এ হেন পাত্রের যোগ্য কনে জোগাড় করার অক্ষমতায় হতভাগ্য দেবরকে বাক্যবাণে এফোঁড় ওফোঁড় করে ছাড়েন।

বিয়ের ইচ্ছেয় ছেলে মুখভার করে বেড়াচ্ছে, অথচ মা কাকা দাদা তিন তিনটে গার্জেন দু'দুটো বছরের চেষ্টাতেও সে মুখে হাসি ফোটাতে পারছে না, এর চাইতে লজ্জার কথা কি আছে?

তবু তো চাহিদা কত কমিয়ে ফেলেছেন প্রদোষিণী।

প্রথম যে 'অসামান্যার' আশা নিয়ে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে নেমেছিলেন, অভিজ্ঞতার পাথরে ঘসা খেয়ে খেয়ে সে আশা ভোঁতা হয়ে গেছে তাঁর।

এখন আর 'সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী গৃহকর্ম নিপুণা, সঙ্গীতে পারদর্শিনী' ইত্যাদি আকাশ কুসুমের স্বপ্ন নেই, এখনকার একাগ্রবাসনা শুধু ছেলেকে একটা বৌ দেওয়া।

সেই সামান্য ইচ্ছেটুকুও পূর্ণ হচ্ছে না। একটা বৌ দিয়ে ছেলের বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন করে তুলতে পারছে না প্রদোষিণী।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা ভালমানুষ দেওরটিকে উৎখাত করে আজ তাঁকে ঘটক সংঘের অফিসে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ঘটক সংঘের সভাপতি সাধন সামন্ত

বিশ্বনাথ বাবুকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে বিশ বাঁও জলে ফেলে দিল। বলল 'চাকা ঘুরে গেছে।'

বলল, 'ছেলের যদি বিশেষ কোন কোয়ালিফিকেশন থাকতো, ধরুন এঞ্জিনীয়ার, বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, ডক্টর হওয়া প্রফেসর কি 'এ গ্রেড্ অফিসার' এ সবের একটা হলেও আশা দিতে পারতাম। কিন্তু শুধু চাকরী-বাকরী? আশা দেওয়া শক্ত। 'লভে' পড়ে বিয়ের সব রকমই তরে যায়। এই চিরাচরিত 'বরে-বামুনে বিয়ের ব্যাপারেই—' নাকটা কোঁচকায় সামন্ত, 'ছেলে কি 'করে' এ আর মশাই শুনতে চায় না মেয়েরা, ছেলে 'কী', তাই শুনতে চায়।'

বিশ্বনাথ বলেন, 'তা হলে বলছেন ছেলের বিয়ে হবে না?'

'আহা হবে না কেন!' সাধন আশ্বাস দেয়, 'লেগে পড়ে থাকলে, হয়েই যাবে। আছে, একটি মেয়ে হাতে আছে, দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তবে চাকুরে মেয়ে! আর—'

বিশ্বনাথ বাবু বলেন, 'বাড়িতে শুনে এসেছি চাকুরে মেয়েয় আপত্তি নেই—'

'আহা আপত্তি থাকবে কেন?' সাধন সামন্ত অমায়িক হাস্য করে, 'মধুর আশা থাকলে হুলটা সয়ে যায়। কিন্তু এখানে যে আবার সে গুড়ে বালি। মেয়ের অনেক বায়নাক্কা। তবে আপনি যখন আজ মরীযা পণ করে বেরিয়েছেন, তখন চলুন একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

'মা বাপ আছে?' পথে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন বিশ্বনাথ।

সাধন বলে, 'আছে। তবে মেয়ের অনেক শর্ত আছে কিনা, কথাবার্তা যা-কিছু মেয়ের সঙ্গেই হবে।'

'মেয়ের সঙ্গেই হবে!'

বিশ্বনাথের কণ্ঠস্বর স্খলিত।

সামন্তর অবশ্য কণ্ঠ মজবুৎ। 'হবে না কেন? গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা মাইনের চাকরী করছে—'

'তিনশো সাড়ে তিনশোর চাকরী করছে!'

প্রিয়নাথ আহ্লাদে আটখানা মুখে, মা আর কাকার মুখের দিকে তাকায়।

কিন্তু আহ্লাদের সেই আলো সে মুখে দীর্ঘস্থায়ী আসন পাততে পারে না।

ভাবী কনের 'বায়নাক্কা' শুনে মুখে কালি মেড়ে যায় তার। যতই বিয়ে-পাগলা
হয়ে উঠুক, পুরুষের পৌরুষ বলে একটা কথা আছে!

কিন্তু বিশ্বনাথ আজই একটা এস্‌পার ওস্‌পার করে ফেলতে চান। তাই
গম্ভীর মুখে বলেন, 'তা এমন আর মন্দ কি বলেছে? তোমাদের তো কোন
ক্ষতি হচ্ছে না—'

'লাভও কিছু হচ্ছে না—' প্রিয়নাথ লাল লাল মুখে বলে, 'তা ছাড়া ওরা
শর্ত করবে, আর তাই মেনে নিয়ে—এত অপমান! ছিঃ!'

বিশ্বনাথ উদাস মুখে বলেন, 'কী আর কবা! চাকা ঘুরেছে যে।'

প্রমোদিনী বলেন, 'ওই লিস্টিটা তুমি আর একবার পড়ো দিকি ঠাকুরপো!
দ্বিজু, বড় বৌমা, এসো না ইদিকে, সবাই মিলে একটা পরামর্শ করে—'

তা সবাই মিলে এসেই বসে। বড় ছেলে দ্বিজনাথ, বড়বৌ কুন্তলা।

বিশ্বনাথ কোমল কণ্ঠে বলেন, 'আচ্ছা আব একবার পড়ছি। মা জননীর
হাতেব লেখাটি ভাল। আর দফা হিসেবে গুছিয়ে লিখেছেও খাসা। যতই
হোক অফিসে কাজ করা মেয়ে—'

'আঃ ঠাকুরপো তুমি পড় না ছাই।' প্রমোদিনী বেগে ওঠেন।

'হুঁ এই যে—'

"পাত্রপক্ষ নিম্নলিখিত শর্তগুলি মানিতে বাধ্য থাকিলে, বিবাহে আপত্তি
নাই।

প্রত্যেকটি 'দফা' বিবেচনাপূর্বক অনুধাবন করিয়া এই চুক্তিপত্রে পাত্রের
পরিবাবেব সকলে স্বাক্ষর করিবেন। নচেৎ ভবিষ্যতে অশান্তির সম্ভাবনা।

দফা নম্বব ওয়ান—

বিবাহের পর চাকুরী ছাড়িব না! তৎসম্পর্কে কোনরূপ অসন্তোষ বা
বিধি-নিষেধ বরদাস্ত করিব না। লোহা ও সিঁদুর পরিতে বাধ্য থাকিব না।
মাথায় কাপড় দিব না ও খোঁপা বাঁধিব না।

দফা নম্বর টু—

চাকুবীর উন্নতির প্রয়োজনে যা যা প্রয়োজন বিবেচনা করিব, তাহাই
করিব, তৎসম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা থাকিবে। 'বসে'র সহিত গল্পগুজবে
ফিরিতে রাত হওয়া, তাঁহার সহিত মাঝে মাঝে রেস্তরাঁয় ও সিনেমায় যাওয়া
লইয়া কোন কটাক্ষ সহ্য করিব না।

দফা নম্বর থ্রি—

অফিস ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে নৃত্যগীত অভিনয় ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকি, বিবাহোত্তর যুগেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

দফা নম্বর ফোর—

আমার উপার্জনের অর্থের উপর পতিগৃহের কাহারও কোন দাবী থাকিবে না। সে অর্থ আমার নিজ খুশিমত বা পিত্রালয় বাবদ ব্যয় কবিব। মন্তব্য বা বাক্যবাণ চলিবে না।

দফা নম্বর ফাইভ—

যেহেতু পতিগৃহে গিয়া বধূজনোচিত গৃহকর্মাদি করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, সেইহেতু একটি রাঁধুনী ও একটি চাকরের ব্যয়ভার বহন করিব; কিন্তু উক্ত ভৃত্যদ্বয়ের উপর কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার বা ধমক-চমক চলিবে না। কারণ উহারা কাজে ইস্তফা দিলে টাইম মাফিক অফিসের ভাত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকিবে না। ইতি—"

ভাবী স্বামীর পরিবারের প্রত্যেকের স্বাক্ষবের জন্য জায়গা রেখে নিজের স্বাক্ষর বসিয়েছে সে বেশ একটি কায়দার টান মেরে। অনেক কষ্টে পড়তে পারা গেল স্বর্ণরূপা চৌধুরী।

প্রিয়নাথ ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে বলে 'একটা দফা বাকী পড়ে গেছে।'

'কি!'

'কি!'

'কি!'

তিনটি কণ্ঠ থেকে একযোগে উচ্চারিত হয় এই একাক্ষরিত প্রশ্নটি!

এত আটঘাট বেঁধে চুক্তিপত্রের খসড়া করেছে কনে, বাদ কি গেল?

প্রিয়নাথ বাঁকা মুখ আরও বাঁকিয়ে বলে, 'কেন, দফা নম্বব বফা! যেটা এ পক্ষের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে—'

বিশ্বনাথ উদাস মুখ আরও উদাস করে বলেন, 'তা রাজী হও বা না হও, আমায় বাপু এবার রেহাই দাও। কনের বাপেদের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আর শুনতে পারছি না।'

প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে বলে, 'রোজগারের টাকাটাই যদি ঘরে তোলা না

গেল, এত ঝামেলাব দরকার কি? একটা হাঁড়িকুড়ি নাড়া-মেয়ে জোগাড় করলেই তো চুকে যায়।'

বিশ্বনাথ বলেন, 'তেমন মেয়ে পাচ্ছ কোথায়? শুধু হাঁড়িকুড়ি নেড়ে জীবন কাটাতে আর চাইছে কে?'

বড়বৌ কুন্তলা হেসে উঠে বলে, 'বাঃ ঠাকুরপো, তুমি না বলে রেখেছ আমাদেব মত মুখ্যু মেয়ে ঘরে আনবে না।'

'ঘরে দুঃখু আনবো, এমন কথাও বলিনি।'

'ওমা, দুঃখুব কী আছে?' হেসে গড়িয়ে পড়ে কুন্তলা, 'আমার তো দফা নম্বব ফাইভ শুনে অবধি আহ্লাদে নাচতে ইচ্ছে করছে। জীবনভোর রাঁধতে রাঁধতে হাড় কালি হ'ল, সাবান কাচতে কাচতে পিঠে ঘুণ ধরল, তোমাদেব দুই ভাইয়ের রোজগারেও তো এ দুঃখের অবসান হল না ভাই। এখন যদি জায়ের দৌলতে বাড়াভাত খেতে পাই, চাকবের কাচা কাপড় অঙ্গে চড়াই—'

কুন্তলা শাশুড়ী, খুড়শ্বশুর, স্বামীর উপস্থিতি কিছু মানে না, হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে।

প্রদোষিণী এই কুদৃশ্যের দিকে একটি অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলেন, 'লেখা-পড়া জানা মেয়েই ঘরে আনা উচিত ঠাকুবপো, তাদেব চালচলন সভ্য হয়।'

অতঃপর আব 'সবাই মিলে' পরামর্শের উপায় থাকে না। কারণ প্রদোষিণীব কথাব সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলা মুহূর্তে গড়ান হাসি গুটিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। আব বলা বাহুল্য দ্বিজনাথও যায় মিনিটখানেক পরেই। 'দাড়িটা কামানো হয় নি—' বলে গালে হাত বুলোতে বুলোতে অন্তর্ধান করে।

প্রদোষিণী আব একবাব এই কুদৃশ্যেব দিকে বিষদৃষ্টি হেনে বলেন, 'সংসারে আব রুচি নেই ঠাকুরপো। প্রিয়টার একটা বিয়ে দিতে পারলেই এ সংসাব ত্যাগ করে বাঁচি। বলি, গোড়ার দিকে যে সব মেয়েকে রিজেক্টো করা হয়েছে, তাই থেকেই একটা বাছো তাহ'লে?'

'তারা এখনো বসে আছে?'

'দেখবে! খোঁজ করবে।'

অগত্যা আবার খোঁজ করতে হয় বিশ্বনাথকে। কিন্তু আবার ফিরে আসতে হয় ভগ্নদূতের বেশে।

'হল না।'

'হল না?'

'নাঃ। কতক মেয়ে বিয়ের বাজার থেকে উঠে গেছে, আব বাকী কতক সুদে বেড়ে দামী হয়েছে। টালীগঞ্জের সেই রায়েদের মেয়েটা? সে না কি বাপকে বলেছে, শ্বশুর বাড়ির মটরগাড়ি না থাকলে বিয়ের দরকার নেই তার। দমদমের সেই নাক চ্যাপ্‌টা মেয়ে? তার মা নাক উঁচু করে বলল, 'কেন আপনাদের এখনো ক'নে জোটে নি? তা আমার মেয়ে তো এক হুজুগ তুলছে বরের বাড়িতে শ্বশুর ভাসুর শাশুড়ী জা, এইসব হাবিজাবি লোক থাকলে বিয়ে করবে না। আপনাদের ছেলে পারবে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে—'

প্রদোষিণী তীব্র স্বরে বলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ন্যাকরা করছ ঠাকুরপো? বলি সেই বেলেঘাটার মেয়েটার কি হল? যে মেয়ে দেখতে নেহাৎ মন্দ ছিল না। তখন আমি চুল কম বলে—'

'বাঃ, সে মেয়ের বাড়ি থেকে তো তখনই জানিয়েছিল বামুন-চাকর না থাকলে তাব মেয়েব পোষাবে না; সে হিসেবে আমি বলব এই চাকবে মেয়েটিই বরং ধর্মজ্ঞানী! নিজের পয়সায় লোকজন রাখতে চাইছে।'

প্রদোষিণী একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সাপ লাঠি দু'দিক ঠিক করার স্বরে বলেন, 'তা' ও মেয়ে তো প্রিয় পছন্দ করছে না!'

প্রিয়নাথ উদাস মুখে বলে, 'অপছন্দর কথা হচ্ছে না। মান মর্যাদা থাকছে না, তাই বলছিলাম।'

বিশ্বনাথ সাধন সামন্তর ভঙ্গীতে বলেন, 'করা যাবে কি! পালা বদলেছে!'

'তাই দেখছি।

অতঃপর আর কি। দিব্য সমারোহে বিয়েটা হয়ে যায়। স্বর্ণরূপা সগৌরবে পতিগৃহে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে আসে একটি ঠাকুর একটি চাকর।

দু'টি নবাব পুত্র।

খুঁজে নিতে দেরী হ'তে পারে আশঙ্কায় ওপক্ষ থেকেই খুঁজে দেওয়া হয়েছে। তাদের নবাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও, দফা নম্বর ফাইভ স্মরণ করে দ্বিজনাথ

আর কুন্তলা ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকে, কিছু বলে না।

স্বর্ণরূপার অফিস ফেরৎ নিত্যই সিনেমা যাওয়া, রেস্তোরাঁয় যাওয়া ও বাপের বাড়ি যাওয়া অনিবার্য হলেও প্রদোষিণী দফা নম্বর টু স্মরণ করে শুধু ভুরু কুঁচকে বসে থাকেন, রসনা কোঁচকাতে সাহস করেন না।

আর বিশ্বনাথ কোন কিছু দরকার না থাকলেও প্রতিদিন চিত্ত অবিচলিত রাখতে সেই 'রফা'র দফাগুলি মুখস্থ করেন।

কিন্তু প্রিয়নাথ?

প্রিয়নাথের কি সবটাই লোকসানের?

নাঃ। প্রিয়নাথের কথা বলতে হ'লে বলতে হয়, তার অবস্থা 'সেবনের পূর্বে ও পরে'র মত—'বিবাহের আগে' বিরক্তি আর সন্দেহদোলায় দুললেও বিবাহের পরে—বিয়ে করার লাভ সে খুঁজে পেয়েছে। দিন রাত্তিরের চব্বিশ-ঘণ্টার অনেকগুলো ঘণ্টা এদিক সেদিক বরবাদ হলেও চব্বিশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তো সম্পূর্ণ প্রিয়নাথের দখলে? আর সেইটাই তো প্রধান লাভজনক অংশ:

চাকা ঘুরেছে বলে কি আর মাথাটা ঘুরতে বাকী থাকবে? না সেখানে প্যালা বদলাবে?

॥ শিলাবতী

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করে আর একবার দেখে নিল অশোক।

হ্যাঁ, ঠিক পথেই চলছে গাড়ী। আশা হচ্ছে এতক্ষণে। ঠিকানাটা লেখা আছে, কিন্তু দেশটা অজানা, পথটা অজানা। উপায়ের মধ্যে পথচারীদের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে করে জেনে নেওয়া। তাই বা এদিকে তেমন পথচারী কই? ডাক্তার সাহেবের বাংলো তো তেপান্তরের মাঠে। শহর ছাড়িয়ে প্রায় সীমান্ত রেখায় সৈন্যদের ছাউনি, তারই কাছ ঘেঁসে মিলিটারী ডাক্তারের কোয়ার্টার্স।

কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা দু' একর জমির মাঝখানে রাজকীয় বাংলো। বিস্তীর্ণ সেই কম্পাউণ্ডে ফুলের কেয়ারি, ফলের বাগান, আর দেশী-বিলেতি যাবতীয় আনাজ পাতির ক্ষেত। ডাক্তার সাহেবের ক্ষেতেতে যা আনাজ পাতি ফলে সে নাকি একজিবিশনে দেবার মত। হবে না কেন, ভাল বীজ, ভাল সার, উচিত মত তোয়াজ, যথোপযুক্ত জল। যেটা এদিকে প্রায় দুর্লভ।

কম্পাউণ্ডের মধ্যেই বিরাট ইঁদারা, তা'তে ইলেকট্রিক পাম্প বসানো, পাইপ চালিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

এ সব তথ্য সরবরাহ করে এক দেহাতি বুড়ো।

এটা হাটতলা।

এটাও প্রায় পল্লীর সীমান্তে, বসতি শেষ হয়ে যেখানে ধূ-ধূ প্রান্তর সুরু হয়েছে, বড় হাটটা সেখানেই বসে। সপ্তাহে একদিন।

আজ হাটবার নয়, হাটের চালাটা যেন সদ্য বিপত্নীকের হৃদয়ের শূন্যতা নিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দু'-একটা ছাগল ওই চালার ছায়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে ওখানে দু'-একটা মানুষ আর কুকুর রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর কাছ থেকে সরে এসে এই ছায়ায় নেতিয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

দেখে কে বলবে দুদিন আগেই ঠিক এই সময় এইখানে লোক ধরছিল না,

হাটের হট্টগোল কথাটার তাৎপর্য কি তা' টের পাওয়া যাচ্ছিল। আনাজ-পাতি থেকে সুরু করে হাঁস মুরগী মাছ মাংস বাসনপত্র কাপড় জামা জুতো ছাতা কুলো ডালা কলসী কুঁজো—কি না আসে এখানে! সন্ধ্যা অবধি বেচাকেনা চলে। আজ সব ফাঁকা।

অশোক মনে মনে একটু হাসল বুঝি বা। ভাবল—আমারও এখন শূন্য হাটেরই পালা কি না!

হাটতলাতেই প্রকাণ্ড এক ইঁদারা।

জনসাধারণের প্রয়োজনেই বোধ করি। জল দেখে গাড়ীটা থামিয়েছিল অশোক। অনেকক্ষণ চলে চলে গাড়ীটা গরম হয়ে উঠে জল খাই জল খাই করছিল।

বুড়োটা ছিল ইঁদারার ধারে। ওর কাছেই জল চাইল অশোক, আর চাইল মিলিটারী ডাক্তার এম এন দত্তর আস্তানার সন্ধান।

তা বুড়ো শুধু আস্তানার সন্ধানই দিল না, দিল ওই সব তথ্য—যতক্ষণ অশোক গাড়ীতে জল নিল, নিজে মুখে মাথায় জল দিল, আর গাড়ীতে বসে থাকা বছর তিনেকের ছেলেটাকে নামিয়ে তার মুখ চোখ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিল।

বেলা চারটে বাজে, তবু কি অসম্ভব রোদ। সঙ্গের ফ্লাস্কের জলটা তো খেতে খেতে কখন সাবাড়। স্টেশন থেকে ন' মাইল দূরে ওর গন্তব্যস্থল। তাও অজানা। ঘুরতে হয়েছে অনেক।

যাক আর ঘুরতে হবে না। বুড়ো আশ্বাস দিয়েছে আ: একটু গেলেই পাওয়া যাবে।

এ সাহেব তো নতুন এসেছে, বুড়ো জানায়, এ হচ্ছে বাঙালী সাহেব। এর আগে ছিল এক পাঞ্জাবী সাহেব, তাদের অনেক ছেলেমেয়ে, ভারী দুরন্ত। ওই দু' একর জমির মধ্যবর্তী বাংলোও কখনো নিথর থাকত না। বাগানের সব ফল তরকারি খেয়ে ছিঁড়ে শেষ করতো। খেতোও তেমনি! বুড়ো সব জানে।

এ ডাক্তার সাহেবের তো বাচ্চা টাচ্চা কিছুই নেই, মেমসাহেবের মন বহুৎ খারাব। অত বড় বাগান অত বড় বাড়ী, মেমসাহেব যেন কয়েদীর মত থাকে ওখানে।

বেরোয় না? বেরোবে কখন? ডাক্তার সাহেবের সময় কোথা? আর এখানে বেড়াবার জায়গাই বা কোথা?

বাগানের এত ফল তরকারি, খাবার লোক নেই।

কে খাবে? শুধু তো সাহেব আর মেমসাহেব। চাকর বাকর আর কতই খাবে?

বিক্রী করে বুঝি সাহেব?

আঃ ছি ছি ছি, সাহেব কি ছোটলোক?

তা'হলে সবই বিলোয়?

বিলোয়! বিলোবে আবার কা'কে? আছে কে খাবে কাছে? পড়শী বলতে তো গুর্খা সৈন্যদল। তা' ওরা এ সব খায় নাকি? খাবার মধ্যে মাংস ডিম আলু পিয়াজ। বড়জোর টমেটো কি লেটুস শাক।

মেমসাহেবের ঢালা হুকুম চাকর বাকর মালি জমাদার যত পারে উঠিয়ে নিয়ে বিলিয়ে আসুক গ্রামে, ওদের আপন জনকে। সাহেব টের না পেলেই হ'ল। তা' উঠিয়ে ওরা আনে, বুড়ো হেসে হেসে বলে তবে আপন জনকে বিলোতে নয়। আনে হাটবাবে।

মেমসাহেব বোঝেন সবই, কিছু বলেন না। ভারী মায়ার শরীর। সাহেবের মত কড়া নয়।

বুড়ো সব জানে, সাহেবের হেড মালি যে বুড়োর ভাইপো।

গাড়ীর স্টার্ট দিল অশোক।

বুড়ো বলল 'পাশ' না হলে চলবে না। গেট পাশ আছে তো?

অশোক হাসল। ছাড়পত্র তার নেই। কিন্তু তার নামটাই কি ছাড়পত্রের মর্যাদা পাবে না, স্লিপে লিখে যদি পাঠিয়ে দেয়?

তা' মর্যাদা পেল বৈ কি।

না পেলে খানিকক্ষণ পরেই ডাক্তার সাহেবের ড্রইংরুমে হাতখানেক পুরু গদি আঁটা সোফায় ডুবে অমন আরাম করে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে কি করে অশোককে?

ওর তিন বছরের ছেলেটাকে তো প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ওই সুকোমল খাদের মধ্যে থেকে।

ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ড্রইংরুমে এলেন মেমসাহেব, সঙ্গে সুসজ্জিত

ভৃত্যের হাতে সুদৃশ্য বেতের ট্রেতে অতি সৌখিন কাচের গ্লাশে ঠাণ্ডা শরবৎ।

বাচ্চা ছেলেটা অধীর আগ্রহে দু' হাতে চেপে ধরেই মুখ ডোবালো গ্লাশটায়। তেষ্টায় কাতর হয়েছিল সে।

তেষ্টা অশোকেরও পেয়েছিল বৈ কি। বাচ্চা ছেলেটার চেয়ে কিছু কম না। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল টুটুর মতই অমনি গ্লাশটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়টা গলায় ঢালে।

কিন্তু বড়রা কে কবে ঠিক ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পায়? করলে গাঁইয়া ভূত অসভ্য বিটকেল কি না বিশেষণ দেওয়া হয় তাকে।

অতএব ইচ্ছে পূরণ হ'ল না।

বরং উজ্জয়িনীর ওই শরবতের চাইতেও ঠাণ্ডা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে উল্টো কথাই বলল সে। বলল, 'তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমি সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছি তোমার এই শরবৎটা খাবার জন্য।'

উজ্জয়িনী মৃদু হেসে বলে, 'এসে যখন নামলে তখন কিন্তু ঠিক ওই কথাটাই মনে হল। ভয়ানক পিপাসার্ত হয়ে ছুটে এসেছ।'

'মনে হল!'

সহসা অদ্ভুত এক পাল্টানো গলায় গভীর স্বরে বলে ওঠে অশোক, 'সত্যি তোমার তাই মনে হ'ল উজ্জয়িনী?'

'হল তো! মরুপথিকের মত দেখাল যে।'

'সত্যি বড কষ্ট হয়েছে।' অশোক ফের স্বর পাল্টে নিয়ে সহজভাবে বলে, 'একে অজানা জায়গা, তায় তেমনি রোদ। অথচ এখন দেখ, তোমার বাগানে নেমেছে অপরাহ্ণের স্নিগ্ধছায়া। অগ্নি বাতাস প্রায় মলয় বাতাসে পরিণত হয়েছে।'

'বোধ হয় আমার গুণে।' উজ্জয়িনী হাসে।

'তা' সেটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পার না।' বলে এবার শরবতে চুমুক দেয় অশোক।

'ডাক্তার সাহেব কোথায়?' অশোকই আবার কথা বলে।

'বাড়ীতেই।'

'বাড়ীতেই?'

'হ্যাঁ দিবানিদ্রার জের চলছে।'

'বল কি, এখনও ? এই পড়ন্ত বেলায় ?'

'তা'তে কি ? কারো কারো রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে তোলবার আশ্চর্য কৌশল জানা থাকে।'

'তোমায় দেখে কিন্তু মনে হয় না। ডাক্তার সাহেবের তেমন গুণ আছে।'

'দেখে যা মনে হয়, তাই কি সব সময় ঠিক ? চোখ কি সব সময় সত্যি খবর দেয় ?'

'তা বটে ! ডাক্তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবেন বোধ হয়, কি বল ?'

'হওয়াই স্বাভাবিক। আমিই তো প্রথমে মনে করেছিলাম না ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখছি। দিবাস্বপ্ন।'

'আমার অবশ্য চিঠি দিয়েই আসা উচিত ছিল', অশোক বলে, 'কিন্তু তার সময় ছিল না, সিদ্ধান্তটা আকস্মিক।'

'সিদ্ধান্ত !'

অশোক মৃদু হেসে বলে 'তা' সিদ্ধান্তই বলা চলে। শুধু তোমাকে একবার দেখতে পাঁচশো মাইল দূর থেকে ছুটে এলাম বলতে পারলে শুনতে ভারী সুন্দর হ'ত অবশ্যই, কিন্তু সুন্দর কথা জীবনে ক'টাই বা বলতে পাই আমরা বল ?'

উজ্জয়িনী চট করে টুটুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কি খাবে বল তো টুটুবাবু ?'

টুটু গম্ভীরভাবে বলে, 'শরবৎ খেয়ে তো পেট ভরেই গেল।'

'ওরে বাস ! কি বিজ্ঞ ছেলে !' হেসে ওঠে উজ্জয়িনী—'তা' তোমার ডাকনামটাই তো শুধু জানলাম, পোষাকী নাম কি বাবু ?'

'প্রিয়বাদী রায়।'

'বাঃ ভারী সুন্দর নাম তো ! কে রেখেছে ?'

'জানি না তো'—টুটু অজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করেই তাড়াতাড়ি সামলে নেয়, 'যখন নাম হল, তখন আমি খুব বাচ্চা ছিলাম কিনা। দেখতেই পাইনি।'

'ছেলে—বুদ্ধিতে তোমায় হারাবে এর পর।' উজ্জয়িনী হাসে। 'আচ্ছা প্রিয়বাদী, তোমার বাবার নাম কি বল তো ?'

টুটু ভুরু কুঁচকে বলে, 'বাবার নাম তুমি জানো না?'

'কই না তো?'

'বাঃ তবে বাবা তোমার বাড়ী এল কেন?'

'কেন এল তাইতো ভেবে পাচ্ছি না।'

টুটু পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দেয, 'বাবার নাম অশোক রায়।'

'অশোক? শুধু অশোক?' উজ্জয়িনী নিরীহ স্বরে বলে 'না বোধ হয়। বোধ হয চণ্ডাশোক।'

'ধ্যেৎ, এমন ভুল ভুল বলছ কেন?' টুটু ধিক্কার দিযে ওঠে।

অশোক গভীর স্বরে বলে, 'ভুল নয় রে টুটু ঠিক।'

'তবে তুমি নিজের নাম ভুল বল কেন?'

'ভুল করাই আমাব স্বভাব যে!'

'ঠিক ঠিক। তাই তুমি খালি রাস্তা ভুল করছিলে।' টুটু হাততালি দিয়ে ওঠে।

'বাস্তা ভুল আবাব কবলে কখন?' উজ্জযিনী প্রশ্ন করে।

'কবলাম? জীবনের প্রারম্ভে।'

'সেই খবরটা দেবার জন্যেই কি এতদিন পরে এত ক্লেশ স্বীকার করে আসা?'

'নাঃ সেটা দেবার মত খবব নয।'

'তবে বল শুনি এত দিন পরে হঠাৎ আমার জন্যে কোন অসুন্দর কথা উপহার নিয়ে এলে!'

'অসুন্দর কথা?'

অশোক অবাক হয়, বোধ কবি ক্ষণপূর্বের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে।

'বাঃ ওই যে তুমি বললে সুন্দর কথা বলবার ভাগ্য নিয়ে আসনি।'

'ওঃ তাই। কিন্তু উজ্জয়িনী, আমি আজ কোন কথা নিয়ে আসিনি, এসেছি একটা ভিক্ষে নিয়ে।'

'পরিহাসেরও একটা সীমা থাকে অশোক!' আরক্ত মুখে বলে ওঠে ঠাণ্ডা চেহারার মানুষটা।

'তা থাকে।' অশোক প্রায় হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু ধৃষ্টতার বোধ হয় সীমা থাকে না। তাই এই ছেলেটাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি উজ্জয়িনী

এঁকে তুমি নেবে বলে, তোমার কাছে রাখবে বলে।'

'ছেলেটাকে আমি নেব বলে, আমার কাছে রাখব বলে!' উজ্জয়িনী অশোকের কথাটাই উচ্চারণ করে বলে, 'আমি আবারও তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি অশোক, পরিহাসের সীমা থাকা উচিত।'

'বিশ্বাস কর উজ্জয়িনী, এটা অন্ততঃ পরিহাস নয়।'

'তাহ'লে তার মানে হয় ভিক্ষা চাওয়ার ছলে ভিক্ষা দিতে এসেছ?' উজ্জয়িনী সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'ভাগ্য আমাকে যা দিতে পারেনি, তুমি তাই দিতে এসেছ আমায়?'

'না উজ্জয়িনী তা নয়। সত্যিই বিশ্বাস কর বিপদে পড়ে প্রার্থী হয়েই এসেছি তোমার কাছে। অফিস এক বছরের জন্যে আমাকে বাইবে পাঠাতে চাইছে। এই দীর্ঘকাল মাতৃহীন শিশুটাকে কার কাছে রেখে যাবো ভাবতে গিয়ে বাবে বারে শুধু তোমার কথাই মনে এল। এত নিশ্চিন্ত আব কার কাছে রেখে হবো বলো।'

কল্পনার অগোচর প্রস্তাব।

অশোককে দেখে তার আসার কাবণ নিযে অনেক কথা ভেবেছে উজ্জযিনী, শুধু ভাবতে পারে নি সত্যি কারণটা।

তাকাল ছেলেটার দিকে।

রোগা পাতলা, তবু যেন ননী দিযে মাজা গড়ন। টিকলো নাক, উজ্জ্বল চোখ, ঠোঁটের রেখায় সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন বৈশিষ্ট্য একদা উজ্জযিনীকে উদ্‌ভ্রান্ত করতো, উন্মনা কবতো, স্বপ্নেব স্রোতে ভাসিযে নিযে যেত।

যেন একটি ছোট মাপের অশোক!

উজ্জয়িনী চোখ তুলে বলল, 'শুধু এক বছরের জন্যে। যদি একেবারে নিযে নিই, যদি আর ফেরত না দিই?'

অশোকও সেই চোখের ওপর চোখ রেখে বলে 'যদি সত্যিই তেমন ভাগ্য ওর হয়, ছেলের দখলিস্বত্ব নিয়ে তোমার নামে নালিশ ঠুকতে ছুটব না।'

'তা' হয়তো করবে না', উজ্জয়িনী বলে 'না করাটাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে যে তোমার মন একেবারে মোহমুক্ত উদাসীন, সে নজীর জানা আছে। তবু জিগ্যেস করছি অশোক, তোমার প্রস্তাবটা কি সত্যিই বাস্তব?'

অশোক শান্ত স্বরে বলে, 'তোমার কি একেবারে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে? তা যদি হয় তো তোমাকে পীড়ন করবো না, তবু তোমার কাছে রাখতে পেলে সত্যিই স্বস্তি পেতাম উজ্জয়িনী!'

উজ্জয়িনী বিষণ্ণ হেসে বলে, 'মরুপথের পথিকের হাতে একপাত্র জল ধরে দেওয়া, তাকে পীড়ন করা নয় অশোক। তবু ভেবে দেখ, আকাশের চাঁদকে যদি হঠাৎ কেউ তোমার পকেটে জায়গা দিতে বলে, সে প্রস্তাব কি চট করে বাস্তব বলে মনে হবে তোমার? সে সৌভাগ্য বিনা দ্বিধায় হাত পেতে নিতে সাহস হবে?'

'দ্বিধা যদি শুধু ওইটুকুই হয়, তাহলে বলছি উজ্জয়িনী ও দ্বিধা ত্যাগ করতে পাবো। যাকে আকাশের চাঁদ ভেবে ভয় পাচ্ছো, আসলে সে একটু ধুলোর মাণিক বৈ আর কিছু নয়। দুঃখী, বেচারা একেবারে দুঃখী। জ্ঞান হয়ে যে মা দেখেনি, তার থেকে হতভাগ্য আর কে আছে বল? বাপ বড় জোর নিজের প্রাণের আকুলতা দিতে পারে, শিশুর প্রাণের অভাব পূর্ণ করতে পারে না। জীবনের কয়েকটা দিন দাও না ওকে সেই পূর্ণতার স্বাদ? তোমার পক্ষে তো সেটা খুব শক্ত হবে না? জানি তো তোমার মন কত কোমল, আর এও জেনেছি সে মন তোমার এখনো মরে যায়নি। হয়তো চেষ্টা করলে ওকে আমি কোন শিশু বোর্ডিংয়ে রাখতে পারতাম, হয়তো মোটা টাকা খরচা পাঠালে ছেলে রাখবার মত আত্মীয়স্বজনেরও অভাব হ'ত না, কিন্তু আমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে ওর মনে যে অভাবের সৃষ্টি হবে, তার পূরণ কোথায় হবে বল?'

উজ্জয়িনী ওই সুকুমার অথচ বুদ্ধি-উজ্জ্বল ছোট্ট মুখটির দিকে তাকায়, তাকায় তার ছোট ছোট নরম আঙুলগুলির দিকে, সোনালি সোনালি চুলে ভরা সুডৌল মাথাটির দিকে, আর অজানিত এক আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় মনটা ভরে ওঠে।

অশোক মাতৃহীন শিশুর মনের অপূর্ণতার কথা বলছিল না?

ওই ছোট্ট মানুষটিকে বুকের ভিতরে ভরে নিলে কি শুধু ওরই প্রাণের পূর্ণতা?

একটা অতৃপ্ত ক্ষুধায় জর্জরিত হাহাকারে ভরা শূন্য নারী হৃদয়ের পূর্ণতা নয়?

একটি শিশু !

ফুলের মত, মাখনের মত, ছোট্ট একটুখানি পাখীর মত কোমল এতটুকু স্পর্শ স্বাদ। এক টুকরো স্বর্গের মালিকানা লাভের সুখ। বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে আকাশ থেকে এসে পড়া এক ঝলক আলোর রং।

একটি শিশু !

উজ্জয়িনী তার থেকে বঞ্চিত।

শুধু এখনো পর্যন্তই নয, ভবিষ্যতের কল্পনা থেকেও বঞ্চিত।

মিলিটারী ডাক্তার এম এন দত্ত উজ্জয়িনীকে দু' একর জমি ঘেরা রাজকীয় বাংলো দিতে পারবে, অনেক ফুল আর অনেক ফলের বাগান দিতে পারবে, সুসজ্জিত ভৃত্য, সুশীতল পানীয়, আরাম আয়েস আড়ম্বর অলঙ্কার, সব কিছুই দিতে পারবে, পারবে না শুধু ওইটুকু। ওই স্বর্গসুখ, ওই স্পর্শস্বাদ। উচ্ছৃঙ্খল কর্মজীবনের অমিতাচারে জীবনের মূলধন হারিয়ে বসে আছে সে।

নিজেকে হারিয়েছে বলেই বুঝি এম এন দত্তর ওই মুঠোয় চাপা মানুষটাকে নিয়েও এত হারাই হারাই ভয়। প্রহরী রেখে স্বস্তি হয় না ওর, তার ওপর আবার নিজে প্রহরা দিতে আসে আকস্মিক আবির্ভাবের বুটজাল ফেলে।

এই প্রাণ হাঁপানো পরিবেশের মধ্যে একটি শিশু কি দুর্লভবস্তু! দিনের সমস্ত অর্থহীন অবকাশ ভরে উঠতে পারবে একটি সঙ্গীতের ছন্দে।

এক বছর !

অনেক দিন আর অনেক রাত দিয়ে গড়া সে জিনিসটা ! এই আশাতীত সৌভাগ্যের ভার বইতে পারবে তো উজ্জয়িনী ?

আর তারপর ?

যদি মাতৃহারা শিশুটা মাতৃস্নেহ রসে বিভোর হয় ? যদি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সেই পরম পাওয়াটুকুকে !

অশোক বলেছে 'ছেলের দখলি সত্ব নিয়ে নালিশ ঠুকতে ছুটবো না তোমার নামে।'

তবু কথা আছে। কথা থাকে।

রুদ্ধ গলায় বলে উজ্জয়িনী, 'আমার ওপর এত বিশ্বাস কবে থেকে জন্মাল ?'

'বিশ্বাস ? সে কি নতুন করে জন্মাবে ? আমার জিনিসকে তুমি যত্নে

রাখবে, এটা তো একটা প্রশ্নের অতীত কথা।'

'আরো আগে কেন এলে না অশোক!' উজ্জয়িনী আরো রুদ্ধস্বরে বলে, 'যখন এতটুকু ছিল, যখন শুধু এক মুঠো ফুলের মত ছিল, যখন প্রথম চোখ মেলে শুধু আমাকেই দেখত। ওর মা তো কবে ফেলে চলে গেছে! তখন কেন দিলে না? এখন ও কি আমাকে চিনতে চাইবে? ভালবাসতে চাইবে? অনেক দূরে চলে যাবে তুমি, হয়তো তোমার জন্যে কাঁদবে।'

বাঃ কাঁদব কেন?' টুটুই কথার মাঝখানে বিজ্ঞের মত বলে ওঠে, 'বাপী এরোপ্লেন চড়ে হুস্ করে আকাশে উড়ে বিলেত চলে যাবে, আমি এতটুকু ছেলে আমি কি পারি তা? যখন বড় হব তখন তো নিজে একলাই যাবো বিলেতে লেখাপড়া শিখতে। এখন তোমার কাছেই থাকব। বাপীকে চিঠি লিখতে শিখিয়ে দেবে তুমি।'

এতক্ষণ মন দিয়ে দু'জনের বাক্য বিনিময় শুনে এটুকু বুঝেছে টুটু আলোচনাটা তাকে নিয়েই।

'এ সব পাঠ বুঝি আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে?' উজ্জয়িনী হাস্যস্ফুরিত মুখে বলে, 'খুব তো চালাক দেখছি। কিন্তু টুটুর বাপীকে চিঠি লেখা শেখাই এত বিদ্যে কি আছে আমার?'

'বারে, তুমি তো বি-এ পাশ, তোমার আবার বিদ্যে নেই?'

উজ্জয়িনী এক জোড়া কালো পাখীকে নীল আকাশে স্থির রেখে বলে, 'আমার সম্বন্ধে আর কি কি তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ছেলেকে?'

'ছেলের কাছেই টের পেয়ে যাবে। অপরাধের প্রমাণপত্র তো রেখেই যাচ্ছি।'

'টুটু আমার কাছে থাকতে পারবি?'

'পারবো না কেন, তুমি তো আমার মাসী হও।'

'মাসী হই একথা তোকে কে বললে?'

'বাপী বলেছেন। আবার কে বলবে!'

'তা' সত্যি, এমন ডাহা মিথ্যে আর কেই বা বলবে? কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি পাগল নাকি? এখনো পর্যন্ত টুটুকে কিছু খেতে না দিয়ে—'

'আহা—টুটু তো তোমার কাছেই থাকছে, খাইও যত পারো। আমাকে এং আপাততঃ বিদায় দাও ট্যাক্সী ড্রাইভারটার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট আছে সন্ধ্যের

মধ্যে স্টেশনে ফিরে যেতে হবে।'

'তোমাকে এক্ষুনি বিদায় দেব? আমার কাছে খাবে না কিছু?'

হতাশ শোনায় উজ্জয়িনীর কণ্ঠ।

'তোমার কাছে তো খেলাম। ভয়ঙ্কর তেষ্টার সময় শীতল পানীয়, আর কিছু চাই না।'

'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে না?'

'করা উচিত বটে' অশোক চিন্তিত মুখে বলে 'কিন্তু তিনি তো এখনো দিবানিদ্রায়। এদিকে দিবা অবসানের ঘণ্টা বাজতে চাইছে।'

'আচ্ছা একটু বোস। দেখি।'

উজ্জয়িনী ক্ষিপ্র লঘু পায়ে আবার ভিতর ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকে যায়।

'টুটু থাকতে পারবি?'

ছেলেকে একান্ত সন্নিকটে টেনে নেয় অশোক।

টুটুর এখন বীরপুরুষের ভূমিকা, তাই জল টলটল চোখে সতেজ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'কতবার বলবো, পারবো! মাসীকে তো আমার খুব ভালই লেগেছে। ঠিক আমার ছবির মার মতন ভাল। আচ্ছা—অন্য সব ছোট্ট ছেলে নেই বাপী এ বাড়ীতে?'

'এই তো, তুই-ই তো রইলি।'

'আমি তো আগে ছিলাম না।'

'তোর মাসীরও আগে কিছু ছিল না।'

'তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসে মাসীকে আর আমাকে নিয়ে যাবে, তাই না বাপী?'

'বাঃ মাসীকে নিয়ে যাব কেন? ও তো এদের বাড়ীর লোক।'

'তখন আমাদের বাড়ীর লোক হবে।' টুটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'মাসীকে যে আমার ভাল লেগেছে।'

'মুফতে একটা ছেলে পাওয়া যাচ্ছে?' সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে হাই তুলে ডাক্তার সাহেব বলেন, 'কথাটার মানে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

উজ্জয়িনী বলে—'মা-মরা ছেলে! ছেলের বাপ বিদেশে যাচ্ছে বছর খানেকের জন্যে, তাই কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে রেখে যেতে চায়।'

ডাক্তার আর একবার হাই তুলে বলেন, 'চাওয়াটা উত্তম সন্দেহ নেই,